মঞ্চমায়া

ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯

'মঞ্চমায়া' উপন্যাস। উপন্যাসের উপাদান জীবন। এ ছাড়া এর প্রচ্ছদপটে উৎকীর্ণ পর্যায়, নাম, ঘটনা সম্পূর্ণ শিল্প-ধার্মিক কল্পলোকাশ্রিত। আকস্মিক কোনো যোগাযোগে কোথাও কোনো রকমে যদি বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো ধরনের সমীকরণ সম্ভাব্য বলে ধরা যায়-ও তা লেখকের ইচ্ছাপ্রসূত নয় বলেই অবজ্ঞেয়।

১
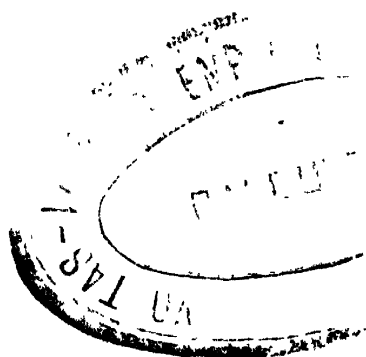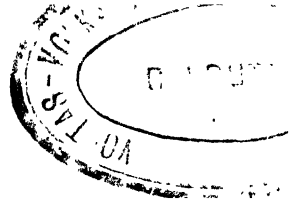
হেমন্তদা ঝড়ের মতো এল। দিনটা এখনও মনে পড়ে।

চিনির বিয়ের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। ঠাকুমা চিনির চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন। সেই তক্কে আমি আমমাখা-আচারের বোয়েমের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটি থাবা সবে নিয়েছি। ভুলু, নেবু আর চিত্রা পাশের গোয়ালবাড়িতে অপেক্ষা করে আছে। চিত্রা ওদের বাড়ি থেকে কিঞ্চিৎ তেঁতুলের আচার সংগ্রহ করেছে।

হঠাৎ গাঁক্ করে শব্দ, যেটা হেমন্তদার পেটেণ্ট আর যেটা শুনলে বাস্তবিক আমাদের হাত-পাগুলো পেটে সেঁদিয়ে যেত।

হলো আমার আচার নেওয়া। বেচারা ঠাকুমা তাঁর ছোট বাড়িখানায় একাই থাকতেন। বিনয়কাকাই তাঁর একমাত্র ছেলে ছিলেন। ছোট দোতলা বাড়িখানা বিনয়কাকার বাবার আমলের। ছেলে-মা-বাবা, এই ছিল সংসার; দিব্যি সংসার। বিনয়কাকার যখন সাত বছর বয়েস তখনই সে সংসার ভাঙলো। বিনয়কাকার বাবা হঠাৎ মারা যান। ঠাকুমাই তখন বিনয়কাকাকে মানুষ করেন। বিনয়কাকার বিয়ে দেন। টুকটুকে বৌ আনেন। সে বৌয়ের গল্প এখনও পাড়ায় পাড়ায়। দ্বিতীয়বার বাচ্চা হবার সময় কাকীমা সেই যে বাপের বাড়ি গেলেন, আর ফেরেন নি। প্রথম বারের সেই বাচ্চা এখনকার চিন্ময়ী—আমাদের চিনি।

বিনয়কাকা ভারী ভাল কাকা ছিলেন; আমার মা-বৌদি সকলে তারিফ করেন আজও। তবে সে তারিফের প্রধান কারণ বিনয়কাকা আর বিবাহ করেন নি। এবং না করার দরুন কখনো কোনো বদনামও কুড়োন নি।

বিনয়কাকাকে আমার একটু একটু মনে পড়ে। দশাসই টকটকে রংয়ের একটি পুরুষ, গলায় একগোছা পৈতে।

কিন্তু অত আবছা নয় বিনয়কাকার মৃত্যুর দিনটা।

আমি, চিনি আর হেমদা গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে সবে ফিরেছি। ঠাকুমার একেবারে আছাড়িপিছাড়ি কান্না। বড় রাস্তায় স্বদেশীদের জ্বালায় সরকারকে গুলি চালাতে হয়। সেই গুলি নিরীহ বেচারি বিনয়কাকার লাগে। পুলিস লাশ নিয়ে গেছে কোথায় যেন; কেটে পরীক্ষা করা হবে মরে গেছে কিনা ঠিক ঠিক।

ঠিক বিনয়কাকার মৃতদেহটা তো চোখের ওপরে ছিল না। তা ছাড়া কোন রোগভোগও নয়। মৃত্যুটা যেন বেশ দাগ কেটে বসে নি। বলতে কি 'আকাশে

উড়োজাহাজ দেখা গেছে' এমনি একটা সংবাদের মতোই অমন পাষণ্ড খবরটাও যেন কেমন ভাসা ভাসা, দূর দূর বোধ হয়েছিল।

তখনকার সবচেয়ে বেশী করে স্পষ্ট মনে আছে দুটো কথা। এক, মরে গেছে কিনা জানার জন্যে বিনয়কাকাকে কাটতে পাঠানো হলো কেন? আমার মা যখন মরে গেলেন তখন তো কাটতে পাঠাতে হয় নি? কাটলে তো লাগবে!

চিনি বলেছিল, "কি হাঁদারে তুই, মরে গেলে লাগে নাকি?"

আমি ভাবলাম, তাইতো! মরে গেলে লাগবে না এটাই তো ঠিক। কিন্তু একেবারেই লাগবে না, অথচ হ্যাশ্ হ্যাশ্ করে ছুরি চালাবে বিনয়কাকার গায়ে,—কথাটা ভাবতে মন যেন কেমন করে। দ্বিতীয় কথাটা যা মনে খুব পড়ে, তা ঠাকুমার সেই কান্না।

…পূজোর সময় ঠাকুর আসতো চালচিত্তির খোলা। কেমন খালি খালি। কিন্তু যেই চালচিত্তির বসিয়ে দেওয়া হতো সেই প্রতিমার ওপর, সমস্ত যেন ভরে যেত। অতবড় পূজোর দালান, যেখানে সময়ে অসময়ে আমাদের কাবাড্ডি খেলা অবধি চলতো, সামনের চাঁদোয়া লাগানো অঙ্গন—ঐ চালচিত্তিরে যেন একেবারে ভরে যেত। পূজোবাড়িময়ই যেন ঠাকুর।…ঠিক তেমনি ছিল ঠাকুমার কান্না। কোনো কিছু রত্তিটুকুও মনে নেই। মনে আছে সেই ভরাট কান্না। আকাশে, ঘরে, দোরে, নাওয়ায়, খাওয়ায় কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই যেন। সবটা ভরে গেছে ঠাকুমার কান্নায়।

হেমুদা কাঁদেন, আমি কাঁদি, পাড়ার যে যেখানে আছেন, আসেন আর কাঁদেন। আমার মনে আছে কান্নার সেই রূপ। সেই ঠাকুমা আর চিনি আর আমরা, সবাই সেই কান্নার জলে গুলে গিয়ে যেন একাকার হয়ে গিয়েছিলাম।

ঠাকুমা আবার কি করে বা কবে থেকে চিনুর পিঠে মেরে দাগ করে দিতেন, বা ওর চুল বেঁধে ঝুঁটি খোপা বেঁধে দিতেন, অতসব আর মনে নেই। কিন্তু চিনি যে হেমন্তদারই বৌ হবে, এ কথাটা না জানি কেমন করে মনে দানা বেঁধে উঠেছিল।

চিনি আমি হেমন্তদা প্রায় সমবয়সী ছিলাম। আমি ওদের চেয়ে বয়সে বছর চার-পাঁচ ছোট। হেমন্তদা আর চিনির খুব বাড়ন্ত গড়ন। আমি ছিলাম রোগাপট্‌কা। চিনিও বলতো, আমিও বলতাম, 'হেমুদা'। ওঃ, কি ডানপিটে আর সুন্দর ছিল হেমুদা! ডাকাতের মতো ভাঁটা ভাঁটা চোখ। মোটা মোটা চুল কুঁকড়ে মাথায় লেপটে থাকতো। চাকার মতো মাথাটা, ছাদের মতো বুক। ইয়া কবজির বেড়, আর গাঁট্টাগুলো একেবারে যেন গুলতির বাঁটুল। চিনিটাকে

আর ইদানীং বড় মারতো না। কারণ 'ইস্তিরি'কে মারলে 'সতীলক্ষ্মী' রাগ করেন। তার বদলি ওরা তখন 'লব্' করতো। মানে বিয়ে করার জন্যে তৈরী হতো আর কি! আর আমি যেন কেমন 'বাঁদর-বাঁদর' বোধ করতাম। দেখতাম, ওরা আমার মর্মান্তিক অবস্থাটা দিব্যি উপভোগ করতো। নিষ্ঠুর মনে হতো ওদের। ওরা কিন্তু একজোট হয়ে গিনিপিগের মতো চকচকে চোখে চাইতো। আর ফিক্ ফিক্ করে হাসতো। আমি যেন ওদের কেউ নই।

হাসি অবশ্য বেশী দিন চললো না। হেমুদার বাবা টের পেয়ে গেলেন 'লব্'-এর কথা। ওঃ! চোরের মার খেলে গদার মতো সেই হেমুদা। ঠায় যেমন গাধা বিষ্টিতে ভেজে, তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেমুদা মার খেলে, কিন্তু কিছুতেই বললে না যে চিনিদের বাড়ি আর যাবে না।

বলবে কি করে? ওদের যে তখন 'ডীপ্ লব্'। মায় একদিন কালী-মন্দিরের পেসাদী মালা এনে ওরা দুজনে দুজনার গলায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার চারেক পরেছে। আমরা বাসরের গান গেয়েছি। হেমুদা এগারো আনা খরচ করে আমাদের চিনেবাদাম, দালসেউ, দালমুট আর গোলাপ রেউড়ী খাইয়েছেন। আমার মনে আছে, আমি 'কত্তোব্বো' বোধ করে পাঁচ পয়সার শোন্-পাপড়ী এনে দিলাম—ওদের 'পেজেণ্ট'।

চিনির ঠাকুমা রাজী ছিলেন। কিন্তু বয়েসের তফাত বড় কম, তাই হেমুদার বাবা-মা রাজী হলেন না। আর হেমুদা সেই যে কোথায় পালালেন, এক্কেবারে নিখোঁজ। অনেক খোঁজখবর নিয়েছিলেন হেমুদার বাবা। কিন্তু পাত্তাই পেলেন না।

তাতে পাড়ার অবশ্য বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি। হয়েছিল ক্লাবের। হেমুদা পার্ট বলতো চমৎকার। যেমন চেহারা, তেমনি গলা। সেবার ক্লাবে ও প্রবীরের পার্ট করেছিল, সবাই ধন্য ধন্য করেছিল। লেখাপড়া যে হেমুদা করে নি বা জানতো না, সে কথা কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্যি করতো না। ওর ওই সব পার্টের জন্য আমরা যেন ওর মনের কাদা হয়ে থাকতাম। তাই হেমুদা যখন নিখোঁজ হলেন, তখন ক্লাবেরই হলো বেশী ক্ষতি। সামনেই আসছে ভূতনাথ মুখুজ্যের বাগানবাড়ির কালীপুজোর বারোয়ারি;—অর্থাৎ শহরের সব কটা ক্লাবের নাটক করার কম্পিটিশন। হেমুদাদের 'ভারতী অপেরা' করছিল 'বভ্রুবাহন'। সেই হেমুদাই নেই; 'ভারতী অপেরা' লাটে উঠলো। 'সরলা সমিতি'র ব্যাঙ্গগুলোর গ্যাকগ্যাকানিতে বাতাস ঘ্যানঘ্যান করে উঠলো।

হেমুদার বাবা মুনিসিপ্যালিটিতে কি এক কাজ করতেন। সামান্য আয়।

খুবই সামান্য। একগাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে ডুবতে লাগলেন। হেমুদাকে খুঁজে বার করা গেল না।

লোকজন খোঁজার চেষ্টা করে নি, তা নয়। কিন্তু হেমুদার বাবার তো রেস্তোর জোর ছিল না তেমন। তাই খোঁজাখুঁজিটা বেশীর ভাগ দশজনার সদিচ্ছার ওপর দিয়েই হলো। কে যে কত খুঁজেছিল জানা নেই।

কেবল চিনি মাঝে মাঝে বলতো, "যেমন হঠাৎ গেছে, তেমনি হঠাৎ আসবে'খন। ও না এসে যায় না"।

তখন যেন চিনির মুখের ভাব অন্যরকম হয়ে যেত। চোখে জলও চিক চিক করতো।

আমি ভাবতাম, বলি 'হ্যাঁ আসবে'। কিন্তু বলতে পারতাম না। ভাবতাম, চিনি যে কালে অত গম্ভীর, ও কথায় আমার থাকতে নেই।

কিন্তু চিনির কথাই ঠিক হলো।

ঠিক দু'বছরের মাথায় কোথা থেকে এসে দাঁড়ালো সেই হেমন্তদা—সেই ঠাকুমার উঠোনে, এক্কেবারে চিনির সামনে। ঠাকুমার হাতে চিনির চুল মুঠো করে ধরা। আর সেই গাঁক গাঁক শব্দ, যেন বাজ।

আমি তো আচারটাচার ফেলে জানালার ফাঁকে চোখ রাখলাম। তবু বাইরে এলাম না। আচারের টান বড্ড টান।

সত্যিই দাঁড়িয়ে হেমুদা।

কী সব্বনাশ! মারবে নাকি? কাকে?

এ যেন সে হেমুদা-ই নয়। এক ঘাড় বাবরি চুল। রং যেন ফেটে পড়ছে। মিহি গোঁফের রেখা হলে কি হবে যেন কামিয়ে আরও মিহি করা। আর চেহারায় যেন একটা মর্যাদা, একটা পুরোপুরি ভাব এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, যেন গমগম করছে বাড়িখানা।

আমি দিব্যি টের পাচ্ছি, চিনি মনে মনে খুশী। কিন্তু ঘাড়টি নীচু করে আছে যেন মিনি বেরালটি। ঠাকুমা বলছেন, "কী সব্বনেশে কথা মা। শুনেছে কে কবে? ও মুখপোড়া, তোর বলতে লজ্জা করলো না?"

"লজ্জা? এখনও লজ্জা করবো? তোমরা কি সিঁথেয় কখনও সিঁদুর পরো নি? তার মানে কি তোমরা জানো না?"

দুম্ করে একটা কিল মারলেন ঠাকুমা চিনির পিঠে: "বল্, তিন সত্যি করে বল্—দিয়েছিলো হেমু তোর সিঁথেয় সিঁদুর, তোর গলায় মালা? বল্, নৈলে তোকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবো।"

চিনি আর মুখ ফুটে বলে কি করে? বলা যায় কখনো? বড় বৌদির বিয়ে হয়েছিল সেই ন বছর বয়েসে। তা আজও বিয়ের কথা বলতে গিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলেন, আর মানা-দি ঠাট্টা করে বলেন, "লজ্জা হচ্ছে বুঝি বড় বৌ? —আদিখ্যেতা দেখ ধাড়ীর।"

বড় বৌদিরই অত লজ্জা,—আর চিনির করবে না?

আমি তখন ঘরে বোয়েম থেকে আচার সট্‌কাচ্ছি। সওয়াল জবাব চলেছে বাইরে। কিন্তু চিনির বিপদ ঘন। লজ্জা আর ভয়ে ও আড়ষ্ট, যেন ফুলে-ওঠা দাঁতের মাড়ী।

আমি ওকে বাঁচাবার জন্যে বাইরে এলাম।

আচারের হাতটা কোঁচায় মুছতে মুছতে আমি বললাম, "হ্যাঁ ঠাকুমা, সত্যি!"

"সত্যি ঠাকুমা! হ্যাঁ। আমরা যে বাসরে গান গেয়েছিলাম।"

"গান গেয়েছিলি?" ঠাকুমার গলায় যেমন অবিশ্বাস তেমনি রাগ।

"হ্যাঁ। বলবো? ঠিক মনে আছে। অন্তরো মধুময় প্রীতিভরা, ওগো সরমে চারু আঁখি নত করা······"

ঠাকুমা চেঁচিয়ে ওঠেন, "ওরে ও হতভাগা, চুপ কর্, চুপ কর্।······" কিন্তু আটাশেপনা যায় না ঠাকুমার।

"হ্যাঁ। শোন্-পাপড়ী পেজেন্ট করলাম আমি। হেমুদা খাওয়াল আমাদের গোলাবী রেউড়ী।"

চিনির চুলের ঝোঁটা নেড়ে ঠাকুমা আবার বললেন, "ওরে ও কুলখাগী, হ্যাঁলা, সত্যি সব?"

বিরক্ত হয়ে বলি, "বলছি সত্যি, তা-না কনেবৌকে জিজ্ঞেস করছো। ওর লজ্জা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না?"

লক্ষ্য করে দেখলাম, চিনিটা হাসছে যেন। আর ঐ যে ওই জলদগম্ভীর হেমুদা, উনিও যেন শান্ত নেই। ঠাকুমা শুধু বলেন, "তুই চুপ কর্ মুখপোড়া, গাধা।"

ওসব বলার তখনকার দিনে থোড়াই আমরা কেয়ার করতাম। কে আবার মুখপোড়া গাধা নয়? ঠাকুমারা চোখে কম দেখেন বলেই ওসব বলেন।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, "বিশ্বাস করছো না ঠাকুমা? কিন্তু ওরা লব্ করতো যে!"

চোখ কপালে ওঠে ঠাকুমার: "হ্যাঁরে সে আবার কি? লব্ করা কি?"

ঠাকুমার হাতের মুঠো যেন শিথিল হয়ে যায়।

ততক্ষণে চিনির দ্রুত পলায়ন।

তবে বেশী দূরে নয়। ঘরের মধ্যে, দরজার আবডালে।

আর শ্রীযুক্ত হেমুদা একেবারে তেড়িয়া : "চুপ করে থাক্ শয়তান, হাড়গিলে !"

সেই একখানা দাবড়ানিতেই আমি যেন একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে গেলাম।

এদিকে ঠাকুমা চেঁচান, "ওরে লব্ কি বল্। আজ বাদে কাল বিয়ে। দিন, পুরুত সব ঠিকঠাক। বিয়েরও সব ঠিক। জিনিস-পত্তর কেনাকাটাও সব ঠিক। এর মধ্যে একি বিভ্রাট। ওরে ও সব্বনেশে, বল্ না কি করেছিস ছুঁড়িটার তোরা ? লব্ কিরে যাদু, বল না !"

কটমট করে আমার পানে চেয়ে হেমুদা বললে, "লব্ গো লব্, তোমরা যাকে প্রেম বলো, ভালবাসা। আমি চিনিকে ভালবাসি, ও-ও আমায় ভালবাসে।"

ঠাকুমা যেন নিশ্চিন্দি হয়ে পা ছড়িয়ে বসে হাঁফ ছাড়েন : "পিরিতেরই বয়েস বটে ! তা কি করতে হবে বল্।"

"বললুম তো। আমি তোমাদের তোয়াক্কা করি নে। বাপ-মায়েরও তোয়াক্কা করি নে। করকরে তিনশো টাকা এনেছি। এই তোমায় দিলাম। তুমি ডেকে আমার বাবাকে দাও। দিয়ে মত করাও। আমি নিজে গিয়ে ও বাড়ি আর ঢুকছি না।"

"কোথায় উঠেছিস তবে তুই ?" ঠাকুমার গলায় স্বাভাবিক সেই জলভেজানো মায়া যেন ভেসে ওঠে।

"ক্লাবে।" রুক্ষস্বর হেমুদার।

"মার বাছা। এতকাল পরে এলি, মার কোলে ফিরবি না ?" ঠাকুমা যেন আকাশ হাতড়ে বেড়ান।

"কোলে ফিরতে আসি নি ঠাকুমা। চিঠি পেলাম চিনির বিয়ের সব ঠিক। যদি চিনির এ বিয়েয় মত থাকতো, আসতাম না।"

"চিনির আবার মত-অমত কি ?" অবাক হয়ে বলেন ঠাকুমা। "এসব কি বলছিস তোরা ?" নতুন ইতিহাসের পাতা ওল্টান যেন ঠাকুমা। কিছু বুঝতে পারেন না।

"মত-অমত নেই ? সুরেশকাকা, মড়াপোড়ানো যার ব্যবসা, যার বয়েস এখন পঞ্চাশ, দু-দুটো বৌ মেরে এখন একপাল ছেলেপিলের মধ্যে নিয়ে ঢোকাবে ঐ চিনিকে ? চিনির মত তো পরে, তোমার মত আছে ?"

ডুকরে কেঁদে ওঠেন ঠাকুমা, "মত কি আর এমনিতে হয় দাদু। আয় বোস। আমি একটু কিছু এনে দি, খা। এতদিন পরে এয়েছিস্। ওরে ও চিনি, কোথায় গেলি ? ছোঁড়া দুটোকে দুটো আম কেটে দিয়ে যা। আর কুলুপ খুলে আমার জালির আলমারি থেকে চারখানা করে বাতাসা দিয়ে যা। আয় বোস দাদুরা, বোস। তোরাই হলি গিয়ে চিনির সত্যিকারের আত্মীয়-বান্ধব। নাকি

তোরাই ওর অবোলা পিরিতের সাথী। শৈবলিনী আর প্রতাপের গপ্প তোদের দাদু পড়ে শোনাতেন। তোরাই তো জানবি সব। বোস্।"

তেড়ে ওঠে হেমুদা, "বসবো না। সময় নেই। এ বিয়ে হবে না।"

"ছি দাদু বলতে নেই। শুভকম্মে বাগড়া দিতে আছে কি? তোদেরই তো চিনি। তার সুখ দেখবি নে তোরা?"

"সুখ দেখার জন্যেই এসেছি।" বলেই ঘরে ঢুকে হিড় হিড় করে চিনিকে টেনে নিয়ে এসে ঠাকুমার সামনে দাঁড় করিয়ে হেমুদা বললে, "আর লজ্জা করলে মরবে চিনি। তুমিও, আমিও। আমি শুধু তোমায় বলছি, তুমি ঠাকুমার সামনে বলো, এ বিয়েতে কি তুমি সুখী?"

চিনি বলতে পারে না। মরে যায় লজ্জায়।

"বলো। না বললে মার লাগাবো আমি।"

চিনি নীরব।

"তুমি যদি সুখী হও, আমি চলে যাব; কিছু বলবো না। কিন্তু যদি সুখী না হও বলো; দরকার হলে জোর করে নিয়ে যাবো। বিয়ের ঘট-পট ভেঙে চুরে, দু-চারটে মাথাও ভেঙে নিয়ে যাবো। কেউ রুখতে পারবে না এ শম্মাকে।"

সে কি দাপট!

চিনি মাথা নীচু করেই থাকে। অথচ মুখটা খুশিতে ভরা।

আমার মনে হতে লাগলো, ওঃ কী বিরাট হেমুদা!

ঠাকুমা এদিক ওদিক চান আর থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে গায়ের কাপড় খুলে বুক আর হাঁটুর মধ্যে জড়ো করে জোর জোর পাখার বাতাস খান। মুখে বললেন, "হে সব্বরক্ষে হরি, হে বিপদবারণ নারায়ণ, কোথায় তুমি!"

বেগতিক বুঝে আমি হঠাৎ একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলি, "লজ্জা করছে চিনির একথা বলতে। লজ্জা করে না?"

হেমুদার যত রাগ আমার উপর, "ফের যদি তুই ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে জ্যাঠামি করবি ঠাসঠাস করে চড়িয়ে দেবো। কি চিনি বলবে তো বলো, নৈলে মরো, আমি চললাম। আমিও বাঁচবো না।"

ঠাকুমা বললেন, "কিন্তু তুই খাওয়াবি কি ওকে?"

হেমুদা বলে, "খাওয়াব? খাওয়াবার ভাবনা? যাত্রাদলে এই দু বছরে যা নাম করেছি, মাস গেলে ষাট টাকা পাই। সবার চেয়ে বেশী মাইনে। অধিকারীর সঙ্গে কথা হয়েই আছে, লাভের বখরা পাবো যদি কনট্রাক্ট্ করি। টাকার ভাবনা করছো ঠাকুমা? তিনশো তোমায় তো দিলাম। আরও দুশো বিয়েতে খরচ করবো। সঙ্গে আছে।"

কী যে বিরাট আর বড় মনে হতে লাগলো হেমুদাকে! চিনি তো চিনি, আমারই বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছিলো হেমুদাকে। আবার বল্লাম, "আচ্ছা আমি বলি, যদি চিনি আমাদের আম আর বাতাসা এনে দেয়, বুঝবো সে হেমুদাকে ভালবাসে, আর বিয়ে করতে চায়; আর সুরেশকাকাকে ঘেন্না করে, বিয়ে করতে চায় না। আর যদি আম-বাতাসা এনে না দেয় তো বুঝবো সুরেশকাকাকে বিয়ে করলেও ও সুখী হবে।"

ফ্যালফ্যাল করে চাইলো চিনি আমার আর হেমুদার দিকে। ঠাকুমার পাখা দ্রুততর। বিপদবারণের নাম ঘনঘন। চিনি আমার দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে আম-বাতাসা আনতে গেল।

রেকাবিতে বাতাসা দিয়ে আম কাটতে বসে গেল।

হেমুদা আমার মাথায় এক চাঁটা বসিয়ে বললো, "বাতাসা খাবি কিরে। যা এক টাকার টাটকা চমচম নিয়ে আয়। আমরা খাবো, ঠাকুমাবুড়ী খাবে না?"

ব্যাপারটা শেষ অবধি নিষ্পত্তি করলেন বাবা।

ঠাকুমাকে মাঝে রেখে দালানে বসে আছেন আমার বাবা আর হেমুদার বাবা। ওঁদের কথা হচ্ছিলো।

আমি তো জানি না। বাজারে তালশাঁস উঠেছে। কিছু চেয়ে নিয়ে, আর কিছু ওমনি হাত করে ছুটে এসেছিলাম চিনির কাছে। এসে দেখি দরজা ভেজিয়ে, একটু ফাঁক করে তার আড়ালে ঘুপটি মেরে বসে আছে চিনি। আমি চুপি চুপি ওর মুখে একটা তালশাঁস গুঁজে দেবার চেষ্টা করতেই, হাতখানা সরিয়ে খুব ধীর গলায় সত্যিকার রাগ প্রকাশ করে ও খেঁজিয়ে উঠলো, "গোলমাল করিস্ নে এখন। যা এখান থেকে।"

আশ্চর্য! তালশাঁস! অথচ—! ব্যাপার কি? আমিও রেগে যাই। মেঝেময় ছুঁড়ে ফেললাম তালশাঁসগুলো। "না খাবে, না খাও। এনেছিলাম কচি তালশাঁস বলে।"

চলেই যাচ্ছিলাম। খপ্ করে আমার হাতখানা ধরে টেনে আমাকে জড়িয়ে বসে রইলো দরজার ফাঁকে। ওর ছড়ানো ভিজে চুলের গন্ধে আমার হাঁফ ধরতে লাগলো। কিন্তু আমায় ও আঁকড়ে ধরে আছে, যেন ডুবে যাবার মুখে কোনো মানুষকে মোক্ষম চেপে ধরেছে।

তখন কানে গেল কথা। বাবার গলা শুনতে পেলুম।

বাবা বললেন, "বয়েসের তফাত কম তো তোমাদের কি হে বাপু? সে তো ওদের ব্যাপার। তাড়াতাড়ি মেয়েমানুষটা বুড়িয়ে যাবে। তখন পুরুষটা আবার

কচি বৌ-এর জন্যে ছুঁক ছুঁক করবে। বুড়ীটার হবে হেনস্তা। এই তো আসল ভয়? আর তারই জন্যে কত রকমের নিয়মকানুন, পাঁজি-পুঁথি। ওদের ব্যাপারটা বুঝেছ?"

হেমুদার বাবা আর আমার বাবা সমবয়সী হলে কি হবে, পাড়ায় বাবার খাতিরটা ছিল বেশী। কাজেই হেমুদার বাবাই হোন্ যেই হোন্, বিপদে আপদে বাবার শরণাপন্ন হওয়াটা যেন পাড়ার অভ্যাস।

হেমুদার বাবা ক্ষেপে গিয়ে বললেন, "ব্যাপার আর কি? জুতোপেটা করে অমন কুলাঙ্গারকে—"

দোরের এপারে চিনুদি আমার হাতটা টিপে ধরেছে যমের মতো। ফিস্‌ফিসিয়ে কানের কাছে বললে, "কি হবে ভাই?"

অমন করে হঠাৎ ফিস্‌ফিসিয়ে কথা বললে কাতুকুতু লাগে না? আমি কাঁধদুটো নাচিয়ে কাতুকুতুটা গিলে বললাম, "যাঃ সুড়সুড়ি লাগে যে!"

মনে হলো দোরের পানে বাবা চাইলেন। কিন্তু তিনি হেমুদার বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "নগেন, নগদ পাঁচশো টাকা দু বছরের মধ্যে সংগ্রহ করে যে ছেলে ফেরে, সে তোমার কুলের অঙ্গার নয়। বরং ঐ সুরেশের চেয়ে ভাল পাত্র বলেই বোধহয়।"

"কিন্তু সুরেশকে মাসী কথা দিয়েছেন। বিয়ের সব ঠিক। এখন কি সুরেশ সমাজে আমাদের থাকতে দেবে?"

বাবা বললেন,—"ওহে মরলে শব ফেলার দায়, যে মরে তার নয়। যারা বাঁচতে চায় তাদের। সুরেশ সমাজে থেকে আমাদের না পোড়ালেও অপর যারা বাঁচবে তারা নিজেদের দায়েই পোড়াবে। সে ভয় কিসের?"

খানিকটা নিস্তব্ধতা।

বাবা বললেন, "বুঝেছি। তা কতো টাকা নিয়েছো ঘটকালিতে।"

"আমাদের চিনু-মার বিয়েতে ঘটকালির টাকা নেবো? আমায় তাই পেলে হে ছোটকর্তা? ধার বলে সিদ্‌নে গোটা কুড়ি টাকা—"

বাবা বললেন, "সে টাকা সুরেশকে আমি দিয়ে দিচ্ছি আজই। কৈ রে চিনি-মা, মিষ্টি মা, ইদিকে আয় তো।"

ঠাকুমা বললেন, "কোথায় সে?"

বাবা বললেন, "কাছেই আছে। আর মনে হচ্ছে একা নন্ তিনি। সঙ্গে আছেন আমার পিণ্ডাধিকারীটিও। বাতাসের গায়ে কাতুকুতুর গন্ধ।" বাবা আবার চাইলেন দরজার দিকে।

এমন চিমটি কাটছে চিনি তখন যে, চুপ করে বসে থাকে কার সাধ্যি। ও

গেল ধিন্‌-তা ধিন্‌-তা করতে করতে বাবার কাছে। আমি চলে গেলাম তাড়াতাড়ি হেমুদাকে খবর দিতে।

এর মধ্যে ওলটপালট গেল ঢের।

অনেক-অনেক বছর গড়িয়ে গেল। না কোনো পাত্তা হেমুদার, না কোনো খবর চিনুর। কাশীর সেই ঘোলাটে গলি-মারা জগৎ থেকে ওরা বিলুপ্ত। ঠাকুমা মারা গেলেন। একালে সেই ছোট্ট বাড়িখানা, যার ফাটলে ফাটলে সেই মধু কৈশোরের চাক বেঁধে উঠেছিল, সেখানা নিরবচ্ছিন্ন একা পড়ে থাকে। কোথাও কোন খোঁজ নেই। কেউ খোঁজ নিতও না।

আমিও না।

নানা ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে আমিও আমার পথে এগিয়ে গেছি গতানুগতিক একটা ধারাপথ বেয়ে। ম্যাট্রিক, আই. এসসি, তারপর লক্ষ্ণৌ,—ডাক্তারি। পাশ করে সেই কাশী। পশার জমলো না। মন বসে না কাজে।

এমন সময়ে দেখা মাস্টার লোকেনদার সঙ্গে। লোকেনদার মাথায় ছিট ছিলই লোকে বলে। আমি জানতাম অন্য রকম। নানা ভাবনা, ভাবুকতার শিল্পী তিনি। ভাবালুতার যম। নিত্য-নতুন দিঙ্‌নির্ণয়ে তাঁর চোখ সর্বদাই ব্যস্ত। ছাত্ররা পাস করবে, চাকরি করবে, ধীরে সুস্থে একটা তেলে-জলে সক্রিয় জীবন গড়ে তুলবে, এ যেন তাঁর মতো নীল-লোহিতের চক্ষুশূল ছিল। লোকেনদা ফেনোডর্ম নামক একটি বড়ি দিয়ে নেশা করতেন বটে; কিন্তু খুব খুলতো তাঁর নিত্য নব আবিষ্কারের রূপ। কেবল ছেলেদের ভজাতেন, "চাকরি করবি নে; কাজে হাত দে; রিস্ক্‌ নে। তারপরই শিক্ষার ফসল তুলতে পারবি। সরস্বতী কুঁদ ফুলের মতো দেখতে, মানি, তা বলে কুঁদফুলের চাষ করে সরস্বতীর পেট ভরবে কি? লক্ষ্মী-সরস্বতীর জোট বেঁধে দে।"

তিনিই ধরলেন একদিন।

"ভাল লাগছে না ডাক্তারি, করবে না, ব্যস—চুকে গেল। ভাল লাগছে না, করবে কেন? দাসখত লিখেছো কি? অন্য কিছু করো।"

"কি করবো লোকেনদা, কি জানি।"

"কেন, তোমার তো সিনেমা দেখার সখ ছিল। সিনেমা দেখে তুমি যা সমালোচনা করতে, তাও তো দিব্যি মৌলিকই হতো।"

অবাক হই। ভাবি লোকেনদার মতলব কি।

লোকেনদা বলতে থাকেন, "দেশে তো দেখি না একটা জোরালো, সমঝদার ডক্যুমেণ্টারি প্রোডাকশন কোম্পানী।"

আমি হাসি একটু।

লক্ষ্য করেন লোকেনদা। "হাঁসছো! বাঙালী সিনিসিজ্‌ম্‌। একটা সবজান্তা ভাব। রুমালে মাছ বাঁধার মতো জল বেঁধে চলতে চাও।"

এবার জোরে হাসি।

"তা নয়তো কি!" বলে চলেন লোকেনদা। "মহাকালকে বাঁধবে? ভাগ্যকে চাকরির জঙ্গলে শিকার করবে ডিগ্রির গুলি মেরে। বাঙালী খোপ্‌ড়ীই বটে। মড়া-খোপ্‌ড়ীতে কারণ-পান, জিন্দা-খোপ্‌ড়ীতে কারণ-অনুসন্ধান। নব্য ন্যায়ের কচকচি।"

"রাগ করছেন কেন? কি বলবেন বলুন না।"

"বলবো কি! সায়ান্স পড়েছো। মাইণ্ডটা মেথমেটিক্যাল। আবার ইতিহাসে জবরদখল আছে। গানটান গাও, ছবিও আঁকো। মোটামুটি আর্ট বিষয়ে রুচি আছে। এ সবগুলো কি সাধারণ ক্যাপিটাল মনে করো? লাগাও এক ডক্যুমেণ্টারি কোম্পানী।"

কাঁদবো না হাসবো ভেবে পাই না।

"ভাবছো ফোজের ভূত ঘাড়ে চেপেছে? তোমাদের ফেনোডর্মের পাল্লায় পড়ে মরে গিয়ে ভূত-মন্তর আওড়াচ্ছি?"

"তা হয়তো ভাবছি না। কিন্তু ক্যাপিটাল কই?"

"ঐ তো! ক্যাপিটাল দেবে ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক আছে কি করতে? একটা ভাল দেখে স্কীম খাড়া করো। আমি দেখবো কেমন ক্যাপিটাল না পাও। যা বলছি করো। ভাগ্য খুলে যাবে।......"

ভাবতে লাগলাম সেই থেকে।

সত্যিই তো। চেষ্টা করায় দোষ কি!

নেশা চেপে গেল সিনেমার, ডক্যুমেণ্টারির ব্যবসা করবো। এ্যাক্টর নয়, ডিরেকশন নয়, ওসব নয়; শ্রেফ ব্যবসা; প্রোডাকশন্‌, ম্যানেজারি।

তখন সবে টকী উঠছে। মুভী উঠে যাচ্ছে। রসিকজন, যাঁরা দুটোরই কদরদান, হায়-হায় করছেন। বলছেন, 'মুভীর সেই গভীরতা, তন্ময়তা, সেই 'এলোকোয়েন্স্‌ অব্‌ সাইলেন্স' কোথায় টকীতে। টকী তো ডুবলো বলে। অমন যে চার্লি চ্যাপলিন, সিনেমা জগতের ঘুঘু, সেও বলছে গেল গেল; টকী গেল বলে।

আমি ভাবলাম এই তক্কে একটা অল্পদামে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মুভী ক্যামেরা বাগিয়ে সত্যিই কিছু ডক্যুমেণ্টারি তোলা যাক্‌। দিব্যি এক প্লান ফাঁদা গেল। উড়িষ্যার এক রাজাসাহেব ক্যাপিটাল জোগাবে স্থির হলো। দরকার একজন কুশলী

ফোটোগ্রাফার। যা তা হলে হবে না। জর্মান হওয়া চাই। জর্মানীর সঙ্গে পত্রালাপ চলতে লাগলো। লোক ঠিক হলো। এখন চাই একটা লাইসেন্স, এবং জর্মান ফোটোগ্রাফারের ভিসা। ইংরেজ সরকার ছাড়পত্র দিতে গয়ংগচ্ছ করতে লাগলেন। করবেনই। ব্যাপারটি তো আর সোজা নয়। উড়িষ্যার রাজাসাহেব, নাৎসী জর্মানীর জাঁদরেল ফোটোগ্রাফার আর ডক্যুমেণ্টারি—তিন জড়িয়ে যে ককৃটেইল হলো জন বুলের লিভারে তা সইলো না;—মাথায় লাগলো ঝাঁজ। ছাড়পত্র পাওয়া গেল না।

এই খোঁজে থাকতে হেমুদার খোঁজও পাওয়া গেল।

কি করে তাই বলছি।

সিনেমার ব্যবসার সদর কাছারি কলকাতা, আর বোম্বাই। বোম্বাইয়ে থাকতে নানা ঝামেলার মধ্যে লোকাভাবই সবার বড় ঝামেলা বোধ হলো। শেষ অবধি কলকাতাতেই যাবো যাবো ভাবছি। ঘোরাঘুরিই চলছে।

এমনি ঘোরাঘুরি করতে হঠাৎ খবর পেলাম হেমুদা কলকাতায় রঙ্গমঞ্চে দাপটে অভিনয় করছেন!

সে একটা বড় খবর বটে!

আর বাক্যব্যয় না করে কলকাতায় গেলাম পরখ করতে ডক্যুমেণ্টারির কি হয়। হেমুদা কি বলেন।

কলকাতায় এলাম। তখন কলকাতা সরগরম হিমুদার নামে। তিনি আর 'উদীয়মান' নন; একেবারে 'নব জাগরণ'। বাংলা দেশের তরুণ-তরুণী সব একবাক্যে—নট তো নট হেমন্ত চৌধুরী।

আমি যেকালে পড়তাম, সেকালেই ধীরে ধীরে একটু একটু করে হেমুদা এগোচ্ছেন। তবে কলকাতায় আসেন নি। পূব বাংলায় আর উত্তর বাংলায় দল গড়ে কেবল ঘুরছেন আর ঘুরছেন। আর টাকা করেছেন মুঠোয় মুঠোয়। সে সব কথা শুনতাম ঐ কাশীরই দলের কাছ থেকে। কলকাতায় বেশ বড় একটা কাশীর দল আছে। তখনও ছিল, এখনও আছে। বাংলা দেশের গুণীরা বলেন, 'কেশেল'। কেশেলদের কেউ তখন চাকরি, দু-চার জন ব্যবসা, মানে দালালি, ব্যাঙ্কিং, প্লাম্বারিঙ্গের কাজ, এনামেলের কারখানা, চা-বাগানের চায়ের বাক্স সাপ্লাই, জেলখানার সবজি আর খাদ্য সরবরাহ, এমনকি একজন তো একটা হোটেলই খুলে ফেললো। বক্তব্য, নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে কেউ অসফল হলো না। পরমেশের 'সুচারু হোটেলে' গেলেই কেশেলদের গুষ্ঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটতো। সেখানেই শুনতাম কাহিনী। বন্ধু হলে কি হয়, কেশেল হলে কি হয়, ওর যে নির্বিবাদে কেবল উন্নতি হয়ে যাচ্ছে, ওর পাতে যে ঘি পড়ছে, ও যে পেটে 'ক'

অক্ষর ছুঁতে না দিয়ে বেশ টু-পাইস্ করে চার আঙুলে আংটি পরছে, এসব কথা অনেককেই বেশ চিন্তিত করে তুলতো, এবং অর্থের চঞ্চল মতিত্ব তথা লক্ষ্মীর বারবিলাসিনীবৎ পুরুষ হতে পুরুষান্তরে গমনের প্রচণ্ড আকুলতা সম্বন্ধে সারগর্ভ বাণী পেশ হতো দফায় দফায়। চা তাতে ভালই জমতো। এবং আমার কেবল মনে পড়তো চিনির চিমটি।

"ফুর্তিতে আছে বল্। কপাল রে কপাল।"

"বলতে। টাকাকে টাকা, তার ওপরে ওর জুটেও যায় ভাল। জুটেছে এক নুটু ঘোষাল, দেখেছিস তাকে?"

"কে? সেই মোটা ম্যানেজারটা তো!"

"মোটা না মোটা। একাই ভীম-অর্জুন পঞ্চপাণ্ডবের পার্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। একাই এক এক বাক্স কাপড় পরতে পারে।"

সবাই হাসলো।

"তা সে ম্যানেজারটা কি?"

"ওঃ, কি ঘুঘু রে কি ঘুঘু। একেবারে রাম ঘুঘু। যখনই দরকার, ফটাফট মেয়ে এনে হাজির। এই পার্ট করছে, আবার এই ভেগে পড়ছে; আবার আনছে আবার ভাগছে। আনতেও তর নেই, যেতেও নয়।"

"মানে?" আঁতকে ওঠে কেউ।

"মানে কি বলতে চাস্? মেয়ের ব্যবসা করে বল্!"

"তা নয় তো কি!"

"বাট্ বীজনেস্ ইজ্ বীজনেস্। করাচী, কনস্তান্তিনোপ্ল্, কায়রো, ট্যুনিস্, ব্যুনোসায়ার্স—এ সব তল্লাটে মোটা দামে বিক্রি হয়।"

"তা বলে এথিকস্, মরালিটি এ সব কিছু থাকবে না?"

হো হো করে এক দফা হাসি।

"তাই বল্। পয়সা তবে যাত্রাদলের নয়।"

"নো। সেকথা তুমি বলতে পারবে না। হেমন্ত এ সবে নেই। এটা বড়ই আক্ষেপের কথা ভাই যে এমন রসবস্তুর সাগরে নিমজ্জিত থেকেও ও গণ্ডূষমাত্র পান করে না। প্রায় এক ধরনের হিংসাত্মক কার্য, নির্মমতা।"

"কেন? ভালই তো।"

"তোর কাণ্ডজ্ঞানের তারতম্যবোধ সম্বন্ধে আমি বরাবরই হতাশ। শোন্ তবে বলি। এতবার হেমুদার বাড়ি যাই কেবল তল্লাস করতে যে জুতসই একটা স্ক্যাণ্ডাল্ কেলেঙ্কারির পাত্তা পাই কিনা। কেলেঙ্কারি আর কেচ্ছাই যদি না হলো আমরা কি নিয়ে থাকি বল তো। ঈর্ষানল প্রজ্বলিত রাখবো কোন লকড়ি দিয়ে?

আমরা যারা দু পয়সা করছি, মাসের দু-চার সন্ধ্যে কোথাও খরচাও করে আসছি। আর সেইসব মালের কারবারি হয়ে তুই, হেমন্তদা, মাছও খাবি না, ঝোলও খাবি না? ছুঁবিও না, গিলবিও না। নেহাত একটা বর্বরতা। প্রায় আমাদের তাচ্ছিল্য করা। এই কি বন্ধুত্ব? কি বলিস তোরা? দাদার মতো ব্যাভার বলে একে?"

"যাঃ যাঃ। ভারি তুই জানিস, যে বলছিস! পেটের খবর তো জানিস না। ঢেকে ঢুকে সব মিয়াই দুপাত্র টানে, দু-চার ঘণ্টা পাও টেপায়। বাইরের ওসব সাধুগিরি স্রেফ্ সাজসের ব্যাপার। তুই টের পাস নি, পেতে দেয় নি।"

"তোর এই অকপট অপটিমিজ্‌ম্-ই আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। যদিও হেমন্তের কোনও উন্নতির আশা নেই, মেয়েমানুষ আর মদের মধ্যে বসে থেকেও যদিও সে টাকরায় জিভ আটকে প্রেমের তপস্যা করছে, তথাপি তুই যে সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিলি তাতে কিঞ্চিৎ আশার তোয়াজ আছে। এ আক্ষেপ আমি স্বয়ং সেই হুটু ঘোষালের মুখ থেকে শুনেছি।"

"কি বলে?"

"বেশ ফুর্তি চলেছে। হুটুটা নাদা পেট নিয়ে পড়ে আছে তাকিয়া হেলান দিয়ে। আর গোটা পাঁচ-সাত জোঁকের মতো ওর চারপাশে আটকে আছে—

"বলিস কি?"

"বলি বলিহারি। পারেও। ভাগ্যি আর কাকে বলে। ওই মেদবহুল চেহারা নিয়েও মেয়েদের কাছে কী পপুলার!"

"খুব মোটা কিনা, তাই হার্মলেস্। মেয়েরা বেশ তাল তাল ময়দা থাসার আমোদ পায়। এক ধরনের খেলা পায়।"

"হাঁ তা হেমুর কথা কি বললো বল্।"

"বললে, 'এদিকে তার মতি একেবারে করাতে পারি নি দাদা। যদি পারতাম ফাঁক করে দিতাম। যাত্রার দলে ম্যানেজারি না করে মালিক হয়ে বসতাম। কিন্তু বৌদি আমাদের ভারি স্ট্রঙ্গ ম্যান। আয়রন কার্টেন।

"কে, চিন্ময়ী? সেই যে মেয়েটিকে জোর করে বিয়ে করে?"

যে ধারায় কথাবার্তা ছুটেছে আমি থই পাবো না জেনেই চুপ করে শুনেছি। দিনের পর দিন শুনেছি। ওদের কথা উঠলেই চুপই করে যেতাম; বলতাম না কিছু। কিন্তু পরমেশ ওরই মধ্যে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বললেও যেন হেমুকে ভালবেসেই বলতো। কিন্তু চিনির কথা উঠতেই আমি সজাগ হয়ে বসলাম।

"হ্যাঁ আমাদের চিনি। দিব্যি সংসার করছে। দুই ননদের বিয়ে দিয়েছে, তারা শ্বশুরবাড়ি। শ্বশুর এখন ঘোর তান্ত্রিক। দিনরাত কেবল পুজোই করে।

আর সব মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারে কিন্তু ভরন্ত সুখের মুখ যে সাক্ষী দেয় সে তো আর মিথ্যে নয় ভাই। সুতরাং চায়ে আপাতত আরও এক চামচ চিনি দিয়ে জীবনের তিক্ততা সরানোর উপায় খোঁজো। হতভাগা হেমন্ত কোনো স্যাণ্ড্যাল প্রেজেণ্ট করছে না।"

ওদের কাছ থেকে জেনেশুনে নিয়ে একটা সময় করে হঠাৎ উপস্থিত হলাম হালিশহরে।

সেখানে হেমুদা বাড়ি করেছেন। খুব আহা-মরি বাড়ি না হলেও, বেশ খোলা-মেলা। অনেকগুলো ঘর। হেমুদার বাবা নগেনকাকা থাকেন। মা তো অনেক-দিনই নেই। নগেনকাকা অনেকটা বদলেছেন দেখলাম। ঘোর তান্ত্রিক। মুখে কাশীর জন্য আফসোস।

"এ-ও অবশ্য গঙ্গাই ; তবে কি জানো, শেষ বয়সের জন্য কাশীর মতো জায়গা নেই। হেমু বাড়ি করলো, কিন্তু এই হালিশহরে। ম্যালেরিয়ার সদর কাছারি। আর লোকগুলো, কি বলবো তোমাকে, পশ্চিমের বাঙালী বলে যেন—

আমি বলি, "বেশ তো! আপনার ভাল লাগে আপনি কাশীতেই যান না কেন?"

"সে কি হয়? ছোট বৌমা আর ছোট ছেলেও যে এখানে। ওদের ফেলে কি যাওয়া চলে? বড় বৌমা তো এখানে থাকেন না বললেই হলো।

"কেন? চিনি কোথায় থাকে?"

"ও তো থাকে হেমুর সাথে সাথেই।" যেন বিরক্তই হলেন। "তোমার আর কি অজানা! ওই মেয়েই তো পায়ে পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে হেমুকে বিয়ে করিয়ে ছাড়লো। ও কি কম? ছেলেবেলা থেকেই ডানপিটে।"

"তা হোক। কিন্তু থাকেন কোথায়?"

"ঐ তো বল্লাম তোমাকে। ওর তো হায়া-ঘেন্না বলে কোনো কিস্সু নেই। ও-কম্মো সেই ঠাকুমাবুড়ীর দয়াতেই গেছে অনেক কাল—"

বিরক্ত হয়ে বলি, "কিন্তু কাকা আপনি বলছেন না কেন কোথায় আছে চিনি।"

"বলার মতো জায়গা হলে খপ্ করে বলতাম হে।...এই তো কেমন এরা ছুটিতে আছে। বলতে কইতে আরাম।"

"না হোক আরাম। বলুন না।"

হঠাৎ গলা নামিয়ে গলার মোটা রুদ্রাক্ষের মালাটা হাতের আঙুলে পাকাতে পাকাতে বলেন, "বলার মতো কি আর? আছে ঐ যাত্রাদলের মধ্যে।"

"বলেন কি? হেমুদা পারলে?"

"হেমু কি একটা মানুষ ? মানুষ হলে কি ঐ সাত-পাড়া-নাড়া মেয়ে বিয়ে করে ? তোমরা তো জানো না ; ওর যে ঠাকুমা ছিল, ওর কেচ্ছা কি একটা ?"

"ঠিকানা ? কি করে বলবো ? সে কি একখানে থাকে, না একখানে থাকার। ইয়া পেল্লায় মোগলাই কারবার ফেঁদেছে। যাত্রার দল নেই তা এখন। থিয়েটার। তার এস্টেজ বলো রে, লাইট বলো রে, কাপড়-চোপড়, পোশাক-আসাক, মায় বিছানা, তোরঙ্গ দাড়ি-রে, চুল-রে, পেন্ট-রে—নানান ফৈজত, নানান হাঙ্গামা। বাজারে মেয়েমানুষ নিয়ে কারবার। সঙ্গে একটা ফিচেল আছে ম্যানেজার। তার তদবিরেই মেয়েমানুষ ঘাটতি নেই। নিজের ছেলে-বৌ বলে ছেড়ে কথা বলবে তেমন পাও নি আমাকে তুমি। সে বেটা মুটু ঘোষাল, যেন জেলে নয়, জালিয়াত। জেলে জাল ফেলে মাছ ধরে। ইনি জালিয়াত কিনা, জাল ফেলে মেয়েমানুষ আর টাকা, কামিনী আর কাঞ্চন দুইই তুলছে টেনে টেনে, সমুদ্দুর পেয়েছে ঐ আমার পিণ্ডি-চটকানো বাবাটিকে ! কুলাঙ্গার, কুলাঙ্গার !"

যেন একটু দম নিলেন।

আমি বলি, "কিন্তু কাকা, এসব তো মেলাই টাকার ব্যাপার !"

"নাও কথা ! টাকার ব্যাপার। কথায় বলেছে রঙ্গমঞ্চ। ও এক প্রপঞ্চ। ওর খপ্পরে পড়লে কী না হয়। ছিন্নমস্তার আস্‌লি গদ্দী, কামাখ্যার জীবন্ত মহাপীঠ। ওকেই বলে আউয়ল্ পঞ্চমুণ্ডীর প্রপঞ্চ। দিনে রাত, রাতে দিন। হয় কে নয়, নয় কে হয়। নিমেষে রাজা গড়ে ; নিমেষে ফকির। প্রপঞ্চ। আজ হয়েছে, আঙুল ফুলে কলাগাছ, কাল—"

বিরক্তি বোধ হয়। ওর টাকায় বাড়ি। ওর টাকায় এই রাজকীয় চালে থাকা। কাশীতে নগেনকাকার থাকার হাল তো ভুলি নি। চিনির বিয়ের জন্যে দালালী নিয়েছিল এই লোকটা। আজ তান্ত্রিক সেজে স্ফটিকের মালা, মহাঅস্থির মালা আর রুদ্রাক্ষের মালা গলায় চাপিয়ে, কাজলে-বিভূতিতে-সিন্দুরে ভূষিত হয়ে সেই চিনি আর হেমন্তর নিন্দে।

সহ্য হয় না।

তারা অথচ খেটেখেটে মরছে।

শেষ অবধি পেয়েছিলাম ঠিকানা। এবং উত্তর বঙ্গের এক গ্রামে গিয়ে যখন ওদের দলটা দেখে এলাম তখনই মালুম হলো ওদের নাম-ডাক, হাঁক-জাঁকের প্রকৃত স্বরূপ। দিনান্তে দু বেলায় ষাট-সত্তর জন খায় ওদের দলে। দলের মতো দল।

কিন্তু বাইরে খাটে হেমু ; ভেতরে চিন্ময়ী।

ওদের অবস্থা দেখে সেদিন খুশীই হয়েছিলাম।

খুশী বেশীক্ষণ থাকা বোধ হয় আমার কপালে নেই।

আমি তখনও আমার তাড়া সেই সিনেমা নিয়েই ঘুরছি। ডাক্তারি করবো না-ই জানি ; ও আমার হবে না। তবে ডাক্তারি কোম্পানীর মস্ত এক এজেন্সী নিয়ে ঘুরপাক খাবার ব্যবস্থায় লেগে আছি। সেই ব্যাপারেই আমাকে তাড়াতাড়ি কলকাতা ফিরতে হবে।

আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার অছিলায় চিনি এল।

তখন জানলাম তত্ত্ব।

"দেখছো জাঁক। সবই বাইরের। ওর স্বপ্ন একটা কো-অপারেটিভ্ যাত্রা পার্টি বাঁধে। তা থেকে কো-অপারেটিভ্ থিয়েটার। প্রাণপাত পরিশ্রম। তার ফলে এত সব ব্যাপার। কিন্তু তলে তলে সব ঠুঁনকো, ফাঁপা,—গেল বলে। তলিয়ে যাবে।"

"কেন ? কেন ?"

চোখে জল ভরে আসে চিনির।

"সাধে কি ঘর-সংসার ছেড়ে বাড়ির বৌ পড়ে আছি এই নরকে। শিবকে বিয়ে করে রাজকন্যা গৌরীকেও শ্মশান-বাস করতে হয়েছে। আমারও যে শিবকে নিয়ে ঘর ভাই। ভূত-প্রেতের নাচ চলছে। সহ্য করি। শিব আমার উদাসীন।"

"খুলে বলো না ভাই।" আমি বলি।

জমিদারবাড়ির পালকিগাড়ি চেপে আমাদের স্টেশন যাওয়া। যতদূর পথ কেবল ধুলো থাকে পেছনের আকাশে, সামনে ঘোড়ার নালের শব্দ। ভেতরটায় দোল খাচ্ছি স্প্রীং দেওয়া গদীতে।

চিনি সুমুখে মুখোমুখি বসে। জবাব দেয়। "ঐ যে নুটু ঘোষাল। ওর মন শনির মন। মায়া দয়া নেই। কেবল ভাঙা-গড়ার ফেরে আছে। জলের বুক থিতুতে দেবে না। সর্বদাই তোলপাড় করে রাখবে। তাতেই ওর জালে মাছ বেশী পড়বে।"

"ওকে তাড়াও তবে।"

"ওঃ বাবা ! ওকে তাড়াবে তোমার দাদা ? তবেই হয়েছে। তোমার দাদার এক তান্ত্রিক, জ্যোতির্বিদ গুরু আছেন। তাঁর দেওয়া ঐ নুটু। বললে বলে, গুরুর দয়ায় সবই রাজত্ব, গুরুর দয়ায় নুটু। থাকলে গুরুর দয়ায় থাকুক। ও রাজত্ব আর নুটু আলাদা নয়। আবর্জনা হলে দুটোই আবর্জনা। দুটোই পরিত্যাজ্য। এর ওপর আর কি কথা আছে।"

তখন বলি, "এ ছাড়া কিছু ? লুকিও না চিনি।"

"না ভাই। লুকোবার কিছুই নেই। ওই যে বললাম শিব। তবু শিবের গঙ্গা ছিল—"

"ও, এ শিবের গৌরীই সব!"

লাল হয়ে যায় ভরন্ত চিনির নিটোল গলা-গাল-কপাল। রং-ধরা লজ্জার আবির ঠেলে স্বপ্নচোখে চেয়ে চিনি বলে, "হ্যাঁ সব!"

"অতো অহঙ্কার কোরো না। গঙ্গা এলে ঝুপ্ করে নামবে।"

চিনি বললে,—"কখখনো না।"

"এ নাটক, নাটমঞ্চ; প্রপঞ্চ বলেন তোমার শ্বশুর।"

হেসে বলে চিনি, "জানি। তবু এর মধ্যেই সংসারী, সদাচার ভদ্রসন্তান নেই, তাতো নয়। দু-চার জন হলেও আছেন তো!"

"বেশ! বেশ! থাকো সুখে। তবে চিন্তা রইলো ঐ হুটুকে নিয়ে। হেমুদার ডানপিটে জেদের জন্যেই আমার ভয়। স্বার্থপরের জেদকে চিনি। সেটা থামানো যায়। এ লোকের জেদ এতো নির্বিকার, একেই আমার ভয় বেশী।"

এবং সেই ভয় ভীত করে রেখে গেল।

আড্ডা জমেছে সুচারু হোটেলে।

ওষুধের ব্যাপারে আমি রাজস্থান থেকে সিন্ধ হায়দ্রাবাদ ঘুরে ফিরেছি কলকাতায়। তা হয়ে গেছে সাত মাসের ওপর। চিনির সঙ্গে দেখা হবার পর বছর খানেকেরও বেশী হবে।

সেদিনটায় খুব খেটেছি। ক্লান্তই বলা যায়। কোথায় যাই। মনে হলো সুচারু হোটেল। চলে গেলাম।

সন্ধ্যার পর জমজমাট আড্ডা। তবে সকলেই যেন একটু উত্তেজিত। নতুন খবর আছে যেন।

আমাকে দেখেই সকলে একবাক্যে এসো এসো ধ্বনিতে ডাকে।

"তোমার কথাই হচ্ছিলো। শুনেছ খবর?"

"কি?"

"হেমন্তর খবর?"

চমকে বলি, "কি?"

সে বড় মর্মন্তুদ খবর। কেউ বললো হেসে, কেউ গড়িয়ে, কেউ নির্লিপ্ত-ভাবে। ব্যক্তির সর্বনাশ সমষ্টির আলোচনার বিষয়, আর্তনাদের নয়। নিতান্ত পরিচিতের সহসা উন্নতি খুব কম লোককেই খুশী করে; সহসা-উন্নতের অসতর্ক পতনে বেশীর ভাগ চিত্তই ন্যায়ের সঙ্গতি খুঁজে পায়।

মানুষের দুঃখে দুঃখ পাওয়া বড়ো কঠিন ব্রত। সাধনা না করলে এ ব্রত নিষ্কলুষ হয় না। সহানুভূতির পনেরো আনাই সামাজিক নিয়মনিষ্ঠা, মাফিকসই হবার চেষ্টা।

ওরা যথারীতি চা খায়, সিগারেট ফোঁকে আর বলে যায় ঠোঁট থেকে ঠোঁটান্তরিত পরিহাস-উচ্ছল কাহিনী। হেমন্তর সর্বনাশের ইতিহাস।

নানান হাসি-গল্প, শ্লেষ-ব্যঙ্গোক্তির মধ্য থেকে যে কটা কথা প্রয়োজনীয় খবর তাতে জানা গেল বুদবুদের মতো ফেটে গেছে যাত্রা পার্টি। প্রথম লাগে আগুন। তারপর সেই আগুনে পুড়ে মরে যাত্রাদলের চারজন। পুলিস এনকোয়ারীতে যদিও ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ আকস্মিকই বলা হয়েছে, সুচারু হোটেলের বন্ধুরা সে নিষ্পত্তিতে সন্দেহ করেছেন।

"ওসব পুলিসী কারখানা তো!...টাকায় কি না হয়।" ইত্যাদি। যারা মারা গেছে তাদের দাবি মেটাতে যারা বেঁচে রইলো তাদের সর্বস্ব দিতে হলো।

এখন হেমন্ত আর চিনি কাশীতে।

"কাশীতে? সেখানে কেন? হালিশহরে?"

"সে বাড়ি তো বাপের নামে!"

"হলেই বা!" বলি আমি।

ওরা হাসিতে ফেটে পড়ে। "শ্রীমানের হোলিখেলায় নেড়া-পোড়ানো হলো, তার দাম মেটাতে হবে হালিশহরের। ভ্যালা দায়!"

স্তম্ভিত হয়ে যাই। "ওরা কাশীতে তবে করবে কি? কতদিন হলো এসব? জানিও তো না।"

পরমেশেরই হোটেল। ও-ই যা একটু ভালবাসত হেমন্তকে। হেমন্তর ব্যাপারে ওর চোটও লেগেছিল। এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীর দুঃখ বোঝে।

পরমেশই বললে, "তা হালে চার-পাঁচ মাস। এর মধ্যে চিনির ঠাকুমাবুড়ী মরেছে। অথচ ওদের হাতে একটি কানাকড়ি নেই।...যে হেমন্তর টাকা আমরা অনেকেই খেয়েছি, নিয়েছি এবং ফেরত দিই নি, আজ আমার কাছে সে ধার চেয়েছে!" দুঃখ করে পরমেশ।

শুনেই সকলে বারণ করেছে পরমেশকে।

"দিস নে। দিতে হলে জানবি একেবারেই দিচ্ছিস্। ও আর তুই ফেরত পাবি ভাবছিস্? যাত্রার দল কি এমনিই ফুরিয়ে যায় নাকি? ওর হাতে আছে। নিশ্চয় আছে। ও ভাঁওতায় ভুলিস না পরমেশ, ভুলিস না। তা হলেই ডুববি।" অতি সৎ উপদেশ।

পরমেশ বলে, "দিচ্ছি বললেই দিচ্ছি কিনা! পাগল নাকি? যাত্রার দল আর মোমের বাতি যেমন জ্বলে তেমনি গলে। আলো মানেই অন্ধকার। হতেই হবে। তবে ফাঁসাবো। আর্টিস্ট তো হাজার হলেও। এ্যাক্‌টিং ভালোই করে।

চেহারায় তো জুড়ি নেই। দিয়ে রাখি। যদি কখনও হয়…” মুখে মিষ্টি মিষ্টি বেনিয়া-হাসি।

“হ্যাণ্ডনোট করাবি না ?”

“নিশ্চয়! তা না করিয়ে টাকা দেবো, টাকা কি খোলামকুচি নাকি ? একবার কলকাতায় এলে হুণ্ডি লেখাবো। নৈলে বন্ধু কিরে ? আমি লেখাবো। তোরা তখন চা খাবি আর বলবি, ‘কি চশমখোর এই পরমেশটা। হেমুর বিপদের দিনে হুণ্ডি লেখালে।’ দেখ আপসের কেচ্ছার কানাকানিতে স্ক্যাণ্ডাল যেমন জমে এমন আর কিছুতে নয়। আমার এতো ভালো লাগে আপসের কেচ্ছা যে সেজন্যেই টাকা খরচ করতে সাধ যায়।”

অদ্ভুত এই পরমেশ, অদ্ভুত তার মন।

ওর কথার বাঁকা টানে আর ধারালো সুরে চায়ের কাপে ঘন ঘন চুমুক পড়ে।

একটি দিন একটু সুযোগ দেয় নি গম্ভীর হয়ে ওকে প্রশংসা করায়। রাশি রাশি নিন্দার পাহাড়ের ওপর বসে থাকে সর্বদা। অথচ—কি জানি কি ও।

ওরই মধ্যে একটা সময়ে আমাকে লুকিয়ে একধারে নিয়ে গেল। হাতে দুখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললো, “নিয়ে যা। কাশী যাচ্ছিস ; বলবি আরও তিনশো তার নামে রাখলাম। ধার দিলাম। পরে নিয়ে নেবো।”

আমি বলি, “কি করে নিবি পরমেশ ?”

ও বলে, “ভাবছিস্ কেন, ও তো শীতের কেউটে। আজ ঝিমিয়ে আছে। সময় ফিরুক। ঠিক জাগবে ও, ছোবলাবেও। অমন রূপ আর ঐ গুণ ; ওর পয়সা মারে কে ?……বলিস, ও চলে আসুক কলকাতায়। মঞ্চই ওকে খাওয়াবে। আমি ওর ভার নিলাম।”

বলেছিলাম তাই হেমুদাকে। আর চলেও এসেছিল কলকাতায়। চাকরিও নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে ওর খ্যাতি। সেই খ্যাতি থেকে প্রতিষ্ঠা। দু-চার মঞ্চ বদলি করবার পর ওর পাল্লা নাট-মহলে ভারি হয়ে উঠলো। কলকাতার রসলোভী মনের পেয়ালা ও তখন ভরে দিয়েছিল কানায় কানায়। হেমন্ত তখন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট।

আমি তখনকার মতো কিছুদিন রয়ে গেলাম কাশী। আর ঠাকুমার সেই ছোট বাড়িতে রয়ে গেল চিনি। আমার ওপর ভার রইলো, বাড়িখানা জুতমতো বিক্রি করে চিনিকে সঙ্গে করে কলকাতায় যাওয়া।

২

ভার আমি নিয়েছিলাম। বইতে পারি নি। সিনেমার ভূত আমাকে ছাড়ে নি। আর ওদিকে ঘুকে ফিরে ওষুধের ব্যবসায় যা করতাম তাতে মাসে হাজার টাকা আয় হতো। বাইরে থেকে বেশ সচ্ছল। কিন্তু সব ফাঁকা হয়ে যেত সিনেমার নেশায়। যখনই কাজে কর্মে বম্বে গিয়ে পড়ি, সঙ্গে সঙ্গে সিনেমার জগতের অলি-গলির মধ্যে ঢুকে পড়ি। জড়িয়ে যাই।

এমনিই একবার দু-চার জন সহযোগী পেয়ে কথাবার্তা একটু বেশী এগিয়ে গেল। এটর্নী নিযুক্ত করে প্রসপেক্টাস্ রেজেস্ট্রী হলো। কোম্পানীর শেয়ার বাজারে চালুও হলো।

সেইসব হৈ হুল্লোড়ের মধ্যেও আমার ঘোরাফেরা বজায় রাখতেই হয়। নৈলে ওষুধের ব্যবসা থাকে না। কাশী এলাম।

এসেই শুনি চিনিরা তো নেইই, চিনিদের বাড়িখানাও নেই। সে বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে।

চিনিই করিতকর্মা হয়ে সব বেচেবুচে দিয়ে কলকাতা চলে গেছে।

ব্যস্। মামুলী একখানা চিঠি হেমন্তকে দিয়ে আমি আবার যথারীতি সেই বম্বে।

সেই দুনিয়া থেকে ঘুরতে ফিরতে কলকাতায় আসতে আসতে বছর ঘুরে গেল।

কলকাতায় হেমন্তর তখন ভারি জাঁক, ভারি নামডাক। হাতীবাগানেই সে আছে। ভাড়া বাড়ি। তবে মস্ত তেতলা বাড়ি। সব খবরই দিলো পরমেশ।

একদিন দেখা করে আসতে হবে।

তা হবে, কিন্তু কবে ?

তারিখটা পেছিয়েই যেতে থাকে।

পেছিয়ে যে যাচ্ছিলো তার ব্যক্ত এবং অব্যক্ত কারণ অজস্র। অব্যক্ত কারণ ব্যক্ত করার চেষ্টা সময়ের অপব্যয়।

ব্যক্ত কারণের মধ্যে প্রধান অন্তরায় হলো রসিকরঞ্জন বসাক।

ব্যাপারটি ঘোরালো, বুঝিয়ে বলা দরকার।

আমি তখন নৈনীতালে। কদিন ঘোরাফেরা করার ফলে জবর কাজ হলো। প্রায় হাজার দশেক টাকার অর্ডার জোগাড় হলো। মন খুশীতে ভরতি।

হোটেলে বিকেলের দিকে শুয়ে আরাম করছি। ভাবছি, সন্ধ্যে ঘন হয়ে এলে লেকের পাড়ে ক্লাবটায় যাবো। দু হাত বিলিয়ার্ড খেলে আসবো। জমবে ভাল।

বাতাস ঠাণ্ডা। যে ঘরখানায় শুয়ে আছি তার সামনে ছোট্ট একফালি বারান্দা। বারান্দা শার্সিমোড়া আগাগোড়া। সেটার তলায় খড্। খড়ের পাড় দিয়ে পথ বরাবর চলে গেছে আলমোড়া, ভাওয়ালী। বড় বড় পাইনের ডালে পাইন-কোণগুলো সবুজ গুটি বেঁধে ঝুলে আছে। কাঠবেড়ালীরা এসে কচি ফলের মাথাগুলো কুচ-কুচ করে চিবিয়ে খাচ্ছে। দেখতে বেশ লাগছে।

পথের ওপর দিয়ে একপাল খচ্চরের পিঠে লাদাই মাল নিয়ে পাহাড়ী ছেলে চলে যাচ্ছে তারস্বরে গান গাইতে গাইতে,—

"পঞ্চবটী মেঁ রাম লখণ দো ভাঈ—"

যেন মাথার মধ্য নিয়ে একটি মিষ্টি আমেজের প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। চোখের পাতায় ভারি ঘুমের পর্দা। আধোঘুম-আধোজাগা সেই প্রাক্-সমাধি মদির ক্ষণের মাধুরীকে শতছিন্ন করে একটি চিৎকার। হৈ হল্লা।

হৈ হল্লা আসছে নীচে থেকে। যেন বিশেষ কিছু একটা।

পরে আছি গাঢ় নীলের ওপর শাদা সরু আঁসী কাটা দামী সার্জের স্যুট। ক্লাসে যাবার পোশাক। কাঠের সিঁড়ি সোজা, নেমেছে হোটেলের লাউঞ্জে। সেখানে ফাঁদালো বার। রাতের নাচও এই লাউঞ্জেরই মেঝেতে হয়। জমজমাট আসরের মধ্যে একটা কোণে ভীষণ হাতাহাতি। অন্য কোণে দু-চারজন যাঁরা লাউঞ্জে ছিলেন জড়ো হয়ে দেখছেন পরাণ-পণ একটা মারপিট।

জমেছে মারপিট। দু-দুটি সাহেব-বাচ্চা একদিকে, অন্যদিকে অদ্ভুত এক পুরুষ। সাহেব নয়। সাহেবী।

সাহেব-বাচ্চা দুটি সাদাই; তার বেশী কিছু মালুম হয় না। দামী স্যুট সত্ত্বেও উৎকট বোম্বেটের খোশবয় বইছে ধরন-ধারণে। অমন হঠাৎ সাজা সায়েব অনেক দেখা যায়।

কিন্তু সায়েব না হয়ে সাহেবী যিনি তাঁর চেহারা দেখবার মতো। পাঠানদের মতো দীর্ঘকায়, জবরদস্ত লোক। গায়ে হালকা গেরুয়া রঙের ঢিলে বনাতের দামী পাঞ্জাবি। তার ওপর কুচকুচে কালো ব্লেজারের জওয়াহর কোট। মাথায় কালো ফারের ককেশিয়ান টুপী। জওয়াহর কোটের পকেট থেকে সাদা সিল্কের রুমাল আবশ্যিক তৎপরতার সঙ্গে উঁকি মারছে। বাটন-হোলে একটি না-ফোটা লাল গোলাপ, দুটি পাতা সমেত। পরনে ঢিলে পাজামা। তাও সাদা ফ্লানেলের। অদ্ভুত রং। লম্বা বাবরি চুল। ওল্টানো, তেল নেই। ভাল শ্যাম্পু করা। প্রতিটি রক্তবিন্দুতে কণা-কণা আভিজাত্য। তার আকারে, ইঙ্গিতে, ভঙ্গীতে দুর্দান্ত

সাহস। সব কিছু তুচ্ছ বলে গণ্য করার মতো ভ্রূ-তোলা চাহনি ফেটে যা প্রকাশ পাচ্ছে, ক্ষণে তা বিরক্তি, ক্ষণে অশান্ত ক্রোধ, ক্ষণে অবহেলা মেশানো পরিহাস। লোকটা রেগেছে খুবই। তবু তার চোখের কোণ থেকে হাসি মুছে যাচ্ছে না।

ওপরটায় ওর শান্ত, সুশৃঙ্খল নিষ্ঠুরতা; ভেতরটা অশান্ত জ্বলন্ত বহ্নির মতো সাহস। ঠেঙ্গাচ্ছে সাহেব দুটোকে নির্লিপ্ত নির্ভয়ে। প্রান্ত প্রহার নামক শিল্প-কর্তব্যটি নিতান্ত নিপুণ ওস্তাদির সঙ্গে সমাপ্ত করে, টেবিলের ওপর কয়েকখানা দশ টাকার নোট রেখে ম্যানেজারকে হাতজোড় করে নমস্কার করলো। "ডিস্টার্ব করলাম। কিছু জিনিসপত্রও লোকসান হলো। টাকাটা নেবেন। আর কিছু যদি দিতে হয়, কাল আসছি।"

মেঝেয় পড়ে-থাকা সাদা মানুষ দুটোর পানে সকৌতুক বিরক্তির সঙ্গে চেয়ে বললো, "ওরা বোধকরি কাল আর আসবে না। গরম গরম পোড়া মাংসের সেঁক দিলে শুনেছি কালোশিরের দাগ তাড়াতাড়ি যায়।...যদি পারেন করুন একটু ফাস্ট এড্।"

চলে গেল।

পরে শুনলাম লোকটির নাম রসিকরঞ্জন বসাক। পরের দিন সকালে ঘোড়ায় চড়ে দু জনেই বেড়াতে বার হই। তখন বুঝতে পারি আমি হয়তো সিনেমার নেশায় ফচ্কেমি করা শিখেছি; রসিকরঞ্জন বসাক সিনেমা জগতের বাস্তু-ঘুঘু।

জমাটে জাঁহাবাজ লোক। মদ, মদালসা উভয়ের চিরন্তন দোলায় দু-পা রেখে রসিকদার জীবন চলে দুর্মদ ছন্দে। বিয়ে তো করেনই নি; কখনও করবেন এমন লক্ষণও ছিলো না মেজাজে। সামান্য পথ ঘোড়ায় চড়ে যাবার মধ্যে মেম-সাহেবদের ঘন ঘন অভিনন্দনের তালে রসিকদার মন যেন দুলকিতে চলে। অথচ রসিকদার পোশাকের আভিজাত্য সেই 'যোধপুরী পাজামা আর পাঞ্জাবি আর জওয়াহীর বণ্ডী।

অমন লোক গুণ্ডামি করে ভাবতেও কেমন লাগে। আমিই না থাকতে পেরে সাহসে ভর করে জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা রসিকদা, অমন করে ঠেঙ্গালেন কেন সে-দিন লোক দুটোকে?"

হেসে বলেন, "বলে নি ম্যানেজার?"

"আমি জিজ্ঞাসা করি নি।"

"তাই নাকি!" বলেই আগাপাশতলা যেন আমাকে দেখে নেন। "উন্নতি হবে। নাক যারা ঢোকায় না তারাই মহাপুরুষ।"

"দিব্যি মেরেছিলেন। অমন নিপাট মার পাটে পাটে জমিয়ে মারা সিনেমা ছাড়া দেখি নি।"

"ওদের রাগ ছিল আমার ওপর।"

"কেন?"

"সেই বম্বে থেকে ফুর্তি করবে বলে এনেছিল দুটো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েকে। আমি চিনতাম মেয়ে দুটোকে, ল্যুসির মা আর পেত্রার্কার মা দুজনাই আমার জানা। ওদের ঘরানা ভাল। অথচ মেয়ে দুটোকে—যাক; বুঝলাম, ফুসলে ভাগিয়ে এনেছে। আমি মেয়ে দুটোকে দেখে ওদের সঙ্গে পরে কথা বলি। তারপর বম্বে পাঠিয়ে দিই। সেই রাগে দুদিন ধরে শ্রীমানরা আমাকে ফলো করছিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওদের তাই কিঞ্চিৎ ধনঞ্জয় বটিকা সেবন করাতে হলো। তবে না করালেই ভাল হতো। পুলিশের সঙ্গে আমার রিলেশন্‌টা খুব আশাপ্রদ নয়।"

বলেই হাসে।

"ওরা গোয়ানীজ না?"

কটমট করে চায় বসাক! "নাঃ। খাঁটি পর্তুগীজ। গোয়ানীজদের মধ্যেও অনেক ভদ্র পাবে।"

"মেয়ে দুটি যদি পুলিসে খবর দেয়। মেয়ে সংক্রান্ত ব্যাপার। রীতিমত আগুন।"

"আগুনে আমার লোভ। তবে আমি পরওয়ানা নই; স্যালাম্যাণ্ডার। পুড়ি না; পোড়াই।...তবে ওদের নিয়ে অতটা করতাম না। করলাম অসভ্যতার জন্য। এমন করলো ওরা যেন আমি চোরাই কারবার খুলেছি।"

"কিন্তু দু-দুটো সাহেবকে ধরে নেড়ে দিলেন যেন কুত্তার মুখে মুর্গী।"

হাসেন রসিকদা। "এখন আর পারি নে। বয়স হয়েছে। তা ছাড়া, বয়স যা হয়েছে তাকে চাঁটি মেরে বয়সতরো করার ফন্দিফিকির কম তো রপ্ত করি নি!"

চোখের আলোয় দুষ্টু ছেলের চমক।

আমি ম্যানেজারের কাছে যে পরিচয় পেয়েছিলাম, সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে বললাম, "আমি এসেছি আপনার সাহায্য পেতে।"

"বেশ তো। সাহায্য চাওয়ার পর দিতে আমার বেশ লাগে। তাতে যে সাহায্য চায় তার লাভ হোক আর না হোক, আমার পক্ষে খানিকক্ষণ মুরুব্বিয়ানা করা বেশ সহজ হয়। আর সত্যি কথা বলবো তোমাকে, মুরুব্বিয়ানা, বিশেষ করে বিনা পরিশ্রমে এবং মূল্যে, করতে আমার খুবই ভাল লাগে।"

আমার সিনেমা কোম্পানীর কথা শুনে ভদ্রলোক হেসে আকুল। "ঐ কুড়িয়ে বাড়িয়ে সিনেমা কোম্পানী? আরে ছিঃ ছিঃ। ওতে ক্যাডাভারাস্ প্রকৃতির

যোগী-হ্যাংলা রুগী পুরুষগুলোর দুষ্প্রবৃত্তিগুলো সাময়িকভাবে চরিতার্থ হয় হয়তো। কিন্তু নায়িকারা প্রায়ই গর্ভসঞ্চার করে সিনেমা কোম্পানীর সর্বনাশ করে যান; তাতে অবশ্য যে ভ্রূণহত্যা হয় সেটা বেআইনী নয়। শেয়ার করে জমানো ভ্রূণ মরে গেলেও টের পাওয়া যায় না। ছিঃ ছিঃ ও তোমার কাজ নয়।"

"কিন্তু আপনার কি মত? একটা সিনেমা কোম্পানীর পক্ষে কত টাকা নিয়ে নামা উচিত?

হাসে বসাক।

"অন্ততঃ পক্ষে পাচ লক্ষ। তা ছাড়া নিজের দুখানা ভাল প্রেক্ষাগৃহ এবং একটি ডিস্ট্রিবিউশান প্রতিষ্ঠান। সে ডিস্ট্রিবিউশান প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কারবার থাকবে, যাতে অন্যান্য কোম্পানীর ঝোঁটাও হাতে ধরা থাকে······তবে হলো সিনেমা প্রতিষ্ঠান। সিনেমা প্রোডাক্‌শন তো একটি আকবরী রাজ্য চালানো হে! ছুঁচ থেকে কামান, ঘাস থেকে হুরী কোনটার দরকার হয় না? ও একটা সাম্রাজ্য; অন্ত ওর দিগন্তরেখা। মরুভূমি হয়তো; তা বলে দিগন্তহীন নয়।"

আমার মাথা থেকে ডক্যুমেণ্টারির ভূত পালাই পালাই। কিন্তু লাভ হলো লোকটির সঙ্গে পরিচয়। অমন করিতকর্মা লোক, আড্ডাবাজ, মৌজী আর অমন বেপরোয়া লোক দেখি নি আর। ও যে ডাকাত না হলেও কোনো বিশেষ রকমের আন্তর্জাতিক মাল লেন-দেনের গভীর সাগর পাড়ি দিয়ে সাবমেরিনের মতো ব্যবসা করে তা-ও কদিনে দু-তিনটে লক্ষণে স্পষ্ট হলো। পুলিশের সঙ্গে ভারি খাতির। তিব্বতী আর চীনী লোকরা যেন ওর মামাতো-পিস্‌তুতো ভাই। পাঠান-কাবুলীরা ওর কাছে দিনের প্যাঁচার মতো কাবু হয়ে থাকতো। আর ও পয়সা খরচা করতো যেন খরচাই নয়।

রসিকদার সঙ্গে পরিচয় হওয়াটাই আমার নৈনীতাল-টুরের বড় লাভ।

হঠাৎ রসিকদাই আমাকে চিঠি দেন সিনেমারই কথা তুলে।

বম্বে যখন গেলাম, দেখলাম জর্মান ফটোগ্রাফার, মেশিনসহ মজুদ। রসিকদা তৈরী। আমি উপদেষ্টামণ্ডলী আর আর্ট-ক্রিটিকের পদে বহাল হলুম। রসিকদার মতে ভাল কোম্পানীকে ভাল কাগজ রেখে পাব্লিসিটিকে চরম করে তুলতে হবে। "পাব্লিসিটিই ব্যবসা" বলতেন রসিকদা।

লেখার দৌলতে পাব্লিসিটি মহলে আর্ট-ক্রিটিকদের ছাতা-ধরা টেবিলের ধারে আমার স্থান ছিল। সে স্থান সমৃদ্ধতর হবার সম্ভাবনা দেখা গেল। থিয়েটার ও সিনেমা মহলে আমার নাম হলেও রসিকদা ও তাঁর কোম্পানী শীতের কুয়াশার মতো যেমন জড়ো হয়েছিল তেমনিই মিলিয়ে গেল।

হেমুদার সঙ্গে দেখা হলো আবার যখন তখনও আর্ট-ক্রিটিক হিসেবে আমার নাম। সেই নামকে বাহন করেই হেমুদার সঙ্গে দেখা।

দেখা আগেই হতে পারতো। হয় নি। কারণ, মনে মনে সেই যে আমার অপরিসীম অনুতাপ! সেই হেমুদা তার বিপদের সময়ে আমার ওপর ভার দিয়ে এল চিনি আর তার মেয়ে ডুটোর, কৈ সে ভার তো আমি বইতে পারি নি।

ইচ্ছে করেই কলকাতায় আসা এড়িয়ে গেছি। তাই এবার যখন দেখা হলো গম্ভীর হয়েই বসে ছিলাম। 'রঙ্গশ্রী'র আফিসেই দেখা।

হেমুদা কথা বললে, "হ্যাঁরে, তোর সঙ্গে আমাকে আফিস-ঘরে দেখা করতে হবে? ডেকে এনে, এ্যাপয়ন্ট্মেণ্ট্ করে দেখা করতে হবে? তুই না কলকাতায় আছিস মাসখানেকের ওপর? পরমেশ না বললে তো টেরই পেতাম না। কি ব্যাপার বল্ তো? অমন প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে আছিস কেন?"

চুপ করে থাকি। কোনো কথা জোগায় না।

হেমুদাই বলে, "হ্যাঁরে, চিনিও তোর কাছে অপরাধী। শুনলে সে কি বলবে বল্ তো?"

হঠাৎ বলি, "অপরাধী আমিই। আমাকে তুমি ভার দিয়ে এসেছিলে। নিজের কাজের নেশায় সে ভার ,আমি বই নি। তোমার ছুর্দিনে পরমেশও যা করেছে, তা-ও আমি করি নি।...সেই কাশী থেকে বাড়ি বেচে দিয়ে চিনি চলে এসেছে; আমি কিছু করি নি। কাজেই—"

হেসে বলে হেমুদা, "তাই না এসে দোষ ধুয়ে ফেলছিস্। কেমন?" বলেই এক দাপট হাঃ হাঃ করে হাসতে হাসতে সামলে নিয়ে বলে, "ও সব মনে করতে নেই। মূল সত্যটি তোমরা ভুলো না ভাই। তখন আমার ছুর্দিন যাচ্ছিলো। নৈলে অমন ব্যবসা হঠাৎ ছুর্বিপাকে অমন উঠে যায় কখনও? হঠাৎ ভিখিরি হয়ে গেলাম। তারপর সে কী অনটন; ছুর্দৈব! অসময়; নিতান্তই অসময়। নৈলে তোমার সাহায্যও পাবো না, সে হয় কখনও? দুষ্মন্তও ভুলে যায় শকুন্তলাকে; রামও সীতাকে পুড়ে মরতে বলে; ছুর্দৈব বলে কাকে শ্রীবৎস-চিন্তার পালাগান আমরা গেয়েছি। ঐ গ্রহটির ভ্রূকুটিকে আমরা ভয় করি। তুমি তো অকর্তব্য করো নি; অমনোযোগী হও নি। ওই গ্রহটিই করিয়েছে।"

আমাকে বাধ্য করলো ওদের বাড়ি যেতে। নিয়ে গেল একদিন। টানাটানির সংসার। এত টানাটানির কথা নয়। বেশ মাহিনা পায় তখন হেমুদা। শহরে নামডাক খুব।

চিনিকেই জিজ্ঞাসা করি কোনো এক শান্ত-বিজন অবসরে। সংসারের অবস্থা যে কেন এমন চিনিই বললো। বিস্তারিত নয়; বিস্তারিত জানেও না। তবু যা জানে।

চিনির গায়ের গহনার সে জৌলুষ নেই। সাধারণ, যা না হলে নয়, এমন চারগাছা চুড়ি; একটি পাতলা চিকচিকে হার; কানে ঝুটো চুনী বসানো ফুল এক জোড়া। গহনায় তারতম্য হয়েছে সত্য; ওর মুখের সেই ঢলঢল প্রসন্নতায় কোনো তারতম্য নেই।

গহনা যে দেখছি, বুঝেছে চিনি।

বললো, "চেয়ে চেয়ে দেখছো কি? উনিই আবার সব করিয়ে দিয়েছেন। এর বেশী হয় নি।" একটু হেসে বলে, "হবেও না। না-ই হলো। আমার সব চেয়ে বড় গহনা, আমার ডান হাত-বাঁ হাত তোমরা দুজন। আমার আবার কষ্ট কি?"

তবু কষ্ট আছে। আর জিজ্ঞাসা করি। আরো জানতে চাই।

চিনির ভাষা মিষ্টি। শান্ত, স্নিগ্ধ মনের চন্দন বোলানো কথা। "শ্বশুরকে, দেওরকে টাকা পাঠাতে হয়। আর কি কিছু থাকে? মেয়েরা বড় হয়েছে; স্কুলে যাচ্ছে। আমার খরচাও তো কম নয়। তার ওপর রাতে জাগা; দিনে মহলা। থিয়েটারের লোকগুলো যে মদ খেয়ে ধকল মেটায়, টপটপ করে মরে যায়, সে কি অমনি? মানুষ তো দেখে যায় সাজ-সজ্জা-আড়ম্বরের মধ্যে রাজা-উজীরের ব্যাপার। খুশীর দেউলে ভোগের পিদিম, রসের ঘিতে জ্বালায়।"

হেসে ফেলি।

"হাসছো যে?"

"ভাবছি হেমুদা যখন কথা বলে, তার কথায় থিয়েটারী ভাষা আর সুর। আবার তোমার কথাতেও তো রসের বান ডাকছে।"

"ডাকবে না, ডাইনে বাঁয়ে কার্তিক গণেশ। তাই তো কলাগাছ হয়েও পূজো পেলাম। কলা আবার গাছ নাকি। ও তো ঘাস। শুধুই ঘাস। তবু তো পূজো পেলাম গো কার্তিক!"

"ও, বিয়ে করি নি বলে শোনাচ্ছো?"

"করো না বিয়ে সোম? সত্যি ভাই, বিয়ে করে ফেল একটা।"

"করবো। দেখো মেয়ে যে তোমার মতো অমন অলঙ্কার দিয়ে কথা বলবে।"

"কৈ আর রইলো অলঙ্কার। তোমরাই আমার অলঙ্কার। তবে সে অলঙ্কার টিকবে কি? এত কি ভাগ্য করেছি? কী যে খাটুনি, যদি দেখতে।"

"কেন? তোমার দেওর কিছু করে না?"

"কৈ, দেখি না তো কিছু।"

"এও তো এক ঝামেলা কম নয়। এও এক ধরনের পাপ! অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া।"

"ছি ভাই, ও কথা বলতে নেই! পুরুষ মানুষ! একদিন না একদিন রোজগার করবেই। মেজো-বৌই ওকে দিয়ে রোজগার করাবে। মেয়েমানুষ হয়ে বেরোজগারী পুরুষকে ও সম্মান করতে পারবে না কোনো দিন।"

"তার মানে, অনির্দিষ্ট কাল এখন তোমাদের এই বোঝা বইতে হবে।"

"বোঝা? ভাই, দেওর, এসব বোঝা? না সোম, না।"

"হ্যাঁ বোঝা। সোনার বোঝা ঘিয়ের বোঝাও বোঝা। যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাই বোঝা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্নেহও বোঝা। স্নেহের বোঝা বলে কষ্ট কম হয় না। স্নেহের বোঝা মানেই প্রশ্রয়।"

"বোঝা বইতেই আনন্দ, যদি মনের মতো সঙ্গী পাওয়া যায়। যারা পাথর ভাঙে তারাও গান গায়।"

"বেশ তো! তা হলে তো ভালই আছ তোমরা, বলতে হবে। গান গাও।"

"তা গাইবো, গাইছি। কিন্তু তলে তলে উনি যে ক্ষয়ে যাচ্ছেন। চাকরি করাতে ওঁর ভারি অপমান।"

"না করেই বা উপায় কি?"

"উপায় কি!" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চিনি।

তারপর বলে চলে, "যাত্রার দল ছিল, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতাম। বাংলা দেশের নরম ছবিটার খুব কাছাকাছি বাস করেছি। স্বামী বলো, ভালবাসা বলো, সবটা পেয়েছি ভরার মধ্যে; খালি-খালি ছিল না।

আমি শঙ্কিত হই। প্রশ্ন করি, "কেন? এখন কি খালি-খালি বোধ হয়?"

"হ্যাঁ, অনেক খালি!"

"কেন?"

"সে অনেক কথা।"

৩

দিনের পর দিন আমি চিনির সুখ-দুঃখের কথা শুনেছি পর পর পাঁচ-দশ বছরের ইতিহাস।

তার শ্বশুরের কথা, দেওরের কথা, দেওর-বৌ-এর কথা,—তার নিজের কথা, স্বামী আর মেয়েদের কথা।

যখন হালিশহরে গিয়েছিলাম তখন সেখানে দেখলাম অনেক। শুনি নি কিছু। যখন উত্তরবঙ্গে চিনির কাছে গিয়েছিলাম, তাকে প্রগল্‌ভ দেখি নি। ব থ মানুষকে প্রগল্‌ভ করে; মর্মব্যথায় মূক করে দেয়। তখন চিনি মূক ছিল এখন প্রগল্‌ভ।

প্রথম প্রথম তখন দুঃখেই দিন কেটেছে। তখন তোলা মাইনে দিত অধিকারী, সকলের সঙ্গে লঙ্গরে খেতে হতো। বড় লোকের বাড়ি নেমন্তন্ন হতো মাঝে মাঝে। লোলুপতা বাড়তো ভীষণ। সে লোলুপতার চেহারা ভীষণ। দেখে দেখে হেমুদা শিউরে উঠতো।

দিনাজপুরের কোন এক জমিদারবাড়িতে ওদের পালাগান চলেছিল সাত-আট দিন। প্রথম দুদিন পরেই অন্দরমহল থেকে ওর তলব পড়েছিল খাবার।

শীতের আরম্ভ সবে। অঘ্রাণ মাসের রক্ত-চমকানো হাওয়া। বিরাট বিলের ধারে কাশের বনের মধ্যে কাদাহাঁসের দল বাসা বেঁধেছে। গুড় জ্বাল দিচ্ছে সব। তাতা-রসের গন্ধে বাতাস যেন আমোদে সারা। নীল আকাশের দিকে চোখ পড়লেই চিনির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে হেমন্তর। ভরা ক্ষেতে ভরা মন মনে পড়ে যাবেই।

তবু, তবু, সেই নেমন্তন্ন শুনে ওর মনে হলো 'চিনি নয়, প্রেম নয়, আর কিছু নয়; শুধু একটা তৃপ্তির কথা,—ভালো খেতে পাবে।' কথাটা মনে হতেই লজ্জার পরিসীমা রইলো না ওর মনে। ওকি অবশেষে লোভী হয়ে উঠলো? লঙ্গরের খাদ্যই কি ওর স্থূল রুচিকে এমন করে জাগিয়ে দিলো?

সেদিন বিলের ধারের সেই সোনালী সন্ধ্যার একটা পাতা একজন পৌরুষভরা দীপ্ত পুরুষের চোখের জলে ভিজে গিয়েছিল। তবু ওকে খেতে যেতে হলো। শুধু তাই নয়, খেতে বসে ও চোখের জল ভুলে গিয়েছিল। রান্না থেকে পরিবেশন থেকে—সবই ওর ভাল লেগেছিল।

মেজরানী নিজে ওকে বসিয়ে খাওয়ালেন। আড়ষ্ট হয়ে ও খেলো। বিরাট কাঁসার থালার চারপাশে ত্'সার বাটিতে কোথায় কি ছিল ও জানতো না। মেজরানী বলেছিলেন, "এই বয়সে খেতে এমন সঙ্কোচ কেন। ভাল করে খাও। আমার তৃপ্তি।"

সে সব কথা ওর কানে গেলেও মনে ধরে নি।

দাসী ওকে বলে দিলে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে। পান আসছে।

এতক্ষণে ওর হুঁস হয়েছিল এতো সব আয়োজনের মধ্যে একজন কর্তাব্যক্তি ওর চোখে পড়ে নি। দাসীও অপেক্ষা করতে বললো। রাত বেশ হয়েছে। বাড়িটাও কেমন একটেরে, কোনো সাড়াশব্দ নেই কারো।

সেদিন ও জানতে পারলো বাবুরা গেছেন বাগানবাড়িতে। দলের চার পাঁচটি মেয়ে নিয়ে ফুর্তি করতে। এটা জমিদারবাড়ির অতিথি নিবাস। বাগান পেরিয়ে। মাঝের পুকুরের খিড়কি দিয়ে পথ করে নিয়েছে মেজ বৌ—নিঃসন্তান মেজ বৌ।

ও আশ্বাস পেয়েছিল কাকপক্ষী টের পাবে না। বয়সে মেজ বৌ ওর চেয়ে ক-বছরের বড়ই হবে। কিন্তু ওর নাকি সুঠাম শক্ত গড়ন, ওর চেহারায় নাকি জমিদারি জৌলুষ জলজল করছে। যে কোনো রকমে হোক একটি সন্তান। যদি হয়, রানীর জীবনের গতি বদলে যাবে। কাকপক্ষী টের পাবে না। ধর্ম হবে।

বিলের ধারে সেই সন্ধ্যায় দিগন্তের কপাল ভিজেছিল লুব্ধ চিত্তের অশ্রুজলে। একটা লোভের দাসত্বে যার মন অমন হঠাৎ বিহ্বল হয়ে উঠেছিল, তার কাছে এ আবার অন্য লোভ। যদি 'না' বলে সমূহবিপদ। মেজরানী ধরিয়ে দেবে। এই ঘরে, এই একান্তে তাকে গুমখুন হয়ে মরতে হবে। কিন্তু যদি রাজী হয়? তখন?

বলে আর কাঁদে চিনি।

"তখন কেবল আমার কথা মনে করেছেন। আমার নাম করে কেঁদেছেন।"

"কোথায়? সেই রানীর কাছে?"

"নাঃ পাগল? তোমার বন্ধু পুরুষ, তা জানো তুমি।"

"পুরুষপুঙ্গব করলেন কি?"

"না" বলেছিল হেমন্ত। আর তারপর হঠাৎ পা জড়িয়ে ধরেছিল রানীমার। বলেছিলো "সদব্রাহ্মণ যদি হই, যদি মেয়েমানুষকে চণ্ডীর স্বরূপ বলে মেনে জেনে থাকি, তোমার সন্তান হবে, অবশ্য হবে। আমাকে পাপের ভাগী কোরো না। আমার স্ত্রী আছে।"

কিন্তু শত কান্না শোনে নি রানী। স্ত্রী আছে শুনে হেসেছিল। সেই বাগানবাড়িতে ওকে বরাবর যাতায়াত করতে হয়েছিল।

অবশেষে সে গাঁয়ে আর থাকে নি।

এমনি কত রকমের দুর্বিপাক। যাত্রার দল নিয়ে কম দুর্ভোগ ভুগতে হয় নি।

এক ম্যানেজারের হাত থেকে একবার এক মেয়ে উদ্ধার করতে গিয়ে খুব জব্দ হয়। সেও এক বিচিত্র ঘটনা।

দলে প্রায়ই তো সব মেয়ে আসতো। একবার এক মেয়ে এল। নাম বিলাসী। ছোট জাতের মেয়ে কিন্তু রূপ আর ছলায় একেবারে চৌকশ। সে মজে গেল হেমন্তর রূপে। ফিকিরে থাকে, কি করে হেমন্তকে বাগে আনা যায়। অবশেষে যখন বুঝলো এবং অনেকের কাছে শুনলো, ছেলেটা একেবারে স্ত্রৈণ, বৌ ছাড়া জানে না, তখন এক ফিকির করলো।

হঠাৎ একদিন কেঁদে কেটে পড়লো হেমন্তর কাছে। কি ব্যাপার? না, ম্যানেজার ওর সতীত্ব নাশ করার জন্য উদ্যত। আজ রাতে ওর ঘরে জোর করে আসবে বলে শাসিয়েছে। ওকে বাঁচাতে হবে।

এসব ব্যাপারে হেমন্তর বেজায় রাগ। মেয়েটির কথায় সরল বিশ্বাস করেই ও কথা দিয়েছিল সাধ্যমত তাকে বিপদ থেকে বাঁচাবে। আর সেই পবিত্র সংকল্প রক্ষা করবার জন্য বিলাসীরই বুদ্ধিতে বিলাসীরই ঘরে ও শুত পেতে ছিল গা ঢাকা দিয়ে। যথাকালে এসেছিল ম্যানেজার। যথাকালে সে বসেছিল বিলাসীর বিছানায়। বিলাসী তাকে বসতে দিলো; তাকে আপ্যায়ন করলো; নিজের হাতে পান সেজে খিলি করে ম্যানেজারের হাতে দিলো। ম্যানেজার মোটা তাকিয়া হেলান দিয়ে পান খেয়ে তামাক দিতে বললো। বিলাসী যখন তামাক সেজে দিচ্ছে, তখন হেমন্ত বারবার বিলাসীর ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, তার সরলতার তারিফ করেছে। তারপর যেই মৃদু আলোর আবছায়ায় ম্যানেজার বিলাসীর হাতখানা ধরে খপ্ করে কাছে টেনেছে।...

সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়েছে হেমন্ত!

ম্যানেজার তো অবাক। বিলাসী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসতে থাকে।

ম্যানেজার জাপটে ধরে হেমন্তকে, "করো কি, করো কি!"

"না—না—পারবেন না আপনি এই অবলা মেয়েটিকে অসহায় পেয়ে এমন অত্যাচার করতে।..."

ম্যানেজার হাসিতে ফেটে পড়ে, অবলা! অসহায়!! "হাঃ হাঃ হাঃ আরে বিলাসী, আচ্ছা নাটক ফেঁদেছিস্ তো? যেমন তুই নটী, তেমনি তোর এই

যত হাসে বিলাসী ম্যানেজারকে জড়িয়ে জড়িয়ে, তত হাসে ম্যানেজার।

...আর বেচারা হেমন্ত লজ্জায়, ঘেন্নায় মরো মরো হয়ে পালায়।

হেমন্ত হয়ে রইলো আর পাঁচটা মেয়ের চোখে চমৎকার মিষ্টি এক পরিহাস...

"বলো কি হেমন্ত! বিলাসীর সতীত্ব? তাই বাঁচাতে গেলে শেষ অবধি? হাসালে তুমি!"

মনে আছে হেমন্তর।

মনে আছে কাজলকালোর ইতিহাস।

কাজলকালো মেয়েটির নাম। কোথা থেকে আসছিল হেমন্ত। নৌকায় নদী পার হতে হবে। খেয়ার দেরি আছে। ঘাটের পাড়ে উড়ের দোকান। ভাত-দাল-মাছ-টক খেতে পাওয়া যায় অল্প পয়সায়। আর কিছু দিলে ছেঁচা-বাঁশের বেঞ্চীর ওপর চাটাই পেতে গড়িয়ে নেওয়া যায়। সেখানেই হঠাৎ এনে দিলো নুটু ঐ কাজলকালোকে! টস্‌টসে, ভরাট, কুঁদে-কাটা কষ্টি-পাথরের প্রতিমা যেন। বয়স সতেরো কি ষোলোই হবে হয়তো। ছেলেমানুষী ভরা মুখ। নুটু বললে, "তুমি যাচ্ছ! এটাকে নিয়ে যাও। আমি তা'লে দিন কতক পরে যাবো; আরো গোটা দুয়েক সন্ধান পেয়েছি।...গিয়ে কাগজ-পত্তর ঠিক করে নেবো।..."

তা হেমন্ত নিয়ে এসেছিল। সন্ধ্যার সময় ওরা হেঁটে পার হচ্ছে মস্ত মাঠটা। পেরুলেই একটা তালবন। তারপরে খোয়াই। খোয়াই পেরুলেই খানিকটা আবাদী জমি পেরিয়ে বিল। বিলের ধারে ওদের বায়না। দল সেখানে। জায়গাটার নাম রহমৎপুর। মোছলমান জমিদার; কিন্তু পাল-পার্বণে পালা-গান দিয়ে থাকে।

মাঠ পেরিয়েছে। মেয়েটার মাথায় টিনের তোরঙ্গ। হেমন্তর হাতে বোঝা, মাথায় বোঝা। সন্ধ্যের অন্ধকারে মেয়েটার বুক থেকে পরিশ্রমের নিঃশ্বাস ঘন ঘন বার হচ্ছে। শব্দ শুনছে হেমন্ত। মেয়েটার কাছ থেকে তোরঙ্গটা নিয়ে তার ওপরে বোঝাটা রেখে হেমন্তই বললো, "হালকা হয়ে পা ফেলে ফেলে চলো কাজল। তালবনটা একটা চোঁ-দৌড়ে পার হতে হবে।"

পার হতে পারে নি। তালবনের মধ্যে মস্ত ছোরা গেঁথে গিয়েছিল হেমন্তর পিঠে। কাজলকে কারা ধরে নিয়ে গেল। হেমন্ত শুধু শুনেছিল, "শালা আমাদের গাঁয়ের মেয়ে মেরে দিয়ে উধাও হবি মোছলমানের সকড়ি করার জন্যে। শালা পিচেশ! নুটু বিহারী না ফুট বিহারী। কূটবুদ্ধির জড়!"

ওরা ভেবেছিল নুটবিহারী। ভেবেছিল, মেয়ে চুরি করে পালাচ্ছে। ম্যানেজার শুনে, নুটবিহারীর পরামর্শে ওর কাছ থেকে একুশ টাকা জরিমানা

আদায় করেছিল। মেয়েটাকে বাগাতে, আনতে, ঝুটবিহারীর একুশ টাকা খরচ হয়েছিল। ওর পিঠে ছুরি গাঁথাটা কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনে নি।

সেসব দিন মনে করতে গেলে আজ হাসি পায় হেমন্তর।

সবচেয়ে বিপদে পড়েছিল বেহারে।

এক জমিদারবাড়ি থেকে মস্ত বায়না। বায়না সেরে দল ফিরছে। ফেরার পথে দু-চার গাঁয়ে যাত্রা চলছে। বাদিংপুর বলে একটা গাঁয়ের ধারে ছোট্ট নদী 'মনটানা'। তার ধারে মস্ত শিবমন্দির, মনেশ্বর মহাদেব, মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন; মনের কথায় পূজো নেন। মস্ত মেলা। সেখানে ওরা থামলো দিন দুয়ের মধ্যে।

সেখানেই দেখা বাসমতীর সঙ্গে। তার বাপ-মা বাঙালী ছিল বটে। সে বিহারী। বিয়ে হয়েছিল বিহারীর সঙ্গে। বাসমতীর মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না। বিধবা বাসমতীকে কেউ সাহায্য করছে না। মেয়ে ফুলেশ্বরীর বিয়ের জন্য বড্ড ভাবনা বাসমতীর। ধরেছে হেমন্তকে যদি বিয়ে করে।

হেমন্ত নিজে বিয়ে করবে না। তবে বাসমতী যদি পাত্র পায় বিয়ের খরচা দেবে হেমন্ত।

বাসমতী বলে, দেওকীনন্দন কাঠ-চেরাই করে। জোয়ান ছেলে। সে করবে বিয়ে। নগদ ত্রিশ টাকা চায়, আর গাঁয়ের লোকের দৈ-চিঁড়ে ভোজ। তা লাগবে প্রায় তিনকুড়ি টাকা।

বিয়ের রাত এল। বিয়ের ভোজ হলো। পুরুত বিয়ে দেবে। মন্ত্র আরম্ভ।

এমন সময় হাজির কেশোলাল, আড়তদার। পুলিস সঙ্গে।

বাসমতীকে সে থানা থেকে কবালা দিয়েছে লিখে। ও কনে তার কনে।

বাসমতী বেমালুম বললো, ওর অমতে নাকি হেমন্ত দেওকীনন্দনকে টাকা খাইয়ে একটা নামমাত্তর বিয়ে দিচ্ছে; পরে নিজের সুবিধা হবে বলে। বাসমতীর সাক্ষী অনেক। হেমন্তকে ধরে হাজতে নিয়ে গেল। কেস্ হলো। সাজা হলো। হেমন্তর ওপর দিয়ে কম ঝড় যায় নি। এ পথে তাকে ধীরে ধীরে সয়ে সয়ে শিখতে হয়েছে অনেক অনেক।

এখন অনেক সাবধান হয়েছে সে।

তবু ছাড়তে পারে নি এমন লাইন। এ লাইন যেন ওর রক্তের সঙ্গে জমাট বাঁধা লাইন। দিনের পর দিন রঙ্গস্থলে নেমে শত শত সু-কু দৃষ্টি সন্দিগ্ধ-সচেতন মনকে নিজের দিকে ফিরিয়ে এনে তারপর সেই কুটিল দৃষ্টি থেকে স্তব ঝরানো, সমস্ত মণ্ডপটাকে নাচিয়ে, হাসিয়ে, কাঁদিয়ে মাতিয়ে রাখার যে বিরাট সার্থকতা, এ যেন একটা নেশা। এই নেশা হেমন্তর মজ্জায় মজ্জায়। চিনি ওর ভালবাসার

জয়মাল্য। কিন্তু রূপমঞ্চ, পাদপ্রদীপ, ওর ভালবাসার দীপ্তি। সে দীপ্তি নৈলে চিনি যেন অন্ধের গলার মালা।

"এত ভালবাসে ও রঙ্গমঞ্চ। বলে, নটীদের পায়ের লাথি খেয়ে খেয়ে রঙ্গমঞ্চ যেন সব নটীর সেরা। কত যৌবনকে ও জরতে দেখেছে, কত আশা ওর বুকে জ্বলে ছাই হতে দেখেছে, কত স্বপ্ন ভেঙেছে, কত কুমারী কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছে ওর বুকে। তাই ও সবার বড় নটী, সবচেয়ে বেশী মন ভোলাবার ক্ষমতা ওর। এমন নট নেই যে রঙ্গমঞ্চকে ভালবাসে না। তবু সে ভালবাসা যেন বিষ-ভালবাসা। সাপুড়ে যেমন সাপ ভালবাসে। জ্ঞানী যেমন বেশ্যা ভালবাসে। ভালবাসে সত্যি, আবার ভয়ও করে; ভয় করে, কিন্তু ঘৃণা করে; ঘৃণা করে তবু সেই ভালইবাসে। বিচিত্র অধ্যায়। প্রতিদিনের গ্লানি ঐ রঙ্গ-মঞ্চেই ওর প্রতিরাত্রের সার্থকতা বাঁধা। এর টান অসম্ভব টান। নটী-নাটমঞ্চের লীলারসের কথা যখন ঐ হেমন্তই বলতে আরম্ভ করে যেন কেমন হয়ে যায়। সব ভুলে যায়।"

তবু মাঝে মাঝে কোনো কোনো কথা মনে করে ও যেন আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠতো।

আমি মাঝে মাঝে ওকে বলতাম সবই সওয়া যায়, নাটমঞ্চের ভেতরকার নোংরামি গেরস্ত ঘরের বৌয়ের যে সহ্য হয় না।

কি একটা অভিমানে আক্রোশে লাল হয়ে ওঠে ওর মুখ।

বলে, "নোংরা বলো না ওদের। ওদের মধ্যে এমন এমন চিত্র সব দেখেছি যে কাকে নোংরা বলবো জানি নে। ওদের দুনিয়াও একটা দুনিয়া কেবল আমাদের চেয়ে পৃথক। ওদের শুধু গাল দেওয়া সহ্য হয় না আমার। বস্তির নোংরাকে বস্তিবাসী গাল দিক। তুমি আমি যারা অট্টালিকায় আছি, তাদের কি অধিকার ওদের গাল দেবার। সে তো অবিচার। আমাদের অট্টালিকাতে কি নোংরামি নেই, অন্ধকার নেই। মানুষের ব্যবহারে, বিচারে নোংরামি অপরিহার্য। তা নিয়ে মানুষ বাঁচে না। বাঁচে নোংরামি সত্ত্বেও যে ফুল ফোটে। মেঘ ঢাকা সত্ত্বেও যে তারা জ্বলে। আমি, যে আমি সেও তো একটা বুড়ী নোংরা নটীর কৃপায়।" তারপর শোনায় সে কথাও।

এই রঙ্গমঞ্চের একটা অধ্যায়ে ওকে বাঁচায় এক বুড়ী নটী। রহিম বক্স বলে একটা সাজকর ছিল। মেয়েদের চুল করে দিতো। গাঁয়ের যাত্রায় মেয়েদের যদি লম্বা চুল না হয়, পালা জমে না। পাঁচ-ছ ইঞ্চি চুলকেও রহিম বক্স সাজিয়ে পিঠ ভরতি ঝাঁপানো চুল করে দিতে পারতো। সেই রহিম বক্স ছিল নটী কদম্বের পেয়ারের লোক। মোছলমানকে ভালবাসে, খবরটা ম্যানেজার কেন দলের কেউ

জানলে চাকরি যাবে। ওরা যতটা সম্ভব গোপনে থাকতো। একদিন কদম্ব করেছে নেশা। ঝোঁকের মাথায় ঢুকেছে রহিমের ঘরে। সে ঘরে তখন একমাত্র ছিল হেমন্ত। সে রাতে ওরই বিছানায় হেমন্ত শুয়ে ছিল। শীতের রাত সেটা। হেমন্তর কাছে তখন ভাল কম্বল কি লেপ নেই। শুধু কাঁথায় শীত ভাঙে না। রহিমের কাছে এসে শুয়েছিল ওর লেপের মধ্যে। কদম তা জানে না। সে তো এসে পড়েছে না জেনে। রহিম পড়লো বিপদে। হেমন্ত রহিমকে বললে, "ভালবাসিস কদমকে তুই। ও-ও তোকে ভালবাসে। জানিস রহিম, আমি এ ক'বছরে একটা মজার সত্য জানতে পেরেছি। এই নটীগুলো পুরুষদের লালসা নিয়ে শুধু কারবারই করে, যেমন মিষ্টিওলা মিষ্টি বেচে। যার হজম আছে, যার নেই, দুজনকেই সমান দামে, ওজনে বেচে। তাতে কি মিষ্টিওলার জাত যায়? মিষ্টিওলাকে লোভী বলি? নটীগুলোকে অসংযমী বলতেও আমার বাধে রে। ওরা তো ব্যবসা করে। নৈলে ওরা করবে কি? খাবে কি? সমাজে ওদের জায়গা কৈ? কিন্তু দেখেছি, মিষ্টিওলা সব মিষ্টি বেচেও বাসবার বেলা ভাতই ভালবাসে। তেমনি নটীরাও সারারাত দেহ বেচেও বাসবার বেলা কোনো একজনকে ভালবাসে। বেচে ওরা দেহই। তাতে কি ভালবাসার আহিঙ্কে মেটে রে? অথচ মেয়েমানুষের কলজে নিয়ে জন্মেছে। ভালবাসার জন খুঁজে খুঁজে ওরা যেমন সারা, তেমনি ওদের শতেক খোয়ার। তাই তো পোড়-খাওয়া পাকা-ঘুঁটি নটী অল্পবয়সী নটীর মনে প্রেমের গন্ধ পেলেই বকেঝকে দেয়। বলে, পীরিত বেচতে গেলে পীরিতে পেলে চলে না। ওতে ওদের ভারী ভয়। হোক ভয়; তাতে কি আহিঙ্কে যায়? জানিস রহিম, বামুনের ছেলে হয়ে তোকে আমি বলছি এ ক'বছরে এখানে যা দেখলাম আর শিখলাম বেশ বুঝলাম যে নটীদের ভালবাসা আছে। ওরাও ভালবাসে। কদম তোকে ভালবাসে এটা একটা মজবুত সত্য।" আর সে রাতে হেমন্ত বাইরেই শুধু চলে যায় নি, অনেক রাতে ওকে সেই শীতে বাহিরে'খান দুই কাঁথার মধ্যে শুতে দেখে ম্যানেজার যখন সন্দেহ করে জিজ্ঞাসা করে, "কে?" ও জবাব দেয়, "বাইরের এই বেশী বেশী শীত আমার বেশ ভাল লাগছে।" বিশ্বাস করার কথা নয়। সন্দেহ হয়। ম্যানেজার ঘর দেখতে চায়। "বেটা রহিম বুঝি কদমাকে নিয়ে পড়েছে।" তখন হেমন্ত বলে, "কি যে বলেন। চললাম ঘরে।" ঘরে ঢুকে দরজা ভেতর দিয়ে এঁটে দেয়। তবু ওদের ধরা পড়তে দেয় নি। ভালবাসত যে দুজনে দুজনকে।

সামান্য ঘটনা। কিন্তু হেমন্তর জীবন আর বয়সের কথা ভাবতে গেলে অসম সাহস।

সেই রহিম মারা গেল। কদমও বেঁচে নেই। আছে ওদের একটা মেয়ে। মেয়েটাকে ও আর ছাড়তে পারে নি। কদম দিয়ে গেছে মেয়েকে। বলেছে, "হেমুদা, কল্যাণী তোমার কাছে থাক। দেখো, ওকে যেন মাচানের পেত্নী না গেলে।" রঙ্গমঞ্চের করাল গ্রাসকে ভয় করতো না এমন নটী নেই। যে কদিন যৌবন সে কদিন মান ধন-আরাধনা। কতো জরাজীর্ণ নটীকে ভিক্ষা করতে দেখে এখনকার যুবতী নটীরা আতঙ্কে শিউরে ওঠে।

"কোথায় সে মেয়ে? কল্যাণী?"

"সে তো আমার বড় মেয়ের চেয়েও বয়সে বড়। হোস্টেলে থাকে। বাপের নাম বদলানো আছে। নিয়মিত টাকাও পাঠায়। যখন যাত্রার দল ভেঙে যায়, তখন খুব মুষড়ে পড়েছিলেন ঐ কল্যাণীর জন্যই। কল্যাণী বুঝেছিল সে কষ্ট। তখন রেডিওতে গান দিয়ে কিছু কিছু রোজগার করতে চায় ও; সিনেমায় মহলা দিতেও গিয়েছিল। উদ্দেশ্য ওঁকে সাহায্য করা; কিন্তু উনি শোনেন না, বাধা দেন। উনি বলেন, 'ওর রক্তে মঞ্চের নেশা। কি করে কতদিন আটকাব দেখি।"

আরও শুনি হেমন্তর কথা।

একদিন আধদিন নয়; দিনের পর দিন। এক-আধদিনের কথা নয়, বছরের পর বছরের কথা।

অধিকারী মারা যায়। অধিকারীর কেউ ছিল না। ছিল একজন নটী। আর ছিল ফুটবিহারী। অধিকারীই তাকে কোথা থেকে যেন জুটিয়েছিল। পুলিস আর জমিদার আর কাছারি এ তিন ছিল ফুটবিহারীর ত্রিনয়ন। আর কথায় কথায় নর্তকী জোটানো ছিল যেন ভেটেরার খোলায় খই ফোটানো।

ফুটবিহারীই শেখালো হেমন্তকে।

"অমন এ্যাক্টো করো তুমি; এমন কাঁচা বয়েস। ছাড়ো না কিছু টাকা। ঐ হন্যেমুখো পোড়াকপালীকে বিদেয় করি। মড়া ম্যানেজারের হাড় নিয়ে কি ও পাশা খেলবে নাকি?"

কিন্তু তাতে হয় নি।

যাবার আগে ম্যানেজার দলের ভার সেই নটী রানীকেই দিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সে নিজেই হেমন্তর কাছে এসে বললে, "দাদা, আর এসব নিয়ে থাকবো না। আমার আর দরকার কি? মাসান্তে কিছু দয়া করে পাঠিয়ে দিও। মা গঙ্গার কাছে গিয়ে পড়ে থাকি গে যাই।" সেই সে চলে গিয়েছিল। সঙ্গে গিয়েছিল তারই পালিতা কন্যা শ্যামলী। এদের গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নিয়ে দলের কাণ্ডারী হলো হেমন্ত। তার বুকখানা যেন দশহাত হয়ে উঠলো। এতদিনে রঙ্গভূমির

বাহুবন্ধনে সে নিজেকে ধরা দিলো, যেমন প্রথম বাসর রাতে প্রেয়সীর বাহুবন্ধনে যুগে যুগে পুরুষ ধরা দিয়েছে।

সে আনন্দের দুর্বার বেগে সে পালাগানের ধারা বদলে দিলো। ম্যানেজারী দিলো ঝুটু'কে। নিজে রইলো কেবল তার আর্টের তপস্যা নিয়ে। আগাগোড়া বদলে দিলো যাত্রাদলের সব কিছু ব্যবস্থা। খাওয়া নিয়ে তার অনেক চোখের জল অনেকদিন ঝরেছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে অচৈতন্য অবস্থায় অনেক আগুন-ঝরা রাত্রিকে সে অভিশাপ দিয়েছে। দলের লোকের কাপড়-চোপড়ের দুরবস্থা দেখে তার মনে হতো চরম দারিদ্রের কথা। এখন সে মাইনে-করা ডাক্তার রাখলো। ভ্রাম্যমাণ হোটেলের ব্যবস্থা করলো। বিনা পয়সায় সকলের লাভের অংশ থেকে সমান জামা-কাপড়ের ব্যবস্থা করলো। ঝুটবিহারী, করিতকর্মা ঝুটবিহারী হেমন্তর খেয়ালের রূপটা ধরতো তাড়াতাড়ি, আর তার রূপও দিতে পারতো খুব দ্রুত।

'হেমন্ত-যাত্রা-পার্টি' খ্যাতি অর্জন করলো। সংসার ভরে উঠলো কানায় কানায়। হেমন্ত বাপ, ভাই সবাইকে ডাকলো। হালিশহরে বাড়ি হলো। কাশী থেকে বাপ, ভাইকে নিয়ে এল। ওদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করলো। চিনি সংসার পাতলো। নতুন ঝাঁপি, নতুন উনুন, নতুন শাঁখ। এসব তার স্বপ্ন যেন। আর দফায় দফায় পেত শাড়ি, গহনা। পূজোর হিড়িকে যে রোজগার হতো তার লভ্যাংশ সকলে সমান পেত। বরাবর হিসেব পরিদর্শক এসে সমস্ত লাভটা তুলে দিত হেমন্তর হাতে। হেমন্ত তা চুলচিরে সমান ভাগ করতো। তারপর যে যা ইচ্ছে হেমন্তকে দিত তার দলপতিত্বের সম্মান। ঝুটবিহারী বলতো, "আজব ব্যবস্থা তোমার যাত্রাদলের। এমনটা দেখি নি কোথাও।"

"দেখ নি, দেখো", বলতো খুশী মনে হেমন্ত।

শুধু ঝুটু নয়, অনেকেই বলতো।

আর হেমন্ত-যাত্রা-পার্টিতে ভীড় লাগতে লাগলো অন্যান্য শিল্পীদের। কিন্তু না। হেমন্ত সেদিকে নজর দিত না। দল ভাঙানো মহাপাপ।

আজও হেমন্ত বলে, লোকসান তার হতো না। কিন্তু অমনি অন্য যাত্রাদলের কেউ যোগসাজস করে ঝুটুর সঙ্গে। যোগ দেয় হিসাব পরিদর্শক। লাভ থাকে না। চুরি যেতে লাগলো। শেষে আগুন লাগলো। লোক মলো। দেনা হলো। দল ভাঙলো। যেন ভরাডুবি হলো হেমন্তর।

মেয়ের দল তবু তার দিকে। "ঝুটুকে তাড়াও। আমরা টাকা দেবো দাদা। আমরা দেবো। এত সম্মান, এত আদর মার পেটের ভায়ের কাছে পাবো না। দল গড়ো ; ঝুটুকে তাড়াও।"

রাজী হয় নি হেমন্ত। গড়তে গিয়ে নাকি ভাঙা যায় না। 'যদি গড়িই গড়বো। তাড়াবো না কারুকে', এই কথা হেমন্তর। সকলেই নাকি নিজ নিজ ভাগ্যে খায়। এর মধ্যে হেমন্ত কেউ নয়। দল যদি বাঁধেই সকলকে নিয়ে বাঁধবে। কারুকে বাদ দেবে না। কিন্তু দল সে বাঁধবে না। আর বাঁধবে না।

বাঁধে নি আর দল। কিছুদিন ঘুরেছে। চিনির গহনা এক একখানা করে বিক্রি করেছে। তার দায় যাদের যাদের কাছে তাদের কাছে হারে নি। শেষ অবধি হুটবিহারীরই হাতযশে চাকরি পেয়েছে 'রঙ্গশ্রী'তে। প্রথম প্রথম মাসে একশো। এখন আড়াইশো করে পায়। তা ছাড়া বছরে একটা সাহায্য-রজনী। যেদিন মাইনে নেয় হাত পেতে সেদিন হেমন্ত হাসে।

৪

"জানিস্ আমি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি, এজন্যে আমি জন্মাই নি। এভাবে আমি মরবো না। মাস গেলে হাত পেতে টাকা নিয়ে শিল্পের সেবা আমি করবো না রে।·· ···" বলেছিল হেমন্ত।

আমি ওর এ রূপটাকে চিনি। ও শিল্পী। সত্যিকারের শিল্পী। বাংলার ক্ষেতে কেবল নরম মাটি নেই, কেবল নেই সোনা-ধান, ভাটিয়ালি-গান আর দীঘল চোখের নরম চাউনি। বাংলার ক্ষেত-মাঠ-বন-বাদাড়-প্রেতজমি আর রুক্ষ প্রান্তর জুড়ে আছে এক ভস্মে-গৈরিকে ঢাকা মহাশ্মশান, তন্ত্রের পীঠ। সেখানে সব-এককরা, আগুনক্ষরা এক দুর্মদ সন্ন্যাস কাপালিকের আসনে বসে খোঁজে সিদ্ধির অত্যাশ্চর্য। তাই বাংলায় এক এক শিল্পী এক এক যুগে জন্ম নিয়ে চরম ত্যাগ স্বীকার করে উত্তরপুরুষের পাথেয় সঞ্চয় করে গেছে।

সেই ধাতুতে, সেই মাটিতে গড়া এই হেমন্ত। ওর চোখে, বুকে দারুণ তৃষ্ণা, ওর মনের বেদীতে নটরাজের আসন। তৃপ্তি নেই ওর, শান্তি নেই। ও কাপালিক, কেবল বলে 'পানীয়ং দেহি মে'; আরও পানীয়, আরও, যাতে আকণ্ঠ এই নীল জ্বালা শান্ত হয়।

"···হাত পেতে টাকা নিয়ে নাচ দেখাবো, আমি কি পুরুষ বেশ্যা? আমি আমার সামনের জগৎকে মানুষবোধের পরিচয়পত্র দিয়ে যাবো। জীবনকে জীবনতর, প্রাণকে প্রাণতর করার স্বপ্ন আমার। মানুষ বাঁচতে চাইবে, সম্পদ পাবে আমার কাছ থেকে পাওয়া এই দু দণ্ড থেকে। ···"

আমি বলি, "ধুলোর পৃথিবীর মানুষ আমরা হেমুদা, এত আদর্শ রাখবো এমন স্পর্ধা কই? বেশ আছ। যা আছে তোমার পক্ষে যথেষ্ট।"

"যথেষ্ট? জানো কটা মুখ আমার মুখে চেয়ে?"

এই কথাটা পাড়ার জন্য আমি ছিলাম উদ্‌গ্রীব। বলি, "নিজে বাড়িয়ে বাড়িয়ে যথেষ্ট দায় ঘাড়ে নিয়েছো। আর নয়। এখন এক এক করে কাটো।"

"কাটবো?" চমকে ওঠে যেন হেমুদা। "কাটবো কি? কাকে? বাপকে? ভাইকে? ভাইএর বৌকে? কাকে? ওদের যদি কাটি তো চিনিকে, মেয়ে দুটোকে কাটবো না কেন?"

বেশী বাড়াবাড়ি করলে টিকবে না। আমি বলি, "ওদের কথা না হয় ছেড়ে

দিলে, কিন্তু দুজন এমনি মেয়েমানুষের খোরপোশ তোমার স্কন্ধে। তা ছাড়া কোন্ কর্মচারীর বক্রী প্রেমের ওপচানো ফল তার কলেজের খরচা তোমার। এসব পারবে কেন? তার চেয়ে…"

আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ ও বলে, "তার চেয়ে? কি? বল।"

আমি একটু যেন ঝিমিয়ে গেলাম সেই চাউনিতে।

"তার চেয়ে নিজে শিল্পসাধনা করো, সংসারের দিকে নজর দাও। মেয়েদের মানুষ করো, চিনিকে শান্তি দাও।"

খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেল ও।

আশ্বিনের প্রথম দিকের ঝরঝরে সকাল। দুটো শালিক সামনের একফালি বাগানে টাঙানো লতাকুঞ্জের মধ্যে বসে ক্রমাগত চেঁচাচ্ছে।

"তাই বুঝি বলেছে চিনি। তার শান্তি নেই।"

কী সর্বনাশ! একি বলছি আমি। এ তো বলতে চাই নি।

"না না, হেমুদা একটিবারও চিনি একথা বলে নি। বরং উল্টোটাই বলেছে।"

"কী বলেছে।" পৌরুষ যেন ছড়িয়ে পড়লো চারধারে। দেখতে অপরূপ গঠন এই হেমুদার। টকটকে রং, বড় বড় চোখ। গলার স্বর ভরাট, মজবুত অথচ কেমন একটা ঝঙ্কারময়। চমকে উঠলাম।

"চটছো কেন হেমুদা। আমাদের কথাবার্তার মধ্যে তাকে টানছো কেন? তোমাকে পেয়েই তার শান্তি। সে শান্তির কথা তো তোমার অজানা থাকার কথা নয়।"

"তা নয়; তবু তার অশান্তি কি? শ্বশুর-দেওরে অশান্তি, না আমি বেশ্যাবাড়ি টাকা দিই?"

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম উত্তেজনায়। "ছি-ছি-ছি, এসব কি কথা উচ্চারণ করছো সকালবেলায়। তুমি তো তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করছো!"

"ঠিক তাই। তবে আমি বাদ দেবো কোন্‌টা, কতটুকু?"

"ভেবে দেখতে গেলে কিছুই বাদ দিতে পারো না। তবে আমি যা বলছি তা বোধহয় তুমি বুঝবে না।"

"বুঝি ভাই, তাও বুঝি। আমি সত্যিকার বাউণ্ডুলে, বৈরাগী। আমি কিছুতেই সবাইকে নিয়ে যেমন সাধনা করতে পারি না, তেমনি একা একা ভোগ করতে পারি না। সবাইকে জড়িয়ে না নিলে আমার রসের ভোগটা পুরো হয় না। ওরে, একা একা মুখ জুবড়ে যারা খায় তারাই তো জানোয়ার। ভাগ দিতে আর নিতে মানুষই জানে।"

হেসে বলি, "পারবো না বৈরাগী ঠাকুর তোমায় এ পাঠ পড়াতে। তুমি এই-ভাবেই থাকতে এসেছো, এইভাবেই থাকবে।"

"কিন্তু কতদিন? কতদিন এইভাবে দাসত্ব করবো রে? এর চেয়ে সেই যাত্রার দল আমার বেশ ছিল। দাসত্ব, নয়, শুধু বারে বারে হাতফের। প্রভু বদলে বদলে উন্নতি। এর মধ্যে কোথায় যেন শিল্পী জীবনেও নীচতার স্পর্শ পাই। নীচ হতে কে চায় বল্? কার ভাল লাগে?"

"হাত যখন বদলাবে তখন বদলাবে এখন কি তার?"

"এখনই তো সেই ধাক্কা এসেছে। 'রঙ্গশ্রী' তো হাতবদল হচ্ছে। মালিক বেচে দিচ্ছে সব। মারোয়াড়ী মালিক হবে। এখন কি জানি কি সব রুচির বই দেবে, ভয়ে সারা হচ্ছি।"

সংবাদটা বড়ই ঘোরালো।

বুঝলাম শ্রীমান কেন এত বিচলিত।

"এর মধ্যে নতুন বই একখানায় হাত দিয়েছিলাম। 'চন্দ্রশেখরে' এত নাম হবার পর ওরা একখানা ঐতিহাসিক করতে চাইছিল। চমৎকার নাটকও পেয়েছিলাম। সব গেল ভেস্তে। রঙ্গপীঠের দাসত্ব করার বড়ই দায়। রঙ্গপীঠ লাথিঝাঁটা মারবে, আজ বুকে নিয়ে কাল নর্দমার পাকে ফেলবে, কিন্তু ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে দাঁড়ালে চুম্বকের মতো টানবে ঐ কয়েক গজ মাটি যার এধার ওধার কিছু কাপড়, রং আর কাঠের ফ্রেম দিয়ে মোড়া। পাদপ্রদীপের আলোর টান ময়াল সাপের চোখের টানের বড়ো, সাইরেনের ডাকের চেয়ে রঙ্গপীঠের ডাক দুঃসহ।"

আমার কাছে ওযুধ কারখানার দুই সাদা মক্কেলের আসার কথা। ও চলে গেল। কিন্তু রেখে গেল আমার মনে চিন্তা। জিজ্ঞাসা তো করি নি কত টাকা লাগবে। কিন্তু যতই লাগবে আমি পাব কোথা থেকে? হঠাৎ মনে পড়ে যায় বোম্বাই। সেই সিনেমা গড়া, রসিকদার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা, উড়িষ্যার রাজাসাহেব। সে সব এখন স্বপ্ন। যদি তেমন কারুকে পেতাম ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা কি আর? কিছু না।

কিন্তু পারবে কি হেমন্ত নিজে মালিক হয়ে প্রতিষ্ঠান চালাতে? হোটেল চালানো, দোকান চালানো, স্কুল চালানো এক ব্যাপার; আর রঙ্গালয় চালানো সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। নীচ হতে নীচ, হীন হতে হীন ব্যবহার করতে হয়, সইতে হয়। উচ্ছৃঙ্খল, ব্যভিচারীর সঙ্গে রসিক ও গুণী সুধী এখানে জড়ো হয়। সকলের সম্মান-সুবিধা-রুচি-তৃপ্তি দেখতে বুঝতে হয়। এর গৃহস্থালি সেরা গৃহস্থালি। পেরেক থেকে নিয়ে জীবন্ত মানুষ পর্যন্ত বেচা, কেনা, রাখা, দেওয়া করতে হয়। এ সব তো শিল্পীর কাজ নয়। ও পারবে কেন?

হেমন্ত বলতো, "শ্মশানের ডোমের মন যার সেই হতে পারে রঙ্গালয়ের ম্যানেজার। বাইরের নিষ্ঠুরতা যার ভেতরের পরিচয়ের কণাও বহন করে না। আমরা মড়া-পোড়ানো ডোম। শ্মশানের ছাইমাখা গৃহী-সন্ন্যাসী।"

দু-দশ দিনের মধ্যে চিন্তার উগ্রতাটা ম্লান হয়ে এল। সকালবলায় অত্যন্ত রুক্ষ-উদাসীন দৃষ্টি নিয়ে আবার এল হেমন্ত। "আজই ডীড্ হবে। 'রঙ্গশ্রী' বিক্রি হচ্ছে।"

"কে কিনছে?"

"আমি।"

"তুমি? কত টাকায়?"

"ত্রিশ হাজার!"

"ত্রিশ হাজার!" চমকে উঠি। "এত টাকা ছিল কোথায়?"

"ছিল আবার কোথায়? নেইতো।"

"পাগলের মতো কি বলছো। আজ ডীড্। ত্রিশ হাজার দরকার। অথচ টাকা নেই বলছো। ব্যাপার কি?"

হাঁ মুখ করে আমার নাকের কাছে এনে বলে, "গন্ধ শোঁখ। একেবারে যেন গঙ্গার বুক। নেশা করি নি।"

আমি হাসি, "ব্যাপার কি বল!"

"অনেক অনেক ব্যাপার। কি যে করতে যাচ্ছি জানি না। কিন্তু করবো একটা বিশেষ কিছু। যাবি আমার সঙ্গে কোর্টে?"

"যাবো। কিন্তু সব জেনে তারপরে যাবো। তোমার রোম্যান্টিক মনের স্রোতে আমার ফুটো ডিঙ্গি এমনি ভাসানো চলবে না।"

হাসতে হাসতে বললো, "জানাবো। তোকে সব জানাবো। আফিসটা বন্ধ কর। একটা ট্যাক্সি ডাক। কোথাও চলি চল।"

ট্যাক্সি এল।

"কিন্তু সঙ্গে আমার একটি পয়সা নেই। ক্ষিধে পেয়েছে। খাবো কিছু। তার পরে সব বলবো।"

খাবার মতো পয়সা নেই। ট্রাম ভাড়া নেই ট্যাঁকে। কয়েক ঘণ্টা পরে ত্রিশ হাজার টাকার সম্পত্তি কিনবে। পাগল হয়ে গেল নাকি হেমন্ত?

কলকাতার পথ এখন সরগরম। ট্যাক্সি চলেছে ফাঁকার দিকে। এ সময়টা বেলুড়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসতে খারাপ লাগবে না। সেখানেই ঘাটের পাটাতনে বসে বসে শুনলাম অপূর্ব এক উপন্যাস।

সে উপন্যাস জীবনেই সম্ভব। কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে তাকে অবিসংবাদী অবাস্তব অভিধা দেওয়া হবে।

সে উপন্যাসের প্রধানা নায়িকা হেমুদার সেই যাত্রাপার্টির বিলাসী। তার নায়ক এক অদ্ভুত তোজোদৃপ্ত পুরুষ। এই পুরুষটাকে বিলাসী কি মন্ত্রে বশ করেছিলো সেটাই নারীর অঘটন-ঘটন-পটীয়সীত্ব। এ মন্ত্র-কুহক ওরাই জানে। এই উপন্যাসের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে রানী আর শ্যামলী; ওরা কেমন যেন জড়িয়ে পড়েছিল এই উপন্যাসের কাঠামোয়।

বিলাসীর সঙ্গে সেই পুরুষের দেখা বোম্বাইয়ে। বিলাসীকে সে পায় হুটুর কাছ থেকে। বোম্বাইয়ে সিনেমার একটা কাজে নিয়ে যেতে চায়। চাইবেই; সেকালে বিলাসীর রূপের একটা দাম ছিল। সে দাম পুরোপুরি দেবার ক্ষমতা যার ছিল, পরিবর্তে সে এক লাবণ্য-কল্পিত মদিরা-তপ্ত যৌবনকে আস্বাদনই করতো না শুধু, একটা থরোথরো কম্পিত চিত্ত-বৈচিত্র্যের অনুরাগ-রাগকে স্পর্শ করার লালসায় ব্যাকুল হতো। সিনেমার স্টুডিও অবধি পৌছতে হয় নি বিলাসীকে। প্রথমেই তাকে নিয়ে যাওয়া হলো ভাল বাড়িতে। সেই শালপ্রাংশু বিরাট পুরুষের সর্বোত্তম উপচার হয়ে বিলাসী সেখানে থাকে।

কিন্তু বিলাসীর ভাল লাগে নি এই মদির জীবন। কারণ বিলাসী হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল যে সেই বিরাট পুরুষকে সে নিজেই ভালবাসতে শুরু করেছিল। একদা বারবার বিলাসীর মা বিলাসীকে সতর্ক করেছে, সেই সঙ্গে সতর্ক করেছে অন্য সব বিলাসীদের, বিলাসী তা স্বকর্ণে শুনেছে; বাল্য, কৈশোর, তারুণ্যের পর্দায় পর্দায় বেজে উঠেছে সেই সতর্কবাণী, "আর যা করিস্, ভালবাসিস্ না বেসেছিস কি মরেছিস্।" ভালবাসার আস্বাদন পেতে না পেতে সে শিউরে উঠেছে।

মন দেবে না যারা দাম দেবে কয়েক মিনিট দেহের ভাড়া, তাদের মন দেওয়া দেউলে হবার সোজা পথ। দেহোপজীবিনীরা যা বেচবে তাতে লোভ না রেখে বেচবে; যাকে বেচবে তাকে সওদা দেবে। তবু জেনে শুনেও অদ্ভুত এক খেয়াল চেপেছিল তার মাথায়। সে গৃহস্থ হবে। তার প্রাণের পুরুষটিকে নিয়ে গৃহস্থালি পাতবে। কার্তিককে ছেড়ে লক্ষীর পূজো করবে; কালী ছেড়ে গৌরীকে। তার আঁচল টানবে শিশু হাত, তার প্রসাধনের সর্বনাশ করবে দুরন্ত বালক, তার যৌবনের মায়া সে বিলিয়ে দেবে নতুন যৌবন রচনায়।

এ যেন একগাদা খড়ের গাদায় একছিটে আগুন। যখন জ্বলে দাউ দাউ করে জ্বলে। চিতার মতো জ্বলে। প্রিয়তম দেহ জ্বলে ছাই হয়ে যায়, আঁচের নিষেধে কাছে যাওয়া যায় না। দাঁড়িয়ে দেখতে হয়।

প্রথম প্রথম ও চাইলো। ভিখারিণীর মতো নয়, রাজেন্দ্রাণীর মতোও নয়। শুধুই বাঙালী মা-বোনের মতো চাইলো। কিন্তু বেশীদিন লাগলো না বুঝতে 'যেচে' আর কিছু পাওয়া গেলেও 'মান' আর 'সোহাগ' মেলে না।

তা ছাড়া চাওয়া! সেই যেন এক বিড়ম্বনা। যাকে সমান-সমান করে মিশিয়ে গলিয়ে পাবার আশা, তার কাছে যাচ্ঞা।

পালিয়ে গেল বিলাসী!

কোথায় আর পালায়। এই কলকাতায়। অবশেষে পেয়ে গেল আস্তানা রানী আর শ্যামলীকে।

"সেই যাত্রাদল থেকেই ওরা আমায় ডাকতো মেজকর্তা বলে। বড়কর্তা বলতো অধিকারীকে।" গল্প বলতে বলতে হেমুদা বললো।

ও রানীকে বললে, "মেজকর্তার কৃপায় আছ তোমরা, ভাবনা কি? দু'মুঠো আমাকেও দিও।" রানী ভাবলো, আপাতত থাকুক তো। পরে দেখা যাবে। প্রবীণা রানী জানে, ওদের এই নির্লিপ্ত ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র চিত্তকে পদ্মপত্রের মতো রাখা। জল ছুঁলেও, দাগ যেন না ধরে। "পদ্মের পাতা গেরস্তালির কাজে পা বাড়ালেই আস্তাকুঁড়েতে গতি পায়; ও পেতেই হবে।" বলেছে রানী, আর সঙ্গে সঙ্গে বিলাসীর চুলও বাঁধতে বসেছে।

ওদের যে কি কষ্ট ওরাই বোঝে।

এর মধ্যে সেই পুরুষ দৃপ্ত হয়ে উঠেছে, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। বুঝেছে বিলাসী মেয়ে নয়, যৌবন নয়, পিপাসা; বুঝি পিপাসাও নয়, শান্তি। শেষ শান্তি। তার অশান্ত বিক্ষুব্ধ জীবনে টাকার অভাব নেই, নারীর অভাব নেই, অভাব ছিল বিলাসীর। কোথায় গেল সে?

তাই সে কলকাতায় এসে আবার তল্লাসে লেগেছে। এবং পেয়েছে খুঁজে বিলাসীকে এই বিবরে।

বিলাসীকে নিয়ে ঘর বাঁধবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে বিলাসীকে প্রায় রাজী করে এনেছে। ওরা বোম্বাই যাবে। সব ব্যবস্থা হচ্ছে। একদিন ও আর বিলাসী বেড়াতে বেরিয়ে আর ফিরলো না। রানী চিন্তিত হয়ে টেলিফোন করবে পুলিসে, এমন সময়ে রানীর দরজায় পুলিস হাজির; থানায় যেতে হবে।

সেখানে গিয়ে শোনে নিদারুণ দুঃসংবাদ।

বিলাসী বিকেলে বেরিয়ে গিয়েছিল ট্যাক্সি করে। কোন এক হোটেলে ওর জন্য সেই পুরুষ অপেক্ষা করবে। সেখানে গিয়ে দেখে পুরুষটি আছে, কিন্তু যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

বিলাসী ওকে নিয়ে ডাক্তারখানায় গেলো। ডাক্তার দেখে বললো বিষ।

সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরুষও বলে উঠলো, "বিষ, বিলাসী, বিষ। এখুনি আমায় থানায় নিয়ে চলো। নৈলে তোমায় যে মহাবিপদে ফেলে যাবো।" ডাক্তার, আর তিনি—থানায় এল সবাই। প্রথমেই রোগী বললো, "আর কিছু নয়, তদন্ত হবে, পরে হবে, কিন্তু আমি শুধু বলতে এসেছি, লিখে রাখো তোমরা, বিলাসী আমায় বিষ দেয় নি। সে মাত্র আমার কথা মতো আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে এই অবস্থাতেই আমায় পায়। কিন্তু যারা আমায় মেরেছে বিলাসী তাদের—" সর্বনেশে এই কথা অসমাপ্ত রেখে সেই মহাপুরুষটি মারা যান।

কোর্ট আদালত হলো। এমন কি রানী আর শ্যামলীরও বেশ কিছু দুর্ভোগ গেল। কিন্তু বিলাসীর জেল হলো। সে অন্যান্য খবর জেনেও দিচ্ছে না এই অপরাধে 'একম্‌প্লিস্‌' বলে সাজা পেলো। সাজা পেলো লাইসেন্স না নিয়ে দেহের ব্যবসার অশুচিতা সমাজে ছড়াবার অপরাধে। বিলাসী কাঁদে নি, কাঁপে নি। হাসিমুখেই জেলে গেছে। বলেছে, "রানী মাসী, আমার কাছে জেলই মুক্তি। মুক্ত হয়ে যেখানে থাকতে হতো তাই যে বিষম জেল। তুমি কেঁদো না রানী মাসী। আমি খুব ভাল থাকবো।"

আমি ডুবে গিয়েছিলাম গল্পে। হুঁস পেয়ে বলি, "সব তো হলো। টাকা কোত্থেকে পেলে তা বললে না?"

"বলি নি কেন? সেটা খুবই একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো এর পর। এর অসাধারণ পর্বটাই তোমায় শোনালাম মন দিয়ে। রঙ্গমঞ্চের বুকে চড়ে ঐ যারা নাচে গায় তারা যে মাঝে মাঝে পাগলা হাতীর মতো কেমন ক্ষেপে গিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে ভাবতে আমার বেশ মজা লাগে। টাকা তো খুব সহজ ব্যাপার। মানুষের মনই হলো অপূর্ব রচনা। লাখ টাকাতেও একটা টুকরোও মেলে না।"

টাকার কথাও শুনলাম। এর পরেই সে কথা এল।

রানীই বলেছিলো কথাটা বিলাসীকে—"করকরে টাকা অনেক টাকা। একচল্লিশ হাজার টাকা তোর মানুষ আমায় রাখতে দিয়েছিল সর্বনাশের দুদিন আগে। মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিলো যেন তোকে না বলি। আমি বলেছিলাম 'এতো টাকা নগদ। বাঙ্কে রাখো না।' আমার চিবুক নেড়ে বলেছিলো 'আরে মাসী, সব টাকা ব্যাঙ্কে রাখা যায় না। দেখছো না কেবল দশটাকার পাঁচটাকার নোটের গাদি। ওসব টাকা এমনি হাতে হাতেই ক্ষয়িয়ে দিতে হয়। সে টাকাগুলো কি করবো রে!"

বিলাসী জবাব দিয়েছিল, "আমার দরকার নেই। মেজো কত্তার ভারি কষ্ট এখন। টাকাটা তার হাতে দিও। যদি ছাড়ান পাই তখন যাতে মাথা তুলে থাকতে পারি।"

কথাটা রানীর মনে লেগেছিল।

"সেই টাকা?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় সে টাকা?"

"রানী আনবে কোর্টে বলেছে!"

"যদি না আসে?"

"ফিরে আসবো এই গঙ্গার ঘাটে। আবার গল্প রচনা হবে মহাকালের পাতায়।"

"চলো তবে। আর দেরী নয়। সময় হলো।"

"চলো।"

পথে যেতে যেতে কেবলই মনে হতে লাগলো 'পুরুষ', 'পুরুষ' বলে গেল। উপন্যাসের নায়ক হবার পাত্র এই পুরুষটি কে?

জিজ্ঞাসা করি হেমুদাকে।

হেমুদা বলে, "ওরে এ কাহিনী তো আমি সবে দুদিন হলো জেনেছি। ওদের ভাষায় ওরা যখন এসব রং ঢংএর গল্প বলে যায় এমন পুরুষদের নাম বলে না। বললেও নিজেদের দেওয়া নাম বলে। বেশীর ভাগই 'বাবু' বলে কাটায়। অমুকের বাবু। আমি তো 'বিলাসীর বাবু' বলেই জানি। তোর জানতে সখ যায়, রানী তো আসবে, জিজ্ঞাসা করিস।"

কিন্তু কোর্টে রানী আসে না। বাড়ীওলা, স্টেজ মালিক, রঙ্গশ্রীর মালিক, উকিল, ভীড় সব তৈরী—কিন্তু কৈ টাকা!

হতাশ হয়ে হেমুদা বসে পড়েন কোর্টের সিঁড়ির কোণায়। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

"রানী তোমাকে ঠকাবে না তো হেমুদা?"

হেমুদা বিশীর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললো, "বলতে পারি কি তুমি আমায় ঠকাবে না?"

পর পর ট্যাক্সি মোটর চলছে ছুটে। গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসছে স্টীমারের বুক ছেঁড়া সিটির আর্তনাদ। সুপুরি আর নারকেল গাছের পাতার ঝলকানি জানাচ্ছে, 'গঙ্গার ধারে এই বাগানখানায় বোসো, শান্তি পাবে। কি ঝঞ্ঝাট এই কোর্ট আর ভীড় নিয়ে?'

যখন মানুষ হালে পানি পায় না তখন নির্বেদের আমসত্ত্ব চাটে।

হেমুদা হঠাৎ আমার হাতটা চেপে বললো, "বাড়ি ফেরা যাবে হেঁটে, কি বল্? এখন দু'আনার ছোলাভাজা আন্।"

মনে হোলো সেই সকালে বেরিয়েছি। কিছু খাওয়া হয় নি। হেমুদা সুখী মানুষ। আমার পকেটও প্রায় খালি।

অথচ আজ আমরা কিনতে এসেছি স্টেজ সমেত "রঙ্গশ্রী", ছত্রিশ হাজার টাকা মূল্যে !

ছোলাভাজা এনে তুজনে খাচ্ছি। লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছি, অন্য পার্টি না দেখে ফেলে। অথচ চোখ রেখেছি রানী নামের আবির্ভাবটি কখন হবে।

একটা সময়ে হেমুদা সোজা হয়ে গেট অবধি হেঁটে এলেন। একটি বৃদ্ধা মহিলা আগাগোড়া সাদা চাদরে ঢেকে এসে দাঁড়ালেন।

"রানীদি ! এত দেরি !"

রানী একটা বাণ্ডিল নামিয়ে দিয়ে বললে, "সেসব ছিলো দশ আর পাঁচ টাকার নোট। আজ তুদিন ধরে সবগুলো একশোর নোট করছি।"

"কেন, কেন এ তুর্ভোগ ?" হেমুদা বলেন।

রানী বলে, "বড়ো সোজা তুমি মেজো কর্তা। বড় সোজা। আমরা পুরোনো পাপী। কিসের না কিসের টাকা। এই কোর্টে এনে ফেলবো। যদি নম্বরটম্বর গোলমাল থাকে। তাই বদলে নেওয়া দরকার। কি কাজ বাপু, বামুনকে সুখে থাকতে দিতে গিয়ে বিপদে ফেলবো।"

আমি প্রথম কথা বললাম, "এত পরিশ্রম এই বুড়ো হাড়ে করলেন আপনি ?"

সহজে ওদের কেউ 'আপনি' বলে না।

আমার দিকে চমকে তাকালে নিশ্চমক একটা দৃষ্টিতে ধোঁয়া ঢাকা আলো নিয়ে।

হেমুদা বলে, "আমার আর চিনির বন্ধু সোম।"

"ওঃ তোমার কথা অনেক শুনেছি মেজ বৌদির কাছে ভাই। কষ্ট করবো না ? মেজো কর্তা যে ! ওর জন্যে মুখে রক্ত ওঠা কিগো, বুকের রক্ত দিলেও—"

হেমু বলে, "আঃ কি সব বকছো। এটা কোর্ট !"

বুড়ী বলে, "যাঃ এ বুকে কি আর রক্ত আছে নাকি যে দেবো ? ও একটা কথার কথা। বলতে পেলে বুকে আরাম লাগে।"

ডীড্ হয়ে গেল।

মালিক হয়ে গেল হেমুদা 'রঙ্গশ্রী'র !

আর তার ম্যানেজার হলো নুটবিহারী। ডীডের অন্যতম সাক্ষী।

কিন্তু সেই টাকার সাক্ষী রানী মাসী বুড়ী, বিলাসী জেলে; হেমুদা স্বয়ং এবং আমি।

ফিরলাম ট্যাক্সিতে। আমি আগ্রহ চাপতে পারছি না। বললাম, "কে লোকটা রানীদি, যে মরে বাঁচিয়ে গেল হেমুকে ?"

"তার কথা ? আমি ভুলবো না সেই কত্‌কতে ছেলেটার কথা। কী রূপ, কী স্বভাব, কী গুণ গো।"

বলছে আর হাতের ব্যাগটা থেকে কি বার করছে। "তার ছবি একখানা রেখেছি আমি। আজ বারবার দেখেছি। তার কথা আজ মনে হবে না গো ? এই দেখ। কোথায় এর মরার কথা লেখা আছে দেখ।" বুড়ীর দু'চোখে জল।

হেমন্ত ছবিখানা দেখে বিনা কোনো প্রকার আলোচনায় আমার হাতে দিলো।

আমি ছবি পেয়েই চমকে উঠে বলি, "বসাক না? বসাকই তো। রসিকরঞ্জন বসাক।"

বুড়ী আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

হেমন্ত বলে; "চিনিস তুই ? চিনতিস ?"

আমি বলি, "যেমন তোকে চিনি।"

রসিকরঞ্জন বসাক আমার জীবনে শেষবার আবার সেই ক্যাপিটাল সংগ্রহ করে দিয়ে গেল। আমার জন্য নয় ঠিকই। কিন্তু যখন আমি ক্যাপিটালের জন্য বারবার তাকে স্মরণ করেছি, তখন আমার অগোচরে সে সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করে গেল।

আমি ভাবলাম, যদি আমি বিলাসী হতাম আমি বলতাম 'কারাগারের মুক্তিই বেশী আরামের।'

৫

আমার যে কিছু হচ্ছে না সেটা আমার চেয়ে বেশী আর কে বুঝছে? অথচ কারবারই বা কি আছে। পড়বো না পড়বো না করেও জড়িয়ে পড়ছি 'রঙ্গশ্রী'র বন্ধনে।

ওষুধের দোকানগুলোয় রোজ যাতায়াত আছে। মাঝে মাঝে হিন্দুস্থানময় চরকির মতো ঘোরা আছে। আর আছে রঙ্গশ্রী—হেমন্ত-চিন্ময়ী।

হেমন্ত যখনই রঙ্গশ্রীর কথা বলতো মনে হোতো রঙ্গশ্রী যেন ওর কোনো অতি প্রিয়তমা নটী। আমরা তা নিয়ে ঠাট্টাই করতাম। তবু কিন্তু পুরোপুরি জোর পেতাম না ঠাট্টায়। কারণ ও এতটা নির্ভরে অমন কথা বলতো যে আমরা বুঝতাম আমাদের কাছে ঠাট্টা হলেও মঞ্চ, নাট্য, শিল্প ওর মনোমায়া, স্বপ্নছবি। আমাদের ঠাট্টার ঠুনকো ফুলকি ওর মনের জৌলষের কাছে হার মানতো।

কিন্তু শুধু হেমন্তই নয়। হেমন্তের সেই 'মঞ্চ-প্রেতিনী' আমাকেও বাঁধছে। কে বলে মঞ্চ কেবল কাঠ, আর কাপড়, আর বাঁশ, আর দড়ি, আর আলো। কে বলে তার ধুলোয়, ঝুলে, গন্ধে আর অন্ধকারে, আবেশ নেই; নারী-দেহের কর্দমের সুগন্ধ নেই; কবরীর মাদকতা, ঘর্মের সিক্ততা, আশ্লেষের নিবিড়তা নেই? নাগিনীর মতো তার বন্ধন। তার সামনেটার আলো পেছনের অন্ধকারকে দূর করতে পারে না; তাব প্রসাধন তার অন্তরের রহস্যকে সাধনের বস্তু করেই রাখে। মানুষ-মনের যত অলিগলি, সেসব অলিগলির পাকে পাকে যত মুখ, যত ছায়া, যত বৈচিত্র্য, তার অনেক অনেক বেশী অলিগলি মঞ্চের যবনিকার পেছনে, মঞ্চের পাটাতনের তলায়, মঞ্চের আশেপাশে; তার দড়ির পাকে; পুলির টানে, চাকার ঘর্ঘরে, তার সাজঘরে, মহলাশালায়, বুকিং আফিসে।

আমি দিনের পর দিন ধরে এই রহস্যের নিবিড়তা ভোগ করেছি। দিনে, রাতে, সকালে, সন্ধ্যায়, অভিনয়ের দিনে, মহলার দিনে, এমনি দিনে, বার বার, ক্রমাগত গিয়েছি, থেকেছি, শুয়েছি, বসেছি, ছেড়ে চলে আসার সময়ে আবার ফিরে আসার আসক্তি নিয়ে এসেছি।

এই বন্ধনে তিলে তিলে জড়িয়ে পড়েছি, ঠিক যেমন কাপালিক জড়িয়ে পড়ে শ্মশানের বন্ধনে।

মা নেই আমার, যে আমার এই মায়া-মদিরার গন্ধ তাঁর প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করবেন ; আর গ্রহণ করে তাঁর কল্যাণময়ী হাতের বেড়ের মধ্যে দুর্গ রচনা করে আমায় রক্ষা করবেন।

কিন্তু বাবা তো তখনও বেঁচে। আমার সেই নতুন উন্মাদনার কথা শুনতে পেয়ে বৃদ্ধ কলকাতায় এসেছেন। আমায় বাধ্য করেছেন আফিস গোটাতে, এবং তাঁরই সঙ্গেই কাশী ফিরে যেতে। তাঁর মত, সেখানে গিয়ে যা হয় হবে ; না-ই যদি হয় কিছু, কিছু হয়ে দরকার নেই। দিনে দিনে এমন করে নেশায় তলিয়ে যাবার জন্যে কলকাতার মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে না। বলেছেন, "হেমুর ওসব সয়। ও তন্ত্রসাধকের মতো সিদ্ধ। অণিমা, লঘিমা ওর আয়ত্ত। মহাতপা ও ; জন্মসিদ্ধ। কিন্তু তুমি তো গলে যাবে ও উত্তাপে। তন্ত্রের পিঠ, পঞ্চমুণ্ডির আসন আর মঞ্চপীঠ একই বস্তু। যে ও আসনে চেপে বসতে পারে সেই পারে। যে চাপতে গিয়ে পিছলে যায় সে গেল। দেখ না, মঞ্চের দেবতা শ্রীচৈতন্য নন্ ;—পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ। বোঝো তার তত্ত্ব?"

দৃষ্টি যাঁদের নির্মল সব জিনিসটাই তাঁরা দর্শন দিয়ে দেখেন। সৎ ও সার্থক এই দেখাটার নামই 'দর্শন'। বাবা দেখেছিলেন মঞ্চের এই তত্ত্ব। এর ওপর তো কোনো তর্ক চলে না। তাছাড়া বাবার সঙ্গে তর্ক করাই যেত না। ওঁকে দেখলেই সাধ হতো ওঁকে খুশী করি।

কাশীই ফিরে এলাম।

কিন্তু কাশীতে বসে বসেও আনন্দবাজার পত্রিকার মারফত দেখে যাই রঙ্গশ্রীতে কি নতুন বই চলছে। বেশ চমৎকার ব্যবস্থা করেছে হেমুদা। সপ্তাহে চারদিন বই করছে। তার মধ্যে ঐতিহাসিক দু দিন, সামাজিক দু দিন। মাঝে মাঝে ঐতিহাসিকের জায়গায় পৌরাণিক দেয়। চারদিনের মধ্যে দু দিন অন্তত নতুন লেখকের বই করতো। তখন যে রঙ্গশ্রী চমৎকার চলছিল তা সংবাদপত্রের সমালোচনা ও বক্তব্য পড়েই বোঝা যেত।

কাশীকে হেড্‌কোয়ার্টার্স করে ব্যবসা জমবে না ভেবেছিলাম। কিন্তু তা নয়। দিব্যি জমজমাট হয়ে উঠলো ব্যবসা। আর এখন কাগজে লিখি না, সময় পাই না তাই। চিঠিও কম লিখি। বেশির ভাগটাই অফিসেই থাকি বা টুর করে কাটাই।

টাকা রোজগারের নেশাও কম নেশা নয়। টুর করতে করতে টুরের জীবনেও একটা যাযাবর আত্মপ্রসাদ পেয়ে গেলাম। ভারতবর্ষের এ মোড় ও মোড় ঘুরি।

মাস, বছর ঘুরে যায়। কলকাতায় যাই না। কলকাতায় যাবো না।

যাবো না, যাবো না করেও সেই কলকাতায় আমাকে যেতেই হলো।

আফিসেরই কাজে যেতে হলো। ফার্মের সাহেব কলকাতায় এসেছেন। সেখানে দীর্ঘকালের জন্য যেতে হবে। যাচ্ছিও কলকাতায় দীর্ঘকাল পরে। যথারীতি গ্রেট ঈস্টার্নেই নামতে হলো।

তা হলেও হেমন্তদের খবর নিতে যেতেই হবে আমাকে।

অনেক দিনের অনেক কথা।

হাতীবাগানের সেই বাড়িতেই আছে হেমুদারা। পাশেই বাড়িওলার একটু জমি পড়ে ছিল। সেই জমিটুকুর ওপরেই আরও ঘর তুলে বাড়িখানাকে বেশ বাড়িয়ে ফেলেছেন বাড়িওলা। আর হেমুদা সবটা ভাড়া নিয়েছে। হেমুদার বাবা এসেছেন। ভাই বসন্ত আর তার বৌও আছে ওদের সঙ্গে। মেয়েরা সব পড়াশুনো করছে। চিনি যথাপূর্বং ঠিক আছে। সংসার মানিয়ে চলেছে।

'রঙ্গশ্রী' আপিসেই প্রথম গেলাম। শনিবার সকাল। সেদিন সন্ধ্যার বুকিং চলছে তো বটেই, রবিবারের বুকিংও চলছে।

ডিসেম্বরের প্রথম দিক। শীতের প্রলেপে মন খুশীতে ভরতি; রক্ত চন্‌চনে। বাজারে কপি, কড়াইশুটি আর ভেটকি মাছের দাম উঠতির দিকে। সারি সারি লোক আসছে বাজার থেকে থলে ভর্তি করে।

দেয়াল ভর্তি সব পোস্টার। 'চন্দ্রশেখর', 'মীরকাশেম', 'বিরাজ বৌ'। ভাল অভিনয় করে হেমন্ত। কিন্তু ওর চেয়েও ভাল অভিনয় করে এমন দু-চার জন আরও আছেন ওর দলে। তাদের নাম পোস্টারের গায়ে বড় বড় হরফে।

বুকিং ঘরেই ঢুকি। হাঁপানির আড়ত বিষ্টু পাল সামনে রাখা চার্টগুলোয় পর পর নীল পেন্সিলে ঢ্যাড়া মারছে আর টিকিট বেচছে।

"...কি করবেন মোশাই এই কোণের দিকের ছখানা সীটে। মোট তো ধরুন ছটা তিনটে নটা টাকার মার্জিন পাবেন। কিন্তু থাম এড়িয়ে এড়িয়ে ঘাড় কাত করে করে কি চন্দ্রশেখর দেখার রস পাবেন। নটা টাকা! রোজ রোজ তো আর দেখতে আসছেন না!..."

"ভদ্রলোকের কাছ থেকে বাগালে তো আরও নটা টাকা বিষ্টু। কর্তা শুনে মাইনে বাড়িয়ে দেবে দেখো।"

বলছে সেই স্টুটবিহারী।

এখানেও জুটেছে স্টুটবিহারী।

বিষ্টুর গায়ে গলাবন্ধ ছেঁড়া একটা ঠেলাগাড়ির ওপরে গাদা-মারা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গরম জামার ডাঁই থেকে কেনা সাহেবী কোট। তার ওপর একটা কম্ফটর।

বললে, "যাও, মেলাই বকো না তো। নাও বিড়ি ধরাও একটা।" তার

পরেই টেলিফোন ধরে, "…আজ্ঞে হ্যাঁ। বক্স দিতে পারি দুটো; চারটে চারটে আটটা সীটে…আজ্ঞে না তিন টাকার সব শেষ। ও কালই শেষ হয়ে গেছে।…"

ন্টুটু বলে, "সে কিরে। এখনও তো…।"

হাত দিয়ে ইশারা করে বিষ্টু বলে, "…নিশ্চয়, নিশ্চয়। আধঘণ্টা অবধি কেন চল্লিশ মিনিট অবধি রাখছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ পাঠিয়ে দিন, লোক পাঠিয়ে দিন।"

টেলিফোনটা রেখে বিষ্টু বলে, "ন্টুটুদা, তোমায় নিয়ে আর পারা গেল না। সবাই কি আর বুকিং-এর কাজ পারে নাকি?"

ন্টুটু একটা বিড়ি ধরিয়ে টানছে।

কে এসেছে কাউন্টারের বাইরে। বিষ্টু ক্ষেপে গেছে। "হ্যাঁ হ্যাঁ বাপু। একখানা নয়, আজ তিনবার নাচবে সে। চন্দ্রশেখর পালা তো নাচে নাচে ভর্তি। না-না-না সব ভর্তি। মাত্তোর দুখানা পাঁচ টাকার খালি। কৈ দাও। একখানা এই সামনে টেঁড়া দিলাম…"

লোকটা চলে যায়।

হাসে বিষ্টু। "ঐ এক পাগ্‌লা মাড়োয়ারী বুড়ো আছে। ঐ ছুঁড়ী এক্‌সট্রা ময়নাটাকে ওর ভারি ভাল লেগেছে। কেবল তাকে দেখার জন্যে টিকিট কিনে আসে। থিয়েটারের বোঝে ছাতু; কিন্তু ঐ সীনটায় ময়নার যে ঐ একটু ঢলাঢলি তাতেই বুড়ো কেতাখো। কতই যে আছে!" হাঁফায় বিষ্টু। হাসে।

হাসে ন্টুটবিহারী। আমিও হাসি।

ন্টুটবিহারীর বিরাট বপু আরও বিরাট হয়েছে। পরনে খাকী হাফ্‌প্যান্টের ওপর খাকী শার্ট। খাকী পুরো মোজা। কালো জুতো। যেন পুলিস সাব-ইন্সপেক্টর।

"কবে আসা হলো?" জিজ্ঞাসা করে ন্টুটবিহারী সাবধানে 'আপনি-তুমি'র দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যায়।

আমি বলি, "কাল সন্ধ্যেয়। বাবু কোথায়, কটায় আসে?"

"বাবু? তিনি এই এগারোটা আন্দাজ এসে টাকাগুলো নিয়ে সরে পড়বেন। তারপর আবার বিকেলে। গাড়ি চলছে তো এই কাঁধের ওপর দিয়ে।"

ঘ্যান্ ঘ্যানে গলায় আর একজন বলে উঠলো, "কাঁধ তেমন হলে বওয়াই কাজ। কেউ জ্যান্ত বয়, কেউ মড়া বয়। মড়া বয় যারা মানুষ; আর বাকী ভার বয় জন্তু।

সারা মুখ, চোখের কোল-পাতা জলে ফুলে টস্‌টস্ করছে। দৃষ্টি ঘোলাটে। নীচের ঠোঁটটা পুরু হয়ে ঝুলে আছে, যেন রসে ভরা লেবুর কোয়া। নাকের মাঝটা বসে গেছে, ডগাটা হেলে পড়েছে। মাথার চুল অত্যন্ত পাতলা; আর

গোটা গোটা চুল নিজস্ব রোমকূপে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রক্তে বিষ ভর্তি। বোধহয় বেশী দিন ভুগবে না।

মুটবিহারী বলে, "হ্যাগো, আমার দুঃখ জন্তু হয়ে জন্তুই বইছি।"

রসিক মরতে বসেও হাসায়। বলে, "মানুষে মানুষ বয়, সে গৌরব। কারণ, তা মড়া। জন্তুতে জন্তু বয়, অপমান; কারণ, জীবন্ত। তোমারই বা এত রাগ কেন? রেখেছে তো রাজার হালে। আছ একাধিক সহস্র রজনীর বাদশার মতো—সূর্য ডুবলেই নতুন তারকার অঙ্কে শোভা পাও।"

মুটবিহারী বিড়িতে দুটো টান মেরে বলে, "কার কপালে কি! কি বলেন সোমনাথবাবু। কাশীর বওয়াটে ছেলে; যাত্রাদলের ছোঁড়া থেকে মালিক; মালিক থেকে একেবারে গড়াগড়ি, চচ্চড়ি! ওমা, তারপরেই আঙুল ফুলে কলাগাছ। বিশ্বেশ্বরীদের টাকার কী কাণ্ড বলুন দেখি।"

ঘ্যানঘেনে গলা বলে, "তোমার চোখ টাটায় কেন? অমন চওড়া বুক আর দরাজ মন থাকলেই ভগবান ঢেলে দেন। বিশ্বেশ্বরীদের নিয়ে ঢলাঢলি তো করলে চোপর জীবন। কই টাকা তো গলাসেই শুধু, পেলে কিছু? অমন ধার্মিক আর স্নেহপরায়ণ মানুষকে থাকলেই লোকে দেয়। বিশ্বেশ্বরীদের বাড়ি রোজ নিজে গিয়ে টাকা দিয়ে আসে জানো?"

"তা আর জানি না! এদিকে জানাবার জন্যেই বসে আছি। কৈ, আরে ঝামরু!"

ঝামরু মেথর। মই কাঁধে করে রাতে পোস্টার লাগিয়ে বেড়ায়।

"দেবদাসের পোস্টার লাগানো হয়ে গেছে?"

ঝামরু বলে, "আপুনি যে কাল বারুণ কৈরলেন?

মুটু বলে, "ঠিকই করেছি। ফ্যাসাদ কি আর এক রকম! সোমনাথবাবু যাচ্ছেন তো মেজোকত্তার বাড়ি। একটু তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন ওকে। ভারি গোলমাল হয়েছে। না এলে মিটবে না। উনিই তো কত্তা কিনা।—আর কে আছিস্? ফকরে আছিস্? এই যে। শোন্, নিয়ে যা এই পাঁচটা টাকা। কলুটোলায় চারি-কে গিয়ে একটা কপি, এক সের আলু আর পোটাক ভালো মাছ কিনে ফেলে দিয়ে আয় গে। বাকী পয়সা ওকেই দিয়ে আসিস্।"

ফকির টাকা নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, "আর ওখানেই খাবেন সে কতাটাও বলে আসবো তো!"

মুটবিহারী পানের পিচ্ কেটে বলে, "তবে কি বলে আসবি তোর এখানে খাবো? ব্যাটা শয়তানের পিলে।—যাঃ।"

ফকির হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমি সেই হাতীবাগানের বাড়িতে এসে কড়া নাড়ছি। মেয়ে দুটো প্রথম দেখতে পেয়েই চিৎকার, "ওমা কাকাবাবু, কাকাবাবু!"

প্রায় দৌড়ে চিনি নামতে শুরু করেছে। বেশ ভারী হয়েছে চিনি। "চুপ্ চুপ্ চেঁচাস্ নে। উনি জেগে যাবেন।"

"বলো কি! এখনো ঘুমুচ্ছে নাকি?"

বলতে বলতে উঠছি।

"নটা বাজে যে! ঘুমুচ্ছে!"

খড়ম পায়ে গায়ে একখানা আসামী এণ্ডী জড়িয়ে হেমুদার বাবা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। কপালে রক্তচন্দনের তিলক। আমি পায়ের ধূলো নিলাম। "ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ ভালোই। তোমরা কেমন? তোমার বাবা কেমন? কাশীতেই আছে শুনলাম। বাপকে দু'পয়সা দিতে পারছো তো? সে বিষয়ে আমার এই মূর্খ সন্তানই ভাল দেখছি।"

চিনি এসে বলে, "উঠেছেন তোমার বন্ধু। ভেতরে এসো।"

প্রকাণ্ড জোড়া পালঙ্কে নেটের মশারির মধ্যে লেপের স্তূপের ভিতরে গড়াগড়ি খাচ্ছে হেমন্ত। পাশ বালিশ আশেপাশে। ঘরটায় এসেন্স, সিগারেট আর সকালের শ্যাম্পুর গন্ধে ভর্তি। দেয়ালের গায়ে পরমহংসের একটি ছবি ছাড়া হেমন্তরই বিভিন্ন নাটকের নটাবস্থার ছবি। প্রকাণ্ড আরশি খানতিনেক লাগানো, চাকরবাকর ছুটোছুটি করছে।

হেমন্তর বাড়ি যেন লক্ষ্মীর আঁচলে ঢাকা একটা শান্ত সম্পূর্ণ নীড়।

দোরের কাছে এসে দাঁড়ালো বসন্ত। "সোমদা যে। কখন এলে। ভাল খবর!" এমনি সুরে আরম্ভ করে "অল রাইট্ বাই বাই চিয়ারো" বলে শেষ করে দিব্যি চলে গেল।

সর্বনাশ! এ তো সে বসন্তই নয়। দিব্যি চশমা চোখে, সরু গোঁফ, পালিশ করা সুট, মুখে পাইপ, আমায় বেশ আপত্তিজনক ভাবে সম্বোধন করে আলাপ করে গেল।

চিনিকে জিজ্ঞাসা করি, "বসন্ত কি করছে আজকাল।"

"ওমা জানো না? উনি প্রেস করে দিয়েছেন। প্রেসের কাজ দিব্যি চলছে। ঠাকুরপো তো বিলেত যাবো যাবো করছে। সুইজারল্যাণ্ডে প্রেসের কাজ শিখে আসবার খুব ইচ্ছে। উনি তো উৎসাহ দিচ্ছেন। শ্বশুর বারণ করছেন। শ্বশুরের তো বেশী টান ওই ছোট ছেলের ওপর।"

এ সব বাজে কথা। আমি আমার কথায় আসতে চাই। "আয় কি করে? বাড়িতে ও খরচ-খরচা কি দেয়?"

চিনি বলে, "ছেলেমানুষ ও আবার কি দেবে? উনি তাই নেবেন নাকি? বড় ভাই না!"

ততক্ষণে ব্রাশ দিয়ে মুখ ধুয়ে হেমন্ত ড্রেসিংগাউন চড়িয়ে চায়ের টেবিলে বসেছে। "নে নে, চা খা। তুই কি মুছুদ্দী নাকি যে এসেই খরচ-খরচার কাজিয়া তুললি। উঠেছিস্ কোথায়? কদিন থাকবি?"

সব বললাম। চিনি পরম সমাদর করে খাওয়ালে। আমায় কম সমাদর করলে না, তবে যেন প্রতি কাজে, প্রতি ব্যবহারে হেমন্তর প্রতি তার সর্বস্ব ঢালা প্রেম আর মমতা পরিস্ফুট হয়ে উঠলো।

মনটা বিস্মিয়ে রয়েছে। কেন জানি না। সকালে ঐ মুটবিহারী, এখন ঐ বসন্ত, হেমুদার বেলা নটা অবধি ঘুম, আর চিনির এই চোখ বুজে শান্তির জাবর কেটে যাওয়া—কোনটা যে আমায় বিরক্ত করে তুললো আমি জানি না। বেশ খুশী হতে পারছিলাম না।

অথচ চিনির বড় বন্ধু নেই; হেমন্তর বড় সুহৃদ নেই। কোথায় যেন এরা চাপা হয়ে গিয়েছে।

দুপুরে খেতে বললো। এড়িয়ে গেলাম। বললাম, "যাবার আগে একদিন খেয়ে যাবো।"

হেমন্ত যথাসময়ে 'রঙ্গশ্রী'তে যায়। ও পথটুকু হেঁটেই যায়।

দেখলাম সকলেই সম্মান করে। ও-ও ওর স্বভাবসুলভ বিনয়ে সকলকেই নমস্কার করে; কারুর কারুর সঙ্গে দু'চারটে কথাও বলে; এগিয়ে যায়।

মোড়ের মাথায় পান কেনে মেয়েমানুষটার কাছ থেকে।

"কি গো চাঁপাদি। বাত-ব্যাধি না নাতি-ব্যাধি কোন্‌টার খবর আগে নেবো। আছ কেমন? গাঙ্গুলী কি বলে?"

ক্যান্-ক্যানে গলায় বলে পানউলি চাঁপা, "গাঙ্গুলীকে মারো গুলি। ও-টাকা ও দেবে না। ও আমার গেল। চিতেয় উঠুক ও। মা গঙ্গা ফিরিয়ে দেবে ওর ছাই শকুন-শেয়ালের গভ্যে। মেজো কত্তা, ধম্মো সয় না। আমাদের ধরো গে অধম্মতেই জম্মো। আমাদের জাত-কম্মো যা তাই করেছি। কিন্তু ঐ গাঙ্গুলী—।"

চুনটা দিলো পানের বোঁটায়। হেমন্ত নিল।

"নাতিটা একটু ভাল। কিন্তু বাতের ব্যাথায় মরে যাচ্ছি মেজোকত্তা।"

চাঁপাকে পানের দাম দিলো এক টাকা। পয়সা ফেরত না নিয়ে চলে গেল।

বুঝলাম ও টাকা রোজ পায় চাঁপা।

হেমন্ত বলে, "ঐ চাঁপা পান বেচে। বুড়ী থুড়থুড়ি। ও যখন দালিয়ার পার্ট তা, তখন প্রেক্ষাগারে ভীড় এই ছিন্নমস্তার রুধির-পাত্র।"

পথে আমি বললাম মুটবিহারীর কথা। "ওকে আবার রেখেছো কেন?"

"কে কাকে রাখি আমরা?...ফেলিই বা কাকে?...আছে, থাক্। ও যে মুট্দা!"

পৌঁছে গেলাম রঙ্গশ্রী।

হেমন্ত ঢুকতেই সকলে উঠে দাঁড়ালো। মুটবিহারীও। এটা টাটের ঠাট। এতে অন্তর বা নিষ্ঠার কোনো পরিচয় নেই।

আগে হয়ে গেলেও এখন আবার উড়ে বামুন একটা ধুনুচী আর তিন গাছা মালা এনে দাঁড়ালো।

হেমন্ত তো তখনও বসে নি। দাঁড়িয়ে মালা তিন গাছা নিলো। ছোট ঘটি থেকে গঙ্গাজল নিয়ে নিজের হাতে চারদিকে ছিটিয়ে হেমন্ত একে একে মালা পরালো রামকৃষ্ণ, গণেশ, আর কে এক সন্ন্যাসীর ছবিতে। তারপর প্রণাম করে চেয়ারে বসলো। দেরাজ থেকে সমস্ত টাকা বার করে বিষ্টুবাবু রাখলেন হেমন্তর সামনে। গুণে গেঁথে তা থেকে দুশো টাকা বার করে নেয় হেমন্ত। বাকী আবার দেরাজে ভরে বলে, "মাগো, আর চাই নে। এই সকালবেলার মুঠোটা আমার ভরে দিও। তারপরে ক্ষুদ দাও আর গাছের তলা দাও, যা হয় দিও। মানের অন্ন দিও মা।" যেন বুক চিরে এ কথাগুলো বেরুলো।

এতক্ষণে ও গায়ের শাল খুলে চেয়ারে রেখে সিগারেট কেস্ থেকে সিগারেট বার করে ধরালো। মুটুকে, বিষ্টুকে সিগারেট দিলো। ঘ্যানঘেনেটাকে বললো, "তুই যা নন্দ। আমি ডাক্তারকে বলে এসেছি। ভাল করে দেখবে, আর ওষুধ পত্তর যা লাগে দেবে। পয়সা আমি দিয়ে দেবো। মরবি তো বটেই, তবে তোর আপসোস না থাকে যে পয়সার অভাবে তোর চিকিৎসা হয় নি।" তারপর চোখে মুখে নিতান্ত ঘরোয়া হাসি হেসে বলে,..."আর ভাল হলে বিয়ে, কেমন? এই নিয়ে যা তিনটে টাকা। আজ চলে যাবে কেমন? যা। বাইরে ইকরার আছে। বলে এসেছি। গাড়িতে তোকে পৌঁছে দেবে।"

মুটবিহারী বলে, "আবার গাড়ি কেন? ইকরারের এখন গাড়ি নিয়ে অনেক কাজ। তোমার আবার বাড়াবাড়ি আছে।"

নন্দ বলে, "বাড়াবাড়ি না বাড়াবাড়ি। হতো মুটবিহারী চড়তো গাড়ি। নন্দ গোঁসাই আবার মানুষ। কেন তুমি ব্যস্ত হও মেজোকত্তা বলো তো! আমি ট্রামেই চলে যেতে পারবো।"

বেরিয়ে যায় নন্দ গোঁসাই। জলো-জলে পায়ে জলো-জলো দৃষ্টি মেলে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে হেমন্ত। বুঝি ওর চোখও ছলছল করলো।

"যে বড়, সে বড়ই ন্টুদা। তোমরা তো মঞ্চে নামো নি, এ বেদনা বুঝবে না। নন্দ গোঁসাই! ভাবতে পারো, নন্দ গোঁসাই কি ছিল কলকাতা স্টেজের? চানী দত্ত, অমর দত্ত, অমৃতবাবুর সময়কার শিল্পী। এই নন্দ গোঁসাইর ভিলেনের অভিনয় দেখার জন্যে ভীড় লাগতো। এর রূপের জন্য মেয়েরা কাতার করতো। এই কলকাতার বুকের ওপর দিয়ে জুড়ি হাঁকিয়ে গেছে নন্দ গোঁসাই। আজ স্থবির, পঙ্গু, জীর্ণ। হাত পেতে টাকা পাবার প্রত্যাশী। মৃত্যুও বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়, যখন দম্ভ আর আত্মশ্লাঘা টুকরো করে পুড়িয়ে খেতে হয় মানুষকে। দুনিয়ার সেরা বিয়োগান্ত নাটকের চেয়েও দুঃখ দেয় মানী লোকের দুর্বিপাক। সে বড় করুণ দৃশ্য"

এর পরেই ন্টবিহারী আর হেমন্তর খানিক কথা কাটাকাটি চললো উচ্ছৃঙ্খলতা বনাম ভাগ্য এবং অভিশাপ বনাম কর্তব্য নিয়ে। ন্টবিহারী বলে উচ্ছৃঙ্খলতা সাজা পাবে, হেমন্ত বলে ভাগ্যই বড়। উচ্ছৃঙ্খল বহু নরপশু আরাম-শয্যায় দেহত্যাগ করেছে, তার নিরীহ সন্তানটা তার কুফল ভোগ করেছে। ন্টবিহারী বলে ভাগ্যই অভিশাপ দেয় উচ্ছৃঙ্খলকে; হেমন্ত বলে ভাগ্যের ক্ষমতা আছে যা ইচ্ছে করবার, তিনি তা করুন। মানুষ তার কর্তব্য করবে। কেউ ভাগ্যের অভিশাপে দুর্বিপাকে পড়েছে বলে তাকে ত্যাগ করবে না।

এর মধ্যে আমি দেখলাম যে বহু প্রার্থী এল। ও দু টাকা, এক টাকা করে অনেককে দিলো।

প্রেসের চাকর ফকির এসে দাঁড়ালো।

"কি রে!" বলে হেমন্ত।

"ছোটবাবুর বিলের টাকাটা।"

ন্টবিহারী বলে, "এটা একটা স্ক্যাণ্ডাল। বন্ধ করো হেমন্ত।"

"স্ক্যাণ্ডাল কি?" হেমন্ত জবাব দেয়। "ব্যবসাকে ব্যবসা বলে দেখাই ভাল। সে ছোট, আমি বড়। তারও ব্যবসা, আমারও ব্যবসা। কাল সে পোস্টার ছেপে দিয়েছে; বিল দিয়েছে, টাকা চায়।"

"টাকা চায়, দেবো; পালিয়ে তো যাচ্ছে না কেউ। কিন্তু কাল যে পোস্টার পাঠিয়েছে, তার মধ্যে গণ্ডগোল বাধিয়েছে সে। সে গণ্ডগোল না মিটলে টাকা দেবে কে?"

হেমন্ত বলে, "কি গণ্ডগোল?"

"বৃহৎ গণ্ডগোল।"

"কি ?"

"রাজীব গণেশের নামের মে পেশের নাম দ্বিতীয় লাইনের প্রথম কেন হবে ? এদিকে স্বরূপা বলে বরাবর পুরুষদের নামই প্রথম হবে কেন ? আমি কাল গণেশ আর স্বরূপাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে প্রেসে গিয়ে এক ধরনের ছাপতে বলে এলাম। আমায় জবাব দিলে এখন হবে না, ছাপা হয়ে গেছে। পরের বার থেকে হবে। নয়তো এটা তোমরা ক্যান্সেল করে নতুন ছাপাও, ছেপে দিচ্ছি। কোম্পানী দুটোর দামই নেবে।"

"ঠিকই বলেছে। পাকা ব্যবসাদারের মতো বলেছে।"

"বলে নি। ছোট মন ব্যবসাদারের মতো বলেছে। ভায়ের কাছে ব্যবসা কিনা তাই বলেছে। খদ্দের যদি তাই না হয়ে অপর কেউ হতো এই ব্যবহারের পর পার্টি চলে যেত। সেই ভয়েই আর এমন ব্যবহার করতো না। তাছাড়া আমাদের প্রিন্ট্ অর্ডার না নিয়েই ছেপেছে। দোষ আমাদের নয়।"

"যাক্। এখন কি বলেছে বসন্ত। টাকা না দিলে আর ছাপবে না, এই তো ? টাকা দিয়ে দাও।"

"দিয়ে তো দেবো। তারপর ?"

"তারপর আবার কি ?"

"রাজীব পুরনো নট, সব্যর বড়। তার চেয়ে অনেক ভাল নট গণেশ। গণেশ বলে, রাজীব মরবে না সে দোষ কি আমার ? যমের অরুচি বলে আমাদের রুচি হবে ?"...

হেমন্ত বলে, "আরে, ধীরে ধীরে বলো। কি যেন বলো তুমি নুটুদা !"

"আর ধীরে ধীরে বলার কি আছে ? গণেশের তো গলা। এখানে দাঁড়িয়ে পাড়া ফাটিয়ে বলে গেল। বলে, যে মরতেই ভুলে গেল, তার আজও পার্ট মনে থাকে ? অমন লোকের নাম ওপরে বড় হরফে ছাপ তো আমার নাম তলায় ছোট করে ছেপে দিও। আমি মানবো। কিন্তু মানাও তো স্বরূপাকে।"

হেমন্ত বলে, "কেন স্বরূপা আবার কি বলে ?"

নুটবিহারী মুখ বিকৃত করে বলে, "জানো না কি বলে ? সেদিন তো তোমার ঘরেই বলে গেল, 'একদিন যদি না আসি কখানা টিকিট বিক্রি হয় ঐ বাস্তু-ঘুঘুর নামে ? আমার নাম পোস্টারে দেবেন না, সে সইবে; দিলে যেখানে আমার স্থান সেখানেই দেবেন।' বলে তো গেল তোমাকেই। আজ চিঠি পাঠিয়েছে এই দেখো, জ্বর আসতে পারবে না। বাড়ি গিয়ে দেখি, দিব্যি সটান বসে বসে বিকেলে দক্ষিণেশ্বর যাবার প্লান করছে! এ তো আর তেমন চাকরি নয় যে মিথ্যে এম্. সি. দিলে বলে চাকরি খাবে। ওর চাকরি

খেলে, ও-ই তোমায় খাবে। এইমাত্র গণেশ এসেছিল। বলে গেল দাদা আমি শ্রী [illegible] চাই [illegible] লাইনে এঁটে দিও। সাপের লেজ হয়ে থাকি, লোকে ভয় খাবে। মাড়াবে না। ফণায় চড়ে থাকতে চাই না, অতো বিষ নেই।"

"কি বললে তুমি?" চিন্তিত হেমন্ত বলে।

"আমি তো তাই কাল পোস্টার আলাদা সাজিয়ে দিয়ে এলাম। হতভাগা প্রেস তা না শুনে ছেপে দিলে, ফকরে দেয়ালে এঁটে দিলে, এখন বিল চাইছে। তুমি আবার বলছো, বিলের টাকা দিয়ে দাও।"

হেমন্ত বললো "হ্যাঁ হ্যাঁ, বিলের টাকা দিয়ে দাও। তারপর চলো, আমরাও প্রান করি দক্ষিণেশ্বর যাবার। ওরা যখন যাচ্ছে আমরাও একই সঙ্গে যাই চলো।"

"যা ইচ্ছে করবে। তুমিই মালিক। বিষ্টু টাকাটা দিয়ে দাও।"

বিষ্টু টাকা গুণে দেয়। "ভাবছো কেন হুটদা। যে কদিন মা দেবেন, এমনি করেই দিয়ে নিয়ে চলবে যখন ফুরিয়ে যাবে, মা দেবেন না, আমার কাছে চাইলেও পাবে না। আবার গাছতলা। ভাবছো কেন?"

ফকির বললে, "যাই বাবু!"

"যা, প্রেসকে বলবি হুটদা যেমন বলেছেন তেমনি নতুন পোস্টার ছাপতে, আর পুরনো পোস্টারের ওপর আবার লাগিয়ে দিগে যা। এর জন্যে আলাদা বকশিশ পাবি তুই।"

সেলাম করে ফকির চলে গেল।

আমার দিকে চেয়ে বললো, "হলো না ভাই গল্প করা। আমার স্বাধীন ব্যবসা কিনা তাই সময় নেই। গাড়িটা ডাকো হুটদা। আমি একবার হয়ে আসি। তুমি এখন আর আফিস থেকে কোথাও যেও না। আমি ঘুরে এলাম বলে; তারপর স্বরূপার জ্বর দেখতে যাওয়া যাবে। তুমি বরং একজোড়া ভাল দুল কিনে আনো। শোনা গেছে দুল পরলে জ্বর নাকি চটপট সেরে যায়।"

বুকিং আফিসে যারা ছিল সকলের চোখে হাসি খেলে গেল। সকলে উপভোগ করলো অন্তরে অন্তরে হেমন্তর রসিকতা।

কিন্তু রসিকতার মধ্যে জরিয়ে রাখা বেদনার তত্ত্ব কেউ কি বুঝলো?

হেমন্ত চলে গেল।

হুটু বললে "কোথায় গেল খোঁজ রাখেন সোমবাবু?"

জিজ্ঞাসু নয়নে চেয়ে থাকি।

"এক গুরুদেব জুটেছেন। নিত্য প্রাতে কুড়িটি টাকা দিয়ে তাঁর আশীর্বাদ আনেন। অর্থাৎ মাস গেলে বসে বসে ছশো টাকা আয় সেই গুরুর। এর আর কোনো কারণ নেই। একমাত্র কারণ যে এঁর দেবার মতো টাকা আছে।"

বিষ্টু ভ্রূ কুঁচকে বলে, "কিন্তু মুটদা, এ গুরু তো তোমার জোটানো।"

"মানি। কিন্তু ভুল কি মানুষ করে না? আমিই তারপর কতবার হেমন্তকে বলেছি ওখানে না যেতে। গুরুর চরিত্তিরের কথা নিজেই সব পরে বুঝিয়ে বলেছি। কিন্তু কে কার কথা শোনে আর সেটা না হয় আমার দোষ। কিন্তু বাকী যে পঞ্চাশ রোজ, তার কি?"

"ওটা অবশ্য বলতে পারো।"

কোন্ এক বেশ্যা নাকি ওকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে। তার কাছে নিত্য ওর যাওয়া চাই সারাদিনে একবার, এবং প্রতিদিন নিজের হাতে নগদ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আসা চাই। এ সংবাদ শুনে আমি খুবই ঘাবড়ে গেলাম। কারণ সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় চিনির ক ওদের দাম্পত্য জীবনের পুরোপুরি সঙ্গতির কথা। আজই সকালে যে ঝলমলে পরিবারটি দেখে এলাম. তার সঙ্গে এই বিবৃতির এতটুকু মিলও তো কোথাও পেলাম না।

সন্দেহ পুষে রাখলাম।

বলে এলাম "আমার মিটিং আছে। হেমন্ত তো এখন আসবে না। এদিকে যাবার সময় হলো। আমি চললাম। বিকেলে আসবো বলে দেবেন।"

৬

বিকেলের খানিকটা আগে গেলাম চিনিদের বাড়ি। হেমন্ত সেই সবে ফিরছে। চিনি বসে বসে বাতাস করছে; হেমন্ত খাচ্ছে। পড়ে গেছে বেলা।

চিনি বলছে, "এসো, এখানেই বসো। এতক্ষণে খেতে বসার সময় হলো। এমনি অবেলায়, বিনা নিয়মে স্নান, খাওয়া, ঘুম, এতে শরীর থাকে?" আমায় সামনে পেয়েই যেন চিনি এসব কথা বললো, খানিক সহানুভূতি পাবে বলে।

আমি চিনির পাশেই একখানা আসনে বসলাম।

"থাকতেই হবে শরীরকে। আমি তো মাইনে তোলা নট নই যে সময়ে যাবো আসবো, কারুর তোয়াক্কা করবো না। আমি হলাম সত্বাধিকারী-পরিচালক-নট। তুমি তার সম্মানিতা গৃহিণী। আমায় উপবাসের মহলা দিয়ে যেতেই হবে। হতে তো পারে, একদিন উপবাসের খেলাও দেখাতে হবে। প্রস্তুত থাকা চাই।"

"তাই, যে কদিন জুটবে তাও নিয়ম মাটে খেতে পাবে না?"

পরিবেশন করছে বসন্তর বৌ।

মাথায় ঘোমটা টানা। নিপুণ হাতের পরিবেশনের মধ্যে শ্রদ্ধা আর ভালবাসার স্পর্শ।

"এক দিনের বদঅভ্যাসও বদঅভ্যাস যার কপালে যা সইবে না, তাকে তা ভোগ করতে নেই।"

"তোমার মনে দিনরাত এই কু-ডাক কেন বলো তো? কি পাপ করেছি আমি যে তোমার এমন দুর্বিপাক হবে?"

"পাপ তুমি করো নি। করেছি আমি।"

"কি পাপ? তুমি আবার কি পাপ করবে? বলোতো সোম এসব কি কথা?"

আমি বলি, "দাম্পত্য ব্যাপার। আমায় টানো কেন? তুমি কি মনে করো তোমার কর্তাটি পাপের সীমার বাইরে?" কণ্ঠস্বরে একটু বিদ্রূপ ভেসে গেল বুঝি।

হেমন্তও ভাত মাখতে মাখতে বললো, "যখন সর্বদা আছি কামিনী আর কাঞ্চনের জঙ্গলে বসে। পাপ এক ধরনের পাপ? একটা পাপ?"

"কি পাপ করো? তুমি পাপ করো, আমি বিশ্বাস করি না!"

হাসলে হেমন্ত।

"হাসছো যে? আমি করি না; সত্যিই বিশ্বাস করি না।"

"সে তোমার দুর্বলতা।"

"সে আমার সবলতা। তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।"

হেমন্ত মুখ টিপে টিপে হাসে "সে আমায় ভালবাস তাই। নইলে বিশ্বাসঘাতকতা করা আমার ব্যবসার মজ্জাগত।"

মুখ লাল হয়ে ওঠে চিন্ময়ীর। সে বলে, "তোমার ব্যবসার মজ্জাগত হতে পারে, তোমার নয়। কি বিশ্বাসঘাতকতা? কাউকে ঠকিয়েছ?"

মাথা নেড়ে হেমন্ত বলে, "হ্যাঁ।"

"কাকে শুনি? আমাকে?"

"যদি বলি তাই।"

হাসতে থাকে চিন্ময়ী। আমি মনে মনে প্রমাদ গণি। সকালবেলায় মুটবিহারীর কথাগুলো বুকে দাপাদাপি করতে থাকে।

"তা যদি হতো অনেক আগেই ঠকাতে। অমন ডাকাতের মতো পড়ে বিয়ের বাসর থেকে আমায় কেড়ে আনতে পারতে না। আমায় তুমি ঠকাতে পারো?" দু চোখ বড়ো বড়ো করে জিজ্ঞাসা করে চিন্ময়ী।

চিন্ময়ী সত্যিই সুন্দরী!

"শুধু পারি তাই নয় চিনি, ঠকিয়েছি, ঠকাই। ভাল তোমাকে আর বাসি কি না এক এক সময়ে আমার সন্দেহ হয়। ভালবাসা যেন তোমায় ছেড়ে বাসা নিয়েছে অন্য এক জায়গায়। আমি তার হয়ে গেছি চিনি। তোমার আর নেই।"

"সে কি?" ধীর অকম্পিত গলায় চিন্ময়ী জিজ্ঞাসা করে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে হেমন্তর। জলের গেলাসটা ঢক্ ঢক্ করে নিঃশেষ করে আঁচাবার জন্য ও কলঘরে ঢুকলো। চিন্ময়ী আমার হাত ধরে বললো, "চলো ঘরে যাই।" ঘরে যেতে যেতে বললো, "মাঝে মাঝেই এমনি করে বলেন। এক এক সময়ে বুকটা ধড়াস করে ওঠে। কিন্তু সত্যি বলছি তোকে, আমার একবারও মনে হয় না।"

হেমন্ত ঘরে ঢুকে পড়েছিল। "কি মনে হয় না?" ও প্রশ্ন করলো।

ওর হাতে পানের ডিবেটা তুলে দিতে দিতে চিন্ময়ী বললো, "মনে হয় না, আমায় ছেড়ে আর কিছুতে তুমি মজতে পারো।"

গম্ভীর হয়ে বলে হেমন্ত, "কিন্তু জানো তুমি, পুরুষের পক্ষে নারীতে মজা মানে তার যৌবনে মজা। যৌবনহারা নারীকে পুরুষ চায় না।"

"আমার যৌবনকে তুমি ভাল তো বাস নি। আমাকেই ভালবেসেছ। যৌবন গেছে বলে আমি তো যাই নি। আমি তো আছি।" চিন্ময়ীর স্বরে ব্যাকুলতা নেই, উৎকণ্ঠা নেই। শান্ত, উদার কণ্ঠস্বর।

"কিন্তু তোমার ওপরে যে আছে, যে আমাকে টানে, যাকে আমি ভালবাসি সে সুস্থির যৌবনা, সুচিরযৌবনা। কত তার রূপ, কী তার আকর্ষণ। তার মনের সামনেটা উজ্জলতায়, দীপ্তিতে, রঙ্গে, রসে থর থর করে কাঁপে, আর তার ভেতরটায় কতো চাতুরি, ফন্দি, কতো গ্রন্থী, কতো জাল! তোমরা ঘরোয়া। দিনে রাতে নির্ভাঁজ এক। এসব মনকে আয়ত্ত করতে কোনো উৎসাহ পাই না, কারণ কোনো উদ্বেগ নেই। কিন্তু তার মন আয়ত্ত করার উৎসাহ অনির্বাণ। কী উত্তেজনা; কারণ কী উদ্বেগ! রাতের পর রাত, দিনের পর দিন তাকে চেয়েছি, পাই নি; অথচ তাকে পেতে হবে। যদি সর্বস্ব দিতে হয় তবু পেতে হবে। আমার এ এক দারুণ তৃষ্ণা। এ তৃষ্ণা আমায় সফল করতেই হবে।"

বলতে বলতে হেমন্তর মুখ চোখ একটা বিশেষ দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠলো। তার প্রতি কথায়, প্রতি শব্দবিন্যাসে প্রত্যয়।

সে প্রত্যয়ের গম্ভীর একাত্মতা প্রবেশ করেছিল চিন্ময়ীর রক্তকণিকায়। সমস্ত রক্তকণা গিয়ে জড়ো হয়েছিল হয়তো সেখানে তার ভালবাসার সিংহাসন ঘিরে—তার চারপাশে ব্যূহ রচনা করে। তার মুখে অন্তত এক কণা রক্ত ছিল না।

তবে কি চিন্ময়ী বিশ্বাস করেছিল সে বিশ্বাস হারিয়েছে? তার ভালবাসার সিংহাসনের তলার মাটিতে সুড়ঙ্গ হয়েছে?

"কে এই মেয়ে?" হঠাৎ চিন্ময়ী আর্তনাদ করে।

"বলবো তোমায় বলবো চিনি। একদিন বলবো, পরিচয় করাবো। সে তোমার সতীন। তবে এখন নয়। দুই সতীনে আলাপ হবার আগে তাকে অন্তত মুঠোর মধ্যে পাই। নইলে তুমি যে হাসবে।"

"হাসলেই বা।" ম্লান হেসে বলে চিন্ময়ী।

"সে হাসি আমার সইবে না। তোমায় ভয় করি আমি।"

"ভয় করো আমায়? আর কিছু নয়?"

"না আর কিছু না। তোমার ভয়ই আমার ভয়। তোমায় ভয় করি আর তাকে—তাকে হয়তো, হয়তো কেন, ঠিকই—ঘৃণা করি।"

চুপ করে রইলাম সকলে।

ঘড়িটায় টিক্ টিক্ শব্দ হয়।

নীচে থেকে ফেরিওলা ডেকে যায় 'কুলপী মালাই।' দূরের কোনো গলিতে কাঁসার বাসনওলা ঠং ঠং করে বাসন বাজায়। এক সার বাড়ির ওধারে জমিটার পাশে টীনের শেডে আটার একটা মিল। তা থেকে টানা একটা শব্দ বেরুচ্ছে বেল্টে আর চাকায় লেগে ফট্, ফট্, ফট্। হলো কি এই একটি মুহূর্তে,

বিশ্বের তুচ্ছতম শব্দটিকেও আয়ত্ত করার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় এমন সজাগ হয়ে উঠলো কেন। যেন চিনির বুকের টিপ-টিপ শব্দটাও আমি শুনতে পাচ্ছি।

বিছানায় একটু গড়ালো হেমন্ত।

চিন্ময়ী সামনের চেয়ারখানায় বসে। আমি বিছানাতেই একটা তাকিয়া কোলে করে বসে পড়ি।

দুটি হাতের তেলো এক করে মাথার পেছনে রেখে মাথাটা তাতে ভর দিয়ে হেমন্ত বলে "উৎকৃষ্ট ঘৃণা উৎকৃষ্ট ভালবাসার অন্ধকার ছায়া। উৎকৃষ্ট হিংসাও তাই। ঘৃণার ভবিষ্যৎ আছে, হিংসার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ঘৃণা থেকে প্রেম উদ্ধার করা যায়; হিংসায় প্রেম জরে জরে শেষ হয়ে যায়।"

আমি কৌতুকভরে বলি, "প্রেমের এত পাঠ পেলে কোথা থেকে হেমুদা।"

এতক্ষণে হাসে হেমন্ত। "পাইরে পাই। এরও গুরু আছে। রোজ পড়ায়। এই যে মঞ্চপীঠ দেখছো ও পীঠস্থান। সব সিদ্ধাই পাওয়া যায় ওখানে।"

চিন্ময়ী বলে, "আমিও তবে ঐ পীঠে সিদ্ধাই পেতে যাবো।"

তার দিকে চেয়ে হেমন্ত বলে, "যাবে? পারবে যেতে? মুখে বলা যায়, বড় কঠিন পথ। তলোয়ারের ওপর দিয়ে হাঁটা সহজ, সাপের ছোবলের মুখে চুমো খাওয়া সহজ, কিন্তু ঐ যে রঙ্গপীঠ ওকে ভালবেসে ওর বুকে রোজ লাথি মারা সোজা নয়। যদি তা পারতে, আজ আমায় এ নিগ্রহ ভোগ করতে হতো না।"

উঠে আসে চিন্ময়ী চেয়ার ছেড়ে। কোথাও তবে আজ হেমন্ত আঘাত পেয়েছে। চিন্ময়ী তা দূরে বসে দেখতে পারে নি। উঠে এসেছে। অন্য পাশে বিছানায় উঠে হেমন্তর মাথার কাছে এসে বসলো সে। তার মাথায় হাত রেখে বললো "কি লাঞ্ছনা তোমার বলো!"

একটা হাত চিন্ময়ীর মাথায়-রাখা-হাতখানার ওপর রেখে বলে, "একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল চিনি। শুনবে? তুইও শোন্—ভারী মজার গল্প। এই লাইনে আছি বলেই হয়তো গল্পটা আমার খুব মনে ধরেছে। খুব ভাল লাগে গল্পের নায়িকাটিকে ভাবতে। স্বামী এমনি যাত্রাদলের অধিকারী ছিল। ইওরোপের বিশিষ্ট সব মেলায় নানা খেলা দেখিয়ে বেড়াতো। একটা সময় এল যখন সে হঠাৎ বিয়ে করে বসলো একটা গ্রামের পাদ্রীর মেয়েকে। হঠাৎ ভালবাসা, হঠাৎ প্রেম, হঠাৎ বিয়ে। মেয়েটা আমার নায়কের প্রেমে বাঁধা পড়েছিল। এত বাঁধা পড়েছিল যে পাদ্রীর মেয়ে হয়ে ভ্রাম্যমাণ একটা বাউণ্ডুলে দলের অধিনায়ককে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল। অথচ অভিনয় এবং অভিনয়ের আনুষঙ্গিকের ওপর তার বিজাতীয় ঘৃণা। সব ঘৃণা সে জয় করলো। তার প্রেমকে কণ্ঠহার করে গলায় পরলো। কিন্তু তার বিবাহ হয়ে

গেছে দেখে দলের প্রধানা নটীর কি রাগ। সে দল ছেড়ে দিলো। অন্যান্য নটীদেরও কেউ কেউ দল ছাড়লো। নটীর অভাবে ওর দল খুব মার খেতে লাগল, কোনো পালাই জমে না। পর পর কত নটী এল গেল। ক্রমশ দল দারিদ্রের শেষ পর্দায় এসে থামলো। এমন সময়ে অস্ট্রিয়ায় এক জমিদারের বাড়ির বায়না এল। অনেকদিন পরে একটা ভালো ডাক পেয়েছে। নটী চাই তার। দিন রাত এ দোর ও দোর করে করে ঘুরে ঘুরে আসে। অবশেষে আমার গল্পের নায়িকা ওকে সংবাদ দেয় এক নটীর কথা। অস্ট্রিয়ারই মেয়ে। সে অভিনয়ের রাতে ঠিক এসে যাবে। অল্পবয়সী ভাল অভিনেত্রী। নায়ক খুশী হয়। বহুদিনের পর সে রাতে সে ঘুমোয়, নায়িকাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দেয়।...বুঝতেই পারছো অস্ট্রিয়ার সেই জমিদার-বাড়ির জলসায় সে রাতে আমাদের সেই পাদ্রীর তনয়াই অভিনয় করেন এবং নায়কের দলকে আবার জাগিয়ে তোলেন।"

"গল্প শেষ হলো?" বললে চিন্ময়ী। "তোমার দলে ভাঙ্গন না ধরুক। কিন্তু লাঞ্ছনা কে করলো তোমায়, জানতে হবে আমায়। পারি যদি—"

তাড়াতাড়ি উঠে বসে চিন্ময়ীর মুখ চেপে ধরে হেমন্ত। "ও কথা মুখে আনতে পারবে না তুমি। আমার সুদিন আসুক, দুর্দিন আসুক, মঞ্চে তোমায় আমি নিয়ে যেতে পারবো না। ভীষণ, ভীষণ এই মঞ্চ। যে গেছে সে আর ফেরে নি। যুদ্ধ কি, সমুদ্র কি, শিকার কি—শুনেছি এদের ডাক সব-খোয়ানোর ডাক। আমি বলতে পারি মঞ্চের ডাকের কুহকের বড় কুহক কিছু নেই। কারুকে ভালবাসতে দেয় না; কারুকে বুকে করে রাখে না। দেবেও না, নেবেও না, এ ভয়ানক এক ক্ষুধার জ্বালা। ওতে তোমায় আমি যেতে দেবো না!"

"অথচ তুমি আছ ডুবে।" আমি বলি। "তার মানে চিনি বা কারুকে তুমি ভালবাস না।"

"ও সব কথা থাক। জেনে রাখ মঞ্চ ডাকলে আমি সব ত্যাগ করতে পারি কি-না-পারি সে কথা হচ্ছে না, ত্যাগ আমায় করতে হবে। দেখ্, সোম, এই মঞ্চের ডাকের কথা মনে পড়লে একটা কথা আমার মনে আসে। লোকে শুনলে হাসবে, কিন্তু মনে আসে। রাম সীতাকে খুব ভালবাসতেন। খুবই, যেমন আমি আর চিনি। কিন্তু রাম ছিলেন যেন রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা। দুর্মুখের কথায় তিনি যে নাটকে নামলেন, তাতে গ্যালারির দর্শকদের কাছ থেকে হাততালি পাবার লোভ তাঁর পক্ষে দুর্বার হয়ে উঠলো। তাই তিনি মঞ্চের খাতিরেই সীতাকে ত্যাগ করলেন। গ্যালারি থেকে হাততালি পড়লো। রামচন্দ্র খুশী হলেন। স্বর্ণসীতাও সেই হাততালির অঙ্গ। কিন্তু যেই এক দুর্বল মুহূর্তে আবার সীতাকে তিনি

আনলেন, ভুলে গেলেন নাটকের পাঠ। নাটক আর সীতা একসাথে রসাতলে গেল।"

আমি বলি, "অদ্ভুত তোমার নাটক-প্রীতি আর অদ্ভুত এই ব্যাখ্যা। তোমায় এত বড় আঘাত দিল কে?"

"কেন, তুই তো শুনেই গেলি, সেই স্বরূপার ব্যাপার। ওই ধরনের মেয়ের স্তাবকতা করা যে কত দুরূহ কি করে বুঝবি তুই।"

আমি চিন্তিত হয়ে বলি, "কি হলো, আসবে বললে।"

"হ্যাঁ বলবে। জাতটাই হাড় বজ্জাত। বললে, 'বড়দা আপনারা আমাদের পয়সা দেন বলে যখন যেমন অপমান করবেন এটা কি সয়?' যত বলি, ওটা আমি জানতাম না। আমাদের নির্দেশ সত্ত্বেও ছাপাখানার ভুলেই অমনটা হয়েছে, ততই ও বলে, 'সে ছাপাখানাও তো আপনাদেরই। ভুল হবার কথা তো নয়। ভুলটা আমার বেলাতেই বারবার—হয় আমার কপালের দোষ। ভাবছি এমন পোড় কপালীর সঙ্গ আপনাদের মতো মহৎজনের সইবে কি?' বলো, এসব কথা শুনলে কি ধৈর্য্য থাকে? মনে মনে ধিক্কার হয়। বামুনের ছেলে অনায়াসে ধর্মেকর্মে মতি রেখে দু মুঠো ভাতের সংস্থান করা যেতে পারতো। তা নয়, এইসব সতীলক্ষ্মীদের তোষামোদ করে করে জীবন কাটাতে হবে। ভাবছিলাম উঠে আসি। পরক্ষণেই মনে হলো নিজের দায়িত্বের কথা, শূন্য রঙ্গপীঠের কথা, বুকিংয়ের বৈধব্যদশার কথা, আর অতগুলো নিরীহ সংসারের অন্নসংস্থানের কথা। ঐ গফুর, লিয়াকৎ, বিষ্টু, নারাণ, সরসী, অতসী, খেঁদী—এদের পরিবারবর্গের কথা। পান বেচে খেঁদী—তার বড় মেয়েটা হাসপাতালে, ছোট মেয়ে জেলে, নাতিটার জ্বর—ভাবি ওরা করবে কি, খাবে কি? তাই আবার শ্রীমতীকে তোয়াজ করি ভাই। মর্যাদা বাড়ানোর জন্যে দুল কিনে দিই। গাড়ি করে দক্ষিণেশ্বর ঘুরিয়ে আনি, কত কি।"

আমি বলি, "কি হলো যোদ্ধা। জ্বর ছাড়লো।"

"ছাড়বে। সেই বান্দা ওরা। ওই ছলাকলা করেই ওদের রোজগার। চৌষট্টি কলার সবচেয়ে বেশী কলা একটা নটীকে আয়ত্ত করতে হয়, তবে ওরা দুনিয়াকে কলা দেখিয়ে বেড়াতে পারে। বললে, 'দেখি প্রথম শোটাতে হয়তো পারবো না। দ্বিতীয়টাতে পারলেও পারি; কথা দিচ্ছি না। একটা দিন ছুটিও পাবো না, এই-বা কি কথা?' ওদিকে বিষ্টু খবর দিলে যে টিকিটের দাম রিফাণ্ড করতে করতে ওর প্রায় দম বন্ধ হবার জো! সত্যি ভাই ঘেন্না ধরে যায় এক এক সময়ে। যাই আবার দেখি শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ালো।"

তখন দেখলাম চিন্ময়ীর একটা রূপ। কথা সে একটাও বলে নি, কেবল স্বামীর পোশাক-পরিচ্ছদ বেছে পরিয়ে দেবার প্রতি স্তরে বিন্যাস করে ছাঁদে ছাঁদে

রাখলো নিজের প্রণয়, প্রীতি, নিষ্ঠা আর বিশ্বাস। যেন যুদ্ধজয়ে সন্তান চলেছে, মা তাকে সর্বাঙ্গে অভিষেক করে দিচ্ছে। তখন বুঝলাম, ওদের ভেতরের সম্বন্ধ একটা কঠিন গ্রানাইটের ওপর খাড়া। তার তলায় দৃঢ়তা, মাথায় চাঁদের সুধা।

আমি ছুতো করে বাইরে পথে এসে দাঁড়ালাম। সেটা যে ওরা দুজনেই লক্ষ্য করেছিল, তা হেমন্ত বাইরে আসার পর বুঝতে পারলাম।

হেমন্ত বলল, "ভাল করেছিলি আমাদের একা ছেড়ে এসে। তুই বুদ্ধিমান ছেলে।"

"অমন অবস্থায় একা ছাড়ার কথা বুদ্ধি না থাকলেও বোঝা যায়। কিন্তু কোথায় চললে এখন? থিয়েটারের তো অনেক দেরি।"

হাসে হেমন্ত। সোফার গাড়ি চালায়। সোজা চলে যায় বৌবাজার। সেখানে গিয়ে এক-জোড়া কাঁকন কেনে তিনশো পঁচাত্তর টাকায়।

"এ কাঁকন কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করি।

"শৈবলিনীকে পরাবো।" হাসতে হাসতে বলে হেমন্ত। "চল্, তোকে আজ তীর্থদর্শন করিয়ে আনি।"

আশ্চর্য! তীর্থই বটে।

গাড়ি সার্কুলার রোড ধরে সোজা এসে দাঁড়ালো বাগবাজার পুলের মাথায়। রাস্তার ধারে গঙ্গার তীর ধরে পর পর শীতলা, দুর্গা, চণ্ডী, লক্ষ্মী প্রভৃতি নানা মন্দির। তার মাঝে মাঝে গলি। তারই একটায় ঢুকে গেল হেমন্ত। আমিও গেলাম।

টীনের ছাত। বাইরেটা মাটি লেপা। ভেতরের উঠোনটুকু সিমেণ্ট করা। উঠোনের পাশে দাওয়া। দাওয়ার ওপর বসে এক বুড়ী। হেমন্তকে দেখে বলে, "ওমা মেজোকর্তা যে! কী মনে করে। ওরে চপলা, মেজোকর্তাকে একখানা আসন দিয়ে যা।"

বছর আট নয়ের মেয়েটা দাওয়ায় দুখানা আসন বিছিয়ে দিলো। তার ওপরে বসে আমরা পা ঝুলিয়ে দিলাম।

হেমন্ত বলে, "সাবিত্রী কোথায়?"

"সাবী? ওমা, দিনমানে সে তো বড়বাজারে যায়। রঘুবীরমলের গদীর মালিক ওকে যে বরাদ্দ টাকা দেয় গো। মস্ত মক্কেল।...কেন? আসবেখুনি ঠিক সময়ে। থিয়েটারে যাবে। কোনো কথা আছে?"

পানের বাটা থেকে পান সেজে দু খিলি হেমন্তকে, দু খিলি আমাকে দিলো।

"উটি কে?"

"আমার একটি ভাই। ডাক্তারি করে। এসেছে বেড়াতে। সাবিত্রীকে

ভালবাসি কিনা; তাই দেখাতে আনলাম। যাক্ থিয়েটারেই পরিচয় হবে। এইটে এনেছিলাম। সাবিত্রীকে দিয়ে দিও।" গহনার বাক্সটা নামিয়ে রাখলো।

বাক্সটা কেউ হাত দিয়ে ছুঁলোও না পড়েই রইল।

হেমন্ত আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

গাড়ি ছাড়তেই বললো, "এই তো শিল্প। এইসব ফল্নাদের তেল জোগাচ্ছি বামনের ছেলে। এক এক সময়ে নিজের গালে নিজে চড় মারতে সাধ যায়।"

রেগে বলি, "দিতে গেলে কেন?"

হাসে হেমন্ত। "পরকীয়া! ঐটুকুই বুঝিস কিনা! থাক্ আমার সঙ্গে আরও বুঝবি।"

"ঠাট্টা করো কেন? এ নারী সে নারী নয়, তা বেশ বোঝা যায়।"

"কোন্ নারী নয়?" ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেন হেমুদা!

আমি হঠাৎ গলার শব্দ বদলে জিজ্ঞাসা করি "হিমুদা তুমি অন্য নারীতে আসক্ত একথা সত্য?"

"কেন? অসম্ভব? পরকীয়? সে কি খালি বাক্যের শিকেয় তোলা হাঁড়ি?"

"হ্যাঁ অসম্ভব। তোমার ব্যঙ্গ সত্ত্বেও অসম্ভব।"

"কেন, কিসে অসম্ভব বোধ হয়?"

"সে কথা তোমায় বুঝিয়ে বলতে হবে?"

হাসলো হেমন্ত।

খানিক বাদে একটু গলা খাটো করে, বললো "দেখ্ সোম, প্রেমই বল্, ভক্তিই বল্, একটা কিছু নিয়ে ডুবে থাকা মানেই, অন্য সব কিছু থেকে মনকে সরিয়ে রাখা। সেই সংযম। আর কিছু নয় তা। কোনো সংযমেরই বড়াই নেই।"

বুঝলাম না কথাটা। বললাম হেমন্তকে, "আর একটু পরিষ্কার করে বলো।"

"পরিষ্কার? কোনো মেয়েকে ভালবেসেছিস্? কারুকে? পরকীয়া? কোনো অবৈধ প্রণয়?"

লজ্জিত হয়ে পড়ি। হেসে বলি, "কি যে বলো!"

"কী যে বলবো আর কি! বয়েস তো হয়েছে। হলেই বা কি? হতে পারেও তো।"

"তাই বলে উচ্ছৃঙ্খল হবো?"

"ব্রহ্মচর্য আর সংযম! বড়াই করিস নি। আছে বলে আছে, বড়াই করার কিছু নেই। যার নেই, তার নেই বলেই নেই; ঘৃণা করারও কিছু নেই। একটা কথা এই অভিজ্ঞ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে জেনে রাখ। বিশ্বামিত্রই শুধু নয়, তোকে, রামকে, শ্যামকে সকলকেই ঘায়েল করার মতো মেনকা আছে। আছেই আছে,

কোথাও না কোথাও। তার সঙ্গে তোর আজও দেখা হয় নি, এই যা। নৈলে কী মূল্য সংযমের আর কী মূল্য ব্রহ্মচর্যের! সাধারণ পোকামাকড়ের চেয়েও সাধারণ মানুষ আমরা; আমাদের ব্রহ্মচর্যের বড়াই নেই রে। আশীর্বাদ করি যেন কোনো দিন তার সঙ্গে তোর দেখা না হয়। কিন্তু যদি দেখা হয়, দেখবি জগতে প্রণয় আর প্রেম বেশির ভাগ এক তরফা। মানুষ ভালবেসেই মরে। ট্রাজেডী সেখানে। আর যেখানে ভালবাসার দান-গ্রহণ রইলো সেটাকে স্বর্গ বলে সব। বাজে কথা। স্বর্গ ভালবাসায়। ভালবাসা পাওয়ায় নয়। না পেলেও ভাল-বাসতেই হবে এমনই মজার কারখানা। সেটা হলো মন্দাকিনী-তীর। এক তরফা স্রোত। আর লেন-দেন, চুক্তি যেখানে, সেটা স্বর্গের বেনে-বাজার। সেখানে গৃহস্থালি চলে।"

"তুমি কি বলছো? ভালবাসায় দান-প্রতিদান নেই? ব্রহ্মচর্যের মূল্য নেই?"

"অমন কিছুই বলি নি। বলেছি, ব্রহ্মচর্যের বড়াই নেই। কেননা তাকে দেখ নি যে তোমায় একেবারে এক দৃষ্টিতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে; তাই এত বড়াই। বৃন্দাবনে এমনি একজোড়া চোখ এককালে দেখা গিয়েছিল, সেই গান আজও সবাই গায়। নবদ্বীপের পথে এমনি একজোড়া চোখের চাউনিতে মাতাল হয়ে কত গৃহী, কত পণ্ডিত, কত রাজা মাতাল হলো; সেই গান আজও গায় লোকে। শের আফগান মলো, চিতোর পুড়লো—কেন রে? তুই আজও ব্রহ্মচারী কেন না তোর মনে যে চোখ রাখবে সে এখনও তোর পথে পা দেয় নি। বড়াই করতে নেই। ঘৃণাও করতে নেই।"

"দান-প্রতিদান? সেটা?"

"তুই-ই বল। তেমনি একজোড়া চোখ যদি তোর চোখে পড়ে, তখন কি তোর মনে থাকবে, 'এ দেবো কিনা'। তখন কি শুধু তাকে দেখেই তোর তৃপ্তি নেই? পটের ছবিতে আঁকা মূর্তিকে ভালবেসে বেসে সারা জীবন কাটিয়ে দিল এমন গোঁসাই কত পাবি। ও রোগ হলে ভুগেই তৃপ্তি; অতৃপ্তিতেই তৃপ্তি; যন্ত্রণাতেই আরাম। ভালবাসা ফকিরী। সব বিলিয়ে সুখ। বেনেবৃত্তি নয় যে দাঁড়িপাল্লার ভার দেখতে জীবন যাবে। অনেক দেখেছি এই রঙ্গমঞ্চের বুকে বসে। এ যে কি শিক্ষা আর কি পীঠ! ভাবতে আতঙ্ক হয়, ছাড়তে বুক চৌচির হয়ে যায়। এর কথা বলার শেষ নেই। ওদিকে দেখ রঙ্গশ্রীর দোরে ভীড় দেখ পুলিস দেখ।"

চমকে উঠি। "ব্যাপার কি!"

"কী আবার। স্বরূপা অভিনয় করবে না। খবর চাউর হয়ে গেছে, তারই ভীড়। বল তো কি লোকসান। কী কেলেঙ্কারী। এদিকে আবার ঐ স্বরূপাদেরও

মোসাহেব সব চর আছে। গিয়ে খবর দিচ্ছে, আর তৃপ্তি সুধায় তাদের মন ভরে যাচ্ছে। আমার এদিকে—"

গাড়ি থামলো। সোজা উঠে গেল হেমন্ত দোতলায় ম্যানেজারের ঘরে।

সঙ্গে সঙ্গে হুটবিহারীর আবির্ভাব।

"আজ খালি প্রেক্ষাগারে 'চন্দ্রশেখর' করো।"

"করবো ভাই। জানো হুটুদা, কপালটা—এ কপালটা কেউ খালি করতে পারবে না। না তুমি, না তোমার স্বরূপা।"

ঘরে এসে প্রবেশ করে তন্বী কিশোরী। মুখচোখ চপলতায় টুলটুল করছে, যেন কাপে-ঢালা শ্যাম্পেনের সন্তফোটা বুদ্‌বুদটির ঝলক। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পরনে নীল ক্রেপ, খোঁপায় একটা বড় লাল পদ্ম, আর চুলের ঢলটাও বড়। ঝরঝরে চেহারায় অদ্ভুত আঁট, যেন ময়াল সাপের চলন, হরিণের বেগ।

হেমন্ত বসতে বলে। পরিচয় করায়, "আমার ভাই সোম। ছোট ভাই। তোমাদের বাড়ি অবধি গেলাম। তুমি তখন বড়বাজারে।"

আমার দিকে চেয়ে বলে, "ইনি আমাদের মঞ্চের তারকা সাবিত্রী।"

লক্ষ্য করে দেখি, হাতে কঙ্কনজোড়া চিকৃচিক্ করছে।

"তারকা হতে দিচ্ছেন কই। জোনাকি করে রেখেছেন।"

নীচে তুমুল গণ্ডগোল।

পুলিস না থাকলে বুকিং অফিস বোধহয় ভেঙে ফেলতো ওরা।

"তারকা আর জোনাকি কি আমরা করি সাবিত্রী। সে করনেওলা হলো ঐ নীচে যারা হৈ হৈ করছে। ওরা যখন কাউণ্টারে টাকা দেয় সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়টাকেও খুইয়ে ফেলে। তাই ওরা ভাবতে পারে পর্দার এপারে যারা তামাশা দেখায় তাদের হৃদয় বলে বস্তুই নেই।"

সাবিত্রী বলে, "কিন্তু যদি স্বরূপার ওপরে সব নির্ভর না করে···"

এতই অসম্ভব কথাটা যে সাবিত্রী নিজেই শেষ করতে পারে না।

বারবার টেলিফোন বিরক্ত করছে। হুটবিহারী টেলিফোন ধরছে "আজ্ঞে না—জ্বর হয়েছে, অসুস্থ···কি করবো, এই জানলাম।···আজ্ঞে নিশ্চয়, টিকিট আর লোক পাঠালেই রিফাণ্ড হবে।···" অনবরত এই চলছে।

এদিকে নিয়মিত অমোঘ ঘন্টি বাজলো। আর বিশ মিনিটের মধ্যে নাটক আরম্ভ হবে।

"তা হলে মেজোকত্তা···", বলে সাবিত্রী।

হুটবিহারী দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, "আবার মেজোকত্তা কি? আচ্ছা তোমাদের ঢং। বলেছি তো আজ তুমিই নাচ গে। পেয়েছো একটা তাল অমনি হন্তে হয়ে পড়েছো।"

হেমন্ত বললো, "থাক্, ওকে অমন করে বলো কেন? সত্যিই আমরা তো সকলকে সমান স্কোপ দিই না। কেউই একটা কর্পোরেট বডি করে নাট্যশালা চালাই না। নাট্যশালাতেও ছোট ছোট জমিদারী আমলাতন্ত্রের আসর গড়ে তুলেছি। কাজেই ওরা যখন একটু অবসর পায় এসে দাঁড়ায়। যাও সাবিত্রী, আজ তুমিই করবে অভিনয় স্বরূপার জায়গায়।"

সাবিত্রী চলে যায় একটা নমস্কার করে। হাতের কাঁকনজোড়া যেন কথা কয়।

হেমন্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে হাসতে থাকে।

বাইরে রেকর্ড বাজে—"যদি দখিন পবন আসিয়া ফেরে গো দ্বারে—।"

নীচে মোটর আসছে, লোক নামছে, দোর বন্ধ হচ্ছে, আবার মোটর চলে যাচ্ছে। ওপর থেকে সব শোনা যাচ্ছে।

"তোমায় অভিনয় করতে হবে না?"

"হ্যাঁ এবার উঠবো।"

দুজনেই উঠে সাজঘরের দিকে চললাম।

প্রেক্ষাগৃহে উঁকি মেরে দেখলো হেমন্ত। অর্ধেকের কম ভরেছে। ওরই মধ্যে একজন হেমন্তকে দেখতে পেয়ে বলছে, "আজ শৈবলিনী আর প্রতাপ দুটোই কি আপনি করবেন নাকি?"

কে এক ছোকরা বললো, "আছে পকেটে পচা ডিম। হোক না পার্ট খারাপ।"

কে একজন সহৃদয় ব্যক্তি বলছে, "দিচ্ছে তো রিফাণ্ড মশায়! নিয়ে যান না।"

"যাবো কোথায়? গাড়ি সেই নটা রাত্রে। এসেছি মফঃস্বল থেকে। সঙ্গে বন্ধু বন্ধুর বৌ। যাও বললেই যাওয়া সহজ কিনা।"

আমার দিকে চেয়ে হেসে হেমন্ত চললো সাজঘরের দিকে।

যেতে যেতে বলে, "নিষ্ঠুর নিয়তির মতো অমোঘ নিষ্ঠুর এই দর্শকের দল। যেদিন ছোট মেয়েটা মরে সেদিনও অভিনয় করেছি। একবার বুকের হাড় ভেঙে গেল। অভিনয় করেছি বুকে প্লাস্টার নিয়ে। রোম্যান দাসদের যে স্বাধীনতা ছিল নাট্যশিল্পীর তা নেই, মঞ্চাধিকারীর তো তা নেই-ই। আমাদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই। এক এক সময়ে হাসি পায় ভাবতে, যদি কোনও মেয়ে-মানুষকে এতটা বরদাস্ত করতাম লোকে করতো নিন্দে। অথচ এই মঞ্চসুন্দরীর হাস্যবদন দেখার জন্য কত লাথি ঝাঁটাই খেতে হয়।"

একটা ছোট ঘর। তাতে মাথায় সাদা পাগড়ি বেঁধে সাজসজ্জা করে বসে আছেন শ্রেষ্ঠ নট রাজীব রায়। বাংলাদেশের মঞ্চভরা দেহ, মঞ্চভরা গলা। অমন অভিব্যক্তি আর সাজসজ্জা কেউ নাকি পারে না।

গাড়ি নিয়ে গণ্ডগোলটা শোনাই ছিল।

হেমন্ত বললে "গাড়ি গিয়েছিল তো দাদা ?"

গম্ভীর মুখে রাজীব রায় বলেন, "হ্যাঁ। ওই গাড়ি পাঠানো তোমাদের এক ঝামেলা। আমি ভাবছিলাম কি, গাড়ি আর পাঠিও না। বুড়ো হয়েছি যে কালে এসব ছেড়ে দেওয়াই ভাল। অনেক তো হলো আর কেন ?"

সর্বনাশ ! আমি বেচারী হেমন্তর দিকে তাকাই।

ক্রিং ক্রিং করে দ্বিতীয় বেল হয়ে গেল। সাজঘরের বাতিগুলো দপ্ দপ্ করে ওঠে। নতুন গান বাজে রেকর্ডে, মাইকে—"প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায়—।"

হেমন্ত বলে "সে কি দাদা। আপনারা না এলে আমরা শিখবো কার কাছে। কষ্ট তো করতে হবেই, যতদিন আমরা না ছাড়ি। ওরে, দাদাকে এক গেলাস কিছু দিলি টিলি ? দিয়েছে দাদা ?"

হেসে রাজীব বলেন, "ওসব ন্টু আর দেয় না। বলেছে দেবে। তা সে থেকে বসেই আছি। না হেমন্ত, এ সব সত্যিই ঝামেলা বোধহয়। দেখ না, টাকাটা আমি বরাবরই আগে নিয়ে থাকি। আজ ন্টু কি সব পোস্টার আর স্বরূপা আর গণেশ সব ভ্যানর ভ্যানর করে গেল। কিছুই বুঝলাম না। মোদ্দা; টাকার দেখা নেই।"

তৎক্ষণাৎ হেমন্ত পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকা বার করে দিলো। "এই আছে আমার কাছে এখন নিন। বাকী আপনি যাবার আগে দিয়ে দেব।"

টাকা কটা হস্তগত করে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলেন, "যাবার আগে তো অভিনয়টা শেষ হওয়া চাই। পঞ্চাশ দিলে দেড়-অঙ্ক অবধি চলবে।···কিন্তু টাকার জন্যে যখন আসা, বুড়ো বয়সে রং মাখা, তখন টাকা নিয়ে এই ঝামেলা ভাল লাগে কি ?"

"না, ন্টুকে বলা আছে, টাকা আপনাকে দিয়ে যাবে। ওরে দাদাকে আর এক গেলাস দিয়ে যা। কিছু খাবার দাদা ?"

"নাঃ আর খাওয়া দাওয়া গেছে।"

"ব্যথাটা কেমন আছে ? ডাঃ নবনীরদ গুপ্তকে বলেছি। একদিন দেখে আসবে। বৌদির শরীরটাও তো ভেঙেছে শুনছি।"

বাতি আবার জ্বলে উঠলো দপ্ দপ্ করে।

ওর যেমন নিজের ঘর তেমনি প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট নট ও নটীর নিজের ঘর। "যতই ছোট হোক নিজের বলে একটু চুলো থাকলে মনটা যেন ভাল থাকে। আর্টের পক্ষে একান্ততা, নিঃসঙ্গতা বড় দরকার। বড় দরকার একফালি গোপন-বিজন ঘর। আর্টের বেরিয়ে আসার দিনে যেমন সহস্রের দৃষ্টির অভিনন্দন দরকার,

তেমনি আর্টের তপস্যা, সাধনা, রচনার সময়টায় তাকে হতে হবে রহস্য-গোপন বহির্দৃষ্টি ছেড়ে অন্তদৃষ্টির উজ্জ্বল লক্ষ্য।"

রঙ্গশ্রীর এই ছোট ছোট ঘুপসি ঘরগুলোর কথা সর্বত্র আলোচিত হতো। প্রত্যেক নট-শিল্পী হেমন্তর ব্যবহার প্রশংসা করতো।

হেমন্তর ঘরে কানু সাজকর এসেছে হেমন্তর পোশাক নিয়ে। প্রতাপের পোশাক—মালা, পাগড়ি, তলোয়ার। ওকে সাজিয়ে দিচ্ছে কানু।

হেমন্তর পেটটা ভারী হয়েছে। কানু লম্বা কাপড়ের ফালিটা নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেঁধে দিচ্ছে পেটে।

হেমন্ত কথা বলে চলেছে।

এর মধ্যে কানু হেমন্তকে খাবার এনে খাইয়েছে।

এ সময়টা হেমন্ত খায়।

আমি তো পেলামই; কানুও তার অংশ পেল। এত প্রচুর ব্যবস্থা।

খাচ্ছে আর বলছে হেমন্ত। "শালা। রোজ দেড়শো করে নেবে। নগদ কড়কড়ে। দুটি গেলাস মাল টানবে। এক প্লেট খাবার। মোটর চাই। তার ওপর একটু চক্ষুলজ্জা নেই শালার। দাদা বলতে বুক ফেটে যায়। এর চেয়ে বেশ্যাবৃত্তি ভাল হে। খানিকটা স্বাধীনতা আছে। তোমরা বলো, বাজারের মেয়েমানুষের মন পেতে হলে এর চেয়ে বেশী কি করতে হয় বলতে পারো?"

আমি বলি, "কিন্তু টাকা করেছে, বাড়ি করেছে। অন্যান্য শিল্পীদের মতো হা-হন্যে হয়ে বেড়ায় না।"

"কি আর বলবো বলো। আমরা শিল্পী। ভাল করে বনেদ পাকা করা আমাদের শোভা পায় না। নারীর সতীধর্মের সঙ্গে যেমন ছিটেফোঁটা হলেও ত্যাগ একটা মহিমা দান করে থাকে, তেমনি শিল্পীদের চরিত্রে বাউণ্ডুলেপনা একটা চার্ম্ এনে দেয়; ও যেন শিল্পী চরিত্রের সুর। নাচিয়ে, গাইয়ে, লিখিয়ে, আঁকিয়ে—কে নয়? কোন্ শিল্পী নয়? এত গুণে গেঁথে পা ফেলে সব গুছিয়ে গাছিয়ে শিল্পী-জীবন সোনার পাথর বাটি, আনরিয়ালিটি। দেখো না চার্লি চ্যাপলিনের জীবন। কখনও মালিক, কখনও শালিক। যে লোক তীর্থযাত্রা করতে গিয়ে সব পোটলাই গুণে গেঁথে ভর্তি করে ফিরে এল তার আবার তীর্থযাত্রা কি? সে তো উৎকৃষ্ট বেনে-পো হে!"

জোরে এবার ঘণ্টি বেজে উঠলো! ভূতে পাওয়ার মতো বাতিটা টেবিলের ওপর দপদপ করে উঠলো।

তাড়াতাড়ি রসগোল্লাটা কানুর হাতে দিয়ে হেমন্ত বেরিয়ে গেল।

পাশের সরু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে হেমন্ত নামলো পেছনের অন্ধকার দিকটায়।

একগাদা দড়ি আর কাঠের তক্তায় ভরতি। ইলেক্ট্রিকের তারের জটাজাল ইতস্তত ঝুলে আছে। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলপড়া, নোংরা। পিছনের এক ফালি দরজা দিয়ে বিকেলের রোদের খানিকটা ঝিলিক একটা ধারে এসে পড়েছে। সেইখানে লম্বা চেহারার এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। দীন বেশ। মলিন শতচ্ছিন্ন পাঞ্জাবি। নেশায় ভাঙে জর্জর অবয়ব। নাকটা ঝুলে পড়েছে। মুখ চোখ থমথমে। পায়ে ছেঁড়া স্যাণ্ডেল। মাথায় বাবরি চুল। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকে, "হেমন্ত !"

হেমন্ত দেখেই চমকায়, "বীরু ! তুই ? তোর না জ্বর ? এখন কেমন আছিস ?" ওর গায়ে হাত দেয় হেমন্ত। "সে কি রে জ্বর তো রয়েছে রে।"

"ছাড়বে কি ভাই ? ছাড়বে না। স্বলতার আসন্ন ডেলিভারী। যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে। একটি পয়সা নেই। লজ্জা করে তোমার কাছে আসতে। যাদের কাজ করি তারা এক পয়সাও অগ্রিম দেবে না।"

"চারু দিলো না ? তোকে পয়সা দিলো না চারু ?" ওর দুটো হাত চেপে ধরেছে হেমন্ত। "দাঁড়া। একটাও টাকা নেই আমার পকেটে। সব দিয়ে এলাম ঐ সংক্রান্তি পুরুষের পায়ে। আয় না চলে আমার এখানে। আমি তোকে টাকা দেবো।"

"কিন্তু কণ্ট্রাক্ট্ করেছি তিন বছরের।"

"তারপর ?"

হেসে বীরু বলে,, "তারপর কি বাঁচবো ? যাও তুমি সীনটা করে এসো, আমি দাঁড়িয়ে আছি।"

"দাঁড়িয়ে থাকবি কেন ? এ আমার বন্ধু সোমনাথ। কাশীতে বাড়ি। এর সঙ্গে আমার ঘরে গিয়ে বোস্। আমি আসছি—"

ঢুকে গেল স্টেজে। গিয়েই আরম্ভ করলো সেই জলের দৃশ্য—শৈ···।

আশ্চর্য এই রঙ্গমঞ্চের তাগাদা। এর চুষে নেবার, কষে নেবার, শেষ ক্রান্তি আদায় করার নির্মম ঔদাসীন্য চমৎকার।

আমি ওকে নিয়ে ওপরে যেতে চাইলাম।

"নাঃ আমি ওপরে যাবো না। ওখানে মুটু আছে। আমার অন্যান্য সহকর্মীরা আছে। মুখ দেখাতে লজ্জা করে। এ মুখ দেখাই না।"

আমি একটু শঙ্কিত চিত্তে প্রশ্ন করি, "আপনি কি বীরু পাঠক ? যিনি প্রথম শ্রীরামচন্দ্রে নেমে নাম করেন ?"

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বলেন, "না-না আমি সে বীরু পাঠক নই। সে মারা গেছে মদে আর রোগে। সে বীরু পাঠকের এ দুর্দশা বাংলার সহৃদয় ভাইবোনেরা

কখনো সহ্য করেন ? আমায় আপনি চিনবেন না। আমি কেবল একটা অখ্যাত পরিচয়ের দাবি রাখি এখনও। এখনও আমি সুলতার স্বামী। আসতাম না এখানে। কেন জানেন? এই হেমন্তটাও ডুবতে বসেছে। ওর পেছনে তিন শনি লেগেছে। ত্রিপুষ্কর জানেন ? তাই। এক ঐ মুটু, দ্বিতীয় ওর গুরু, তৃতীয় জানি না কে সে মেয়ে মানুষ যে ওকে টলায়। জানতে সাধ যায়। ভাবি গিয়ে তাকে প্রণাম করে আসি। কিন্তু গুহ্যাতিগুহ্য তা। কেউ জানে না। আর ওকে মারবে আমার মতো শকুনিরা। চাইলে কোনো নটনটীকে ও না দিয়ে ফেরায় না। তাই অন্তত আমি ওকে মুখ দেখাই না। কিন্তু আজকাল রক্ত উঠছে খুব। সুলতাকে জানাই নি এখনও। সুলতাও মরবে। আমার ইচ্ছে আমার সামনে মরুক। এবারেই মরবে হয়তো।"

এই রঙ্গমঞ্চ ! ওপরে রাজীব টাকা গুণে নিচ্ছে, তোষামোদ পাচ্ছে, পাচ্ছে পান, আহার, বিশ্রাম। নীচে এই বীরু পাঠক, যার অপ্রধান চরিত্রের অভিনয়-উৎকর্ষ দেখার জন্য তরুণ মহলে বিপ্লব লাগতো। একে রঙ্গমঞ্চ প্রত্যাখ্যান করেছে। আকের ছিবড়ের মতো এখন ও চিরকালের জন্য পথের কাদায় শয্যা পাতলো, যাবৎ না মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়।

বীরু পাঠক সেদিন পঞ্চাশ টাকা যখন পেল তার চোখ দিয়ে যৌবন-গলিত তপ্ত ধারা বয়ে এল। বীরু বললে "হী-ম্যান্ বলে খ্যাতি ছিল। এ চোখে অভিনয় ছাড়া মানুষের জল পড়তে দেখে নি কেউ। তুমি এ চোখ ভেজালে। কিন্তু এত টাকার দরকার ছিল না ভাই। আমি এ কখনও শোধ করতে পারবো না।"

হেমন্ত একটা সিগারেট বীরুকে দেয়। বলে, "তুমি পারবে না বললে কি হবে বীরু। পারতে তোমাকে হবেই। আমিও তোমারি দলের অঘোরপন্থী। এই একই শ্মশানে মানুষ আমরা। আজ তুমি যে চিতার ছাই অঙ্গে মেখে দিগম্বর হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেলে, আমাকেও একদিন এই চিতার ছাই অঙ্গে মেখে কমণ্ডলু নিয়ে ভিক্ষায় বেরুতে হবে। তখন তুমি বীরু শতশত বীরু হয়ে বাংলা দেশের দাক্ষিণ্য হয়ে আমায় ফিরিয়ে দেবে আমার কড়ি ভাই। নৈলে বাংলা দেশে বিছানায়, সুখশয্যায় শিল্পীর মৃত্যু কার হয়েছে ভাই ? ও টাকা তুমি নাও। আমি কাল তোমাদের বাড়ি যাবো। জানি এ টাকা রাখলে রাজীবের মতো আমারও গাড়ি হতো, বাড়ি হতো, লোকে বলতো জীবনে আমি সাক্‌সেস্‌ফুল। কিন্তু কোন্‌টা যে সাক্‌সেস্‌ জানলাম না। এ জীবনটা শুধু 'সেস্' মিটিয়েই গেলাম। পরের জীবনে সাক্‌সেস্‌ হবো। তুমিও আমিও। লজ্জা পাস্ নে বীরু। আমিই বীরু ; কেবল কদিন পিছিয়ে আছি। তোতে আর আমাতে, সুলতাতে আর চিন্ময়ীতে তফাত নেই রে তফাত নেই।"

আমি নির্বাক-বিস্ময়ে দেখতে লাগলাম কেমন করে ঘন্টী আবার বাজলো, আবার হেমন্ত নেমে গেল মঞ্চে। বীরু তার লাঠি ধরে টুকটুক করে নেমে গেল। বাইরে বর্ষা নামলো। অভিনয় শেষ হবার আগেই কেমন নুটবিহারী এসে ঘনঘন গোঁফে চাড়া দিতে লাগলো আর বললো, "যাক্ সিচুয়েশন্ সেভড্। আজ রাতের মারটা খেতে হলো না। বুকিংয়ে টিকিটের দাম দুগুণ করে দিয়ে এলাম। সব টিকিট বিক্রি হয়ে যাচ্ছে হু হু করে। কৈ একটা সিগারেট বার করো। কর্তা কৈ? খবর আছে।"

অভিনয়-শেষে আমরা এসে বসে আছি ম্যানেজারের ঘরে অর্থাৎ হেমন্তর ঘরে। হেমন্তর ঘর মানে একটা পার্টিশানের মধ্যে সাজানো ছোট ঘর। বড় ঘরখানার অন্যপাশে বড় একখানা গোল টেবিলের চার পাশে চেয়ার পাতা। একখানায় নুটু বসে। ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেন কথাবার্তা সেখানটায় চলে। আর তার পাশেই ভেতরে টেলিফোন, চমৎকার টেবিল, এক র‍্যাক ফাইল, এক আলমারি বই নিয়ে বসে হেমন্ত।

হেমন্ত আর আমি হেমন্তরই ঘরে এসে বসেছি। বাইরে নুটুর সামনে তিনটি সুশ্রী তরুণ বসে। কথা কাটাকাটি করছে।

আমি ওদের কথার ধারাটা বুঝতে পারি না। জিজ্ঞাসা করি, "কি চাইছে ওরা? নুটুর এত মুরুব্বিয়ানা ওদের ওপর কেন? দেখে তো বেশ ভদ্রবংশ মনে হয়।"

সিগারেট ধরিয়ে হেমন্ত বলে, "ও লেগেই আছে। হপ্তায় চার দিনে ছ'টি শো দিই আমরা। এ ছাড়া তিন দিন স্টেজ খালি থাকে। রোববার সকালটা যদি ধরিস চারটে শো খালি পাই। কলকাতায় এ্যামেচার ক্লাব ছাড়াও একেবারে ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিশেষ বিশেষ শো অর্গানাইজ্ করে বেশ দু পয়সা রোজগার করে। তারা সব স্টেজ বুক করিয়ে যায়। তাদের একটা দল বোধ হচ্ছে। এরা এ্যামেচার বলেই মনে হয়।"

"কত করে ভাড়া নিস্ তোরা?"

"নুটবিহারীর কৃপা তা। দেড়শো, দুশো, আড়াইশো, তিনশো; কখনও কখনও এমন কি পাঁচশো করেও পেয়েছি।"

"নুটুর এতে বেশ দু পয়সা হয় তা হলে বলো।"

হেমন্ত বলে, "থাকি ভূত নিয়ে, অথচ মাঝে মাঝে ভ্যাংচাবে না, ভূতুড়েপনা করবে না, এ কখনও হয়? অতশত মন দিতে গেলে চলে না। নুটুদার কথা বলো না। ব্যবসা বুদ্ধি ওর প্রখর। একবার আমি নিজে জানি এই স্টেজ ও এক রাতে বারশো টাকায় ভাড়া দিয়ে আফিসে জমা করেছিল মাত্র তিনশো।"

"সে কি?"

"হ্যাঁ। কলকাতার এক বড়লোক-বাড়ির বিয়ে। ওরা বিয়ে উপলক্ষ্যে এক জলসার ব্যবস্থা করে। নুটু কি করে জানতে পারে। নিজে তো ও খুবই পরিচিত।

এ তল্লাটের সব কখানা হাউস কোনোটা শ'য়ে, কোনোটা দেড়শোতে বুক করে নিয়ে তারপর দর হাঁকতে লাগলো। মাঝ থেকে কিছু টাকা করে নিল। এমনি একই দিনের স্টেজ তিন-চারবার হাত ফের হয়ে যায়। মাঝের লোকগুলো কিছু লাভ করে নেয়। লোকে তো আর বুকিংয়ের খোঁজ রাখে না। মিথ্যে পোস্টার আর হ্যাণ্ডবিল দেখেই মাত হয়ে যায়। এই স্টেজ ভাড়া নিয়েই জুয়া, ফাটকা, নানান্ ফন্দিফিকিরের অন্ত নেই। পায় বৈকি ; নুটু বেশ দু পয়সা পায় এখান থেকে।"

ভদ্রলোক তিনজন ঘরে এলেন।

"সোমবার বিকেলটা উনি বলছেন একটা পার্টির কাছে বুক আছে। পার্টি বলছে নেই। তাদের কাছ থেকে হয়ে আসছি। আমরা তার চিঠিও এনেছি। অথচ উনি দিচ্ছেন না।"

নুটুও এসে গিয়েছিল ঘরে। বললে, "দেবো না বলি নি। বলেছি আমি নিজে কথা না বলে কিছু কথা দিতে পারি না।"

একজন বললেন, "তবে বললেন পঞ্চাশ বেশী হলে ঠিক করে দেবেন।"

"শুনলাম স্কুলের জন্য সাহায্য রজনী। তাই ভাবলাম ওদের মানিয়ে নেবো যাক্ দেড়শো দিচ্ছিলেনই, ওটা দুশো করে দিন, আমি বুক করে দিচ্ছি।"

হেমন্ত বললে "রাজী হয়ে যান্, রাজী হয়ে যান্। এ আমাদের নুটুটা। উপায় নেই রাজী না হয়ে। দুশো দিয়ে দিন। আর আমায় একটা বক্স দিয়ে দেবেন, পঞ্চাশ টাকা ব্যাস্।"

ছেলেরা রাজী হয়ে চলে গেল।

নুটু ওদের কাছ থেকে টাকা গুণে নিয়ে রসিদ দিয়ে ঘরে এসে বললো, "তোমার আমি ব্যবসা আর বোঝাতে পারলাম না। দিত ওরা ঐ দুশোই। পঞ্চাশ টাকা ছেড়ে দেওয়ার কি মানে হয়?"

হেমন্ত বলে, "নাও সিগারেট ধরাও। ওদিককার খবর শুনি।"

নুটু বাহিরের দিকে চেয়ে বলে, "নাও শুনতে হবে না, খবর নিজেই পায়ে হেঁটে আসছে এদিকে।"

স্বরূপা এসেছে।

তার সঙ্গে এসেছে নন্দ গোঁসাই, বিষ্টু, নতুন কিশোর নট সুমিত।

নুটবিহারী সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "কেমন আছো? ভাল তো?"

স্বরূপা ভ্রূ ভুলে, কোমর দুলিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, "অ-ভালো থাকার জো কই! একটা দিন আসি নি, মেজোকত্তার নাটমন্দিরে আরতি দেখার লোক নেই। বড় বড় কাঠের অক্ষরে ছাপা বুড়ো বুড়ো ক্ষমতাশালী দেবতার ভোগ

প্রসাদ করে দিলে ছিঁটেফোঁটা পেয়ে থাকি। তা যদি আরতিই না জমলো, ছিঁটে-ফোঁটা জুটবে কোথা থেকে?"

স্বরূপার বচন নয়, অগ্নিবাণ। বলন নয়, যুদ্ধ ঘোষণা। আসনে বসা নয়, বিজয় উৎসব। পলকের মধ্যে পুরুষ হরমোনগুলো যেন নতুন রক্তের সূচিকাভরণে চনমন করে উঠলো।

হেমন্ত বললো, "নাও সিগারেট খাও। অত রাগ কিন্তু দুল দুটি তো দিব্যি পরে এসেছো। করুণা বুঝি?"

"না, দারিদ্র্য। আর নেই কিনা মেজোকত্তা।"

হেমন্ত বললো, "বাপরে, কী রাগ। জানো বয়সে কত বড়।"

"বয়েসে বড়দের দাপট দেখতেই তো এলাম। বলেন না কেন বয়সে বড়দের অডিটোরিয়াম ভরিয়ে দিতে। চোয়ালের নাচ দেখিয়ে আর ওগ্‌রানো চোখের ওপর ফ্লাশ্‌ লাইট টেনে এনে গ্যালারি ভরে তোলা সহজ। প্রতিষ্ঠানের আয়ু-পরমায়ুর ওপর ভ্রূক্ষেপ না করে তাকে চুষে চুষে নতুন নতুন বাড়ি করাও কঠিন না, প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখাই কঠিন।"

হেমন্ত বলে, "তা তো বটেই। তোমরা হলে শক্তির জাত। তোমাদেরই যদি সব দিকে নজর না থাকবে তো মধুকৈটভ বধই হবে কি করে, মেদিনী রচনাই বা হবে কি করে। তোমাদের সহানুভূতির প্রতাপকেই মায়া বলা হয়।"

স্বরূপা বললে, "অনেক মধুকৈটভ জুটেছে এ প্রতিষ্ঠানে। সেই কথাটাই বলতে এলাম মেজোকত্তা। তাদের বলে দেবেন আপনি যে, প্রতিষ্ঠানের টাকাতেই আমি বেঁচে আছি বটে, কিন্তু প্রকৃত কথা আমার কৃতিত্বেই প্রতিষ্ঠান বেঁচে আছে। কড়া-কটু হলেও কথাটা গিলতেই হবে। নৈলে ক্ষয়রোগ ধরবে প্রতিষ্ঠানের। শ্রীমান বুড়োদের আড়াই হাতি নামে সে ক্ষয় ঘুচবে না।"

"বসো, বসো," ঘাবড়ে বলে হেমন্ত। "কে তোমাকে কি বলেছে, তাই নিয়ে আমার ওপর রাগ কেন? আমি সওদাগর লোক। এ হাটের মাল ও হাটে করি বই তো নয়। আমার কি সাজে—"

রুখে বলে স্বরূপা, "সওদাগরের বোঝা বওয়া ঘোড়া আমরা, না মেজোকত্তা? আমরা তো আরও অধম। দানা-পানি আর চাবুক ছাড়া প্রাপ্য আমাদের কিছু নেই।...তবে একটা কথা বলে রাখি দাদা, ঘোড়সওয়ার হয়ে আছেন, তাই বলছি—ঘোড়ার দলে খচ্চর থাকলেও ঘোড়া হয়ে যায় না। খচ্চরগুলোকে সামলাবেন। ওদের বিশ্বাস নেই।"

হেমন্তর অবস্থা সাংঘাতিক। সব চাঁইদের টিকটিকি ঘোরাফেরা করছে।

স্বরূপা তো হাঁকডাক করে বলে চলেছে। যদি কেউ গিয়ে যথাস্থানে কথাগুলো রঙ্গে রসে চড়িয়ে নিবেদন করে, কী সর্বনাশ হবে।

নুটবিহারী কাঁকড়ার চোখ নিয়ে চেয়েছিল। চশমা ঝুলে পড়েছে নাক থেকে অনেকটা নীচে।

স্বরূপা চলে যাওয়ার পথে আগলে বললো, "এ শোটায় কাজ করছো তো স্বরূপা? অত রাগ কি করতে আছে। যদিচ রোগ করলে তোমায় দেখায় ভাল। স্বরূপা যেন শতরূপা হয়ে যায়।"

ঘাড় বেঁকিয়ে স্বরূপা বলে, "তাই নাকি? আপনি যদি ভাল দেখেনও নুটুবাবু আমার লাভ তো নেই-ই, আপনারও লাভের আশা কম। আসি ঐ ভোলামানুষ মেজোকত্তার খাতিরে। খাঁটি বামুন; তাতে সত্যি কোনো প্যাঁচে নেই। যতসব মারপ্যাঁচ আপনার মতো টেস্টটিউব মার্কা ল্যাবরেটরিদের পেটে।"

ঘাবড়ে যায় নুটু। তবু বলে, "শোটা—।" ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্বরূপা বলে, "শো দেখালাম না-করে; সেটা দেখেছেন ম্যাটিনিতে। হাউসে ঘুঘু চরেছে। আর শো দেখানো হবে এখন। হাউস্ ফুল, ডবল দামে। চলে যাক ঐ চোয়ালযুক্ত রাঘববোয়াল যে কেবল টাকা চেনে; দেখবেন হাউস্ ফুলই রয়েছে।"

চলে গেল; ঝড় বয়ে গেল যেন।

নুটু হাত গুটিয়ে ফিরে এসে বললো, বাপ্, এইসব মাল নিয়ে ব্যবসা। জ্যান্ত এক একটা হাউট্জার। টাইম বোমা। বসে আছি আছি, দিব্যি। কখন যে ফাটবে কে জানে।"

এদিকে উঠেছে হেমন্ত।

"কোথায় চললে?" ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করি আমি।

"যাই আবার রাজীবের ঘরে। যা সব পাঁচালী পাঠ করে গেল, দেবতার কানে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষ কেউ রুখবে না।"

নুটু বলে, "তুমি গেলেই কি রুখবে নাকি?"

হেমন্ত বলে, "রুখবে না জানি নুটুদা, কিন্তু এখন আমি গেলে তবু যদি খানিক সামলায়।"

ভাবি কী যন্ত্রণা হেমন্তর। কিসের খাতিরে ও এই সব প্রকৃতির লোকের মন জুগিয়ে বেড়াচ্ছে। আর্ট, না পেট? জ্বালার ফেরে না মালার লোভে? এই কি স্বাধীন ব্যবসায়, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকিয়ানা?

দ্বিতীয় শোর জন্য তৈরী হচ্ছেন রাজীব।

হেমন্তকে দেখে বিশেষ একটা আভিনয়িক কণ্ঠে বললেন, "পাটরানী নাকি পাটে উঠেছেন। প্রজাবর্গের হর্ষকোলাহল তো সমুদ্র-কল্লোলবৎ শ্রুয়মাণ হচ্ছেন।"

হেমন্তও গলার স্বর বদলে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললে, "আর বলবেন না দাদা। দিন দিন রুচিও বদলাচ্ছে, না আমরাও গোবরে বসছি। আর ঝকমারি এই জীবনে।"

"কেন জীবনে বীতরাগ কিসে?

"অভিনয়ের কদর নেই। কেবল সেক্স আর ঢং। দেশে এবার পুরুষচরিত্র বিবর্জিত নাটক লেখা শুরু হবে। হলে বেলেল্লাপনার ঢেউ বয়ে যাবে। এখানে আর্টের নাম করাও পাপ।"

"পুরুষচরিত্র বিবর্জিত নাটক যদি নাও লেখা হয়, চরিত্র বিবর্জিত পুরুষের অভাব প্রেক্ষাগারে হবে না। আমাদের চোয়াল নাচিয়ে খাবার দিন ফুরুলো। এখন প্রকৃষ্টতর অঙ্গের নাচ দেখে ডবল পয়সা দেবার দিন। তাই দিও ম্যানেজার। আমার নাম পোস্টারে আর দিও না।"

সর্বনাশ! যা ভাবা গিয়েছিল তাই! এরই মধ্যে প্রতিটি বর্ণ কর্ণগোচর হয়েছে! বাত্যার চেয়ে বার্তা দ্রুত!

"নাঃ পোস্টারে নামও দেবো না, আঠাও দেবো না। মই নিয়ে ভেগে পড়ার আগেই আমি নেমে দাঁড়াই। দিন্ না কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে দাদা, সত্যি বলছি। এ খোয়ার এখানেই দিই শেষ করে। এত অপমান যেন সহ্য হয় না আর।"

"তোমার আর অপমান কি! তুমি সত্বাধিকারী। আর অপমান হলেই কি! টাকা তো পাচ্ছো হে। টাকা পেলে সব সয়। টাকা পায় বলেই শক্তির জাত হয়েও নারী দেহে পোষে নরক, হৃদয়ে বিষ, আর জিহ্বায় অগ্নিজ্বালা—"

"আর মাথায় গোবর দাদা, মাথায় গোবর। ও কথাটা ভুলবেন না। জন্ম যার কার্পেট হয়ে লাথি খেতে সে ডরালে চলে? তা হলে ঠাঁই আস্তাকুঁড়ে, কি উনুনে। জন্মেছি নাটকের বীজ বুকে ধরে, হয়েছি থিয়েটারের ম্যানেজার, দুনিয়ার ওঁছা সে ওঁছা কারবার। এখন ফল্না পাড়ার মেয়েদের লাথি খেতে গিয়ে ঘাবড়ালে চলবে কেন?" বলতে বলতে হেমন্ত পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেস্‌টা বার করে নিজে নেয়, রাজীবকে দেয়। আমি ঠায় বসে বসে দেখছি, ভাবছি দক্ষ অভিনেতা হেমন্ত। আর ভাবছি কে দক্ষতর অভিনেতা? হেমন্ত, যে বঁড়শিতে টোপ গাঁথছে; না রাজীব, যে লোভের চাহনি দিয়ে টোপ দেখছে গিলবে বলে—এমন নীরব, নিথর, ঔদাসীন্য সহকারে গিলবে যে বঁড়শির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই থাকবে না; না আমি, যে জগৎপারাবারের তীরে ছেলেদের খেলাটি অর্ধনিমীলিত নয়নে দেখছি অথচ পরম বিরক্তি ও তাচ্ছিল্যের ভান করছি। এমন একটা সেয়ানে-সেয়ানে টাগ্-অব-ওয়ার দেখবার মতো মজা দেখছি।

সিগারেট কেসটা রাজীবের সোফার হাতলের ওপরেই রাখা রইলো। সিগারেট কেস খুলেই লোকে সিগারেট দেয়, এত ঘাবড়ে গেছে হেমন্ত, বা এত বোকা বনে গেছে যে খোলা কেসটাই রেখে দিলো হাতলের ওপর। রাজীব সিগারেট নিলে তা থেকে ; তারপরেও—এমন মন-ভুলো হেমন্ত যে—সেটা তুলে নিল না। ভুলে গেল। ভুলে যে গেল, তা ওর চাউনি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়। ধীরে সুস্থে, ভেবে চিন্তে ভুলেছে।

"লাথি খেলেও সয় তোমাদের," বলে রাজীব। "তোমরা টাকা পাচ্ছ। আমরা কুকুর-বেরাল, কেষ্টোর জীব। আমাদের এঁটোটা-আসটা দিলেই খুশী। আমাদের আবার ঐ লাথি ঝাঁটা কেন। মড়ার পরে খাঁড়ার ঘা!···নাঃ নামে আর দরকার নেই।"

"ঠিক বলেছেন। একটা পার্টি দেখছি। বেচে দেবো ঝামেলা। সিনেমা হলের ম্যানেজার হবো, বা আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো ; যা জোটে···।"

হাসে রাজীব। বনেদী ব্যবসায়ী, কূট হাসি। "আমরা হলাম গিয়ে ভাড়াটে খচ্চর। লাঠির তলাতেই জীবন কাটালাম ; ভার বইলাম। আবার খচ্চর বলে ডাকেও সবাই।"

"কী যে বলেন দাদা!" শিউরে ওঠে যেন হেমন্ত।—অভিনয়-দক্ষতা অপূর্ব। এ পাটে যারা কথা বলবে অভিনয়ই করবে। এ বাজারে লেনদেনে মাংসের ; হৃদয়ের নয়। কসাইয়ের দোকানের আংটায় কখনও ফুলের সাজি কেউ ঝুলিয়ে রাখে না।

রাজীব বলে, "দাদা বললে কি হবে? তাতে কি এ খচ্চর-জীবন ঘুচবে? না চোয়াল নাচানো ঘুচবে? দাদা-খচ্চর হতে পারি, কিন্তু খচ্চর হে খচ্চর!"

হেমন্ত বাকী পঞ্চাশ টাকা বার করে দিয়ে বলে, "যা বলেন বলুন ; আমাকে মাপ করতেই হবে। আমি নির্দোষ তা আপনার বেশী কে জানে? তবে কথা দিচ্ছি আপনাকে একদিন আমি দেখে নেবো, নেবোই নেবো।"

বলে চলে যেতে চায়। আমিও উঠে পড়েছি।

রাজীব বলে, "সিগারেট কেসটা রইলো যে—"

"থাক, থাক। তুচ্ছ একটা কেস বড় হলো দাদা? আরো কি কি রইলো ভেবে দেখবেন।" বলেই দিলে এক দারুণ এক্‌জিট্!

পারেও বিনিয়ে বিনিয়ে বললে হেমন্ত।

"পারোও বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে!" বলি আমি। তখন ওর আফিস-কামরায় বসে। শো শেষ হয়ে গেছে। প্রেক্ষাগারের স্তব্ধতা মধ্যসমুদ্রের সংকেতের মতো সম্পূর্ণ ও সর্বগ্রাসী। বিষ্টু টাকা গুণছে, হুটু পাশের ঘরে টেবিলের ধারে বসে

আছে। হেমন্তকে কানু সাজকর মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। কাজেই নিরিবিলি। কথা বলছি।

"পারোও বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে, ঐসব তেলানো কথা, কানাকড়িও যা বিশ্বাস করো না।"

হেমন্ত বলে, "কম দিন তো হলো না এই লাইনে। কত দেখেছি, কত শুনেছি। সেকালে সব বড় বড় রুই কাতলা ম্যানেজার ছিল। তাদের কথাও তো শুনে এসেছি। এও যেন নাটকেরই একটা চরিত্র। এক ধরনের পার্ট বলে যাওয়া। নিজের বুদ্ধি দিয়ে বলতে হয় এই যা।"

"কিন্তু শান্তি পাও এসব বলে?"

"শান্তি আর পাই কোথায়? কিন্তু ঐ একটা টান : মঞ্চের টান। সব কিছুর পরেও যখন পাদপ্রদীপের সামনে উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়াই, আর সুমুখে দেখি অগণিত জনতার প্রলুব্ধ চক্ষে বিস্ময়ের আরতি, যখন প্রেক্ষাগার কাঁপিয়ে তোলে সহর্ষ প্রতিধ্বনি, তুমুল করতালি, তখন যেন একটা লোকান্তরিত অনির্বচনীয় আনন্দ-সমুদ্রে উদ্বেল হয়ে উঠি। সে যেন একটা রমণীয় অবগাহন-স্নানের পুলক। তার তুলনা হয় না।"

এমন লোকেরই আসা উচিত এ লাইনে!

ইতিমধ্যে কখন যে ও দাঁড়িয়েছে। কিছু কথা বলে নি অবশ্য। কিন্তু বেশ বুঝলাম যেন এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেল। ও আমার দিকে হঠাৎ ভীরু দৃষ্টিতে চাইলো। তারপর ধীরে স্পষ্ট গলায় বললো, "কাজে যাচ্ছি ভাই, বেশী দেরি হবে না। ইতিমধ্যে তুই একটা কাজ করিস। বিষ্টু টাকাটা গুণে দেবে। গাড়িতে করে গিয়ে চিন্ময়ার হাতে দিয়ে যাবি। যদি বাড়িতে আধঘণ্টা দেরি করিস আমিও এসে পড়বো। দেরি করবো না।"

আমি বুঝলাম কি একটা মহৎ টানে ও যেন দিশাহারা হয়ে চলে গেল। সেই উদগ্রীবতার রূপ দেখে আমি আর কিছু বলবার মতো ভাষা খুঁজে পেলাম না।

ও চলে গেল।

আমি ওর সেই ঘরে বসে রইলাম। সমস্ত অপরাহ্নবেলাটা কেন, সমস্ত দিনটাই যেন একটা দামাল বাতাসের মতো হু হু করে ঝড় ঝাপটা তুলে বয়ে গেছে। ওর যেন এটা নিত্য দৈনন্দিন। আমার ঠিক এই গতিবেগ সহ্য করার মতো ধাত নয়। আমি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

হেমন্ত চলে গেল। আমি একটু উঠলাম। ঘুরে ঘুরে শূন্য প্রেক্ষাগারের রূপ দেখছি। সেই সাজঘর। সাজঘরে আমি একা। এ জগতের সঙ্গে যেন শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন হয়ে যায়। নাচঘর আর সাজঘর আর প্রেক্ষাঘরের মধ্যে একটি মাত্র মানুষ

আমি। খানিকটা আগে মনে হচ্ছিল যেন এই সব ঘর, বাড়ি, মঞ্চ, আসন—যত বৃহৎ, যত অফুরন্ত হোক না, এই কোলাহল, ব্যস্ততা, সাজসজ্জার পারিপাট্যের মধ্যে বহির্জগতের যত আত্মপ্রকাশন থাকুক না, হেমন্ত, এবং সেই কারণে আমি, যেন এ সবার আংশিক প্রভু। এরা আমার, আমার জন্য এরা। কিন্তু এখন এই নিস্তব্ধ একক অবলুপ্তির পর্দার মধ্যে থেকে উঁকি মেরে এই দেখাটাই যেন ঠিক বিপরীত একটা রূপ পরিগ্রহ করলো। যেন বিরাট অন্ধকার একটা গহ্বরে আমি একা ঘুরে বেড়াচ্ছি। তিমি মাছের পেটের ভিতরে আমি যেমন অসহায় একা, তেমনি এই বিরাট রঙ্গশালা বিরাটতর হয়ে আমায় যেন গিলে ফেলে হজম করার চেষ্টা করছে।

সেই সারি সারি সীটগুলো খালি পড়ে আছে। কোথাও কোনো আলো নেই। নাটক শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে টুপ্ টুপ্ করে সব বাতি নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমিও বেরুবার আগে সাজঘরের শেষ আলোটা নিবিয়ে দিয়ে এসেছি। পাশের সেই সরু সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখতে ইচ্ছে করে স্টেজের চেহারাটা কেমন এখন। চন্দ্রশেখরের সেই গুহা, প্রতাপের বাড়ি, বজ্‌রার পাটাতন সব একসঙ্গে গড়াগড়ি খাচ্ছে। রাশি রাশি দড়ি ঝুলছে। ইলেক্‌ট্রিকের তারে, দড়িতে, কাপড়ে, বাল্‌বে প্রতি উইংসের পেছনটা, প্রতি পর্দার ধার যেন জটিল একটা সমস্যা হয়ে আছে। আমি স্টেজটার ওপর পায়চারি করি আর ভাবি এটা শ্মশান না শ্মশানকালী; জড় না চৈতন্য? এই মঞ্চের ওপর কত কাল ধরে কত নাটক হয়েছে; কত কিশোরীর আশা, কত যৌবনের রূপ, কত বার্ধক্যের পরাজয়, কত বিপ্লবকারী অভিনয়, কত ব্যর্থ চেষ্টা একের পর এক এসেছে গেছে। নিরাতঙ্ক এই বক্ষে এই মহারাক্ষসী একে একে সকলকে গ্রাস করেছে। কত কঙ্কাল আজও এর প্রেতলোকে ঘুরে বেড়ায়। দেখলাম জীর্ণা নটীকে, রুগ্ন নটকে। শুনলাম যৌবনোদ্ধত স্বরূপার আস্ফালন, প্রবীণ অভিজ্ঞ রাজীবের বিজ্ঞ উক্তি। স্বরূপা আরও বিশ বছর পরে কি হবে তার ইতিহাস এই রাশি রাশি দড়ির স্বাক্ষর ঝুলছে। এই অন্ধকার, এই মাকড়সার জাল, এই ভাঙা বাতি, এই যবনিকার প্রাচীনতা—এরা অনেক স্বরূপার দম্ভকে ধূলায় মিশিয়ে যেতে দেখেছে।

এই মঞ্চের পেছনে কী যে শক্তি আছে জানে না কেউ। কিন্তু আজ একা একা বসে আমি যেন সেই শক্তিকে প্রতি অণু-পরমাণু দিয়ে অনুভব করতে পারছি। নারী নয়, গৃহিণী নয়, বারাঙ্গনা নয়—কারুর আকর্ষণ এমন সর্বস্ব পণ করা নয়, কারুর গঞ্জনা এত তীব্র নয়। এর তাগিদ, এর চাহিদা মেটাতে গিয়ে পুরুষের সর্বস্ব বিকিয়ে গিয়েছে। এই মঞ্চ-মেনকার মোহ সব মোহের সেরা। এর ডাক নিশির ডাক। একে প্রত্যাখ্যান করা সহজ নয়।

টিপ্ করে একটা শব্দ হয়। দূরে দুটো আলো জ্বল জ্বল করে। কোথা থেকে একটা বেরাল নেমে এসেছে। এর ভেতরে অনেক জীব আছে, অনেক ইঁদুর। ইঁদুর শিকার করতে এসেছে। শিকারের পীঠস্থান এই রঙ্গমঞ্চ। অনেক গৃহস্থের তুলসীমঞ্চকে এ আত্মসাৎ করেছে, অনেক লক্ষ্মীর ঝাঁপি এর কুলোর বাতাসের মুখে উড়ে গেছে। ঠিকই বলে হেমন্ত, জীবনে এতাবড় নিষ্ঠুর, প্রবঞ্চনাময়ী প্রতিভা ও দেখে নি। আমার মনে হলো আমিও দেখি নি।

একটু পরেই যেন কার গলা শুনি। কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কিন্তু চুপ করে বসে রইলাম যবনিকার এপারে। ওপারে প্রেক্ষাগারের দিক থেকে শব্দটা আসছে।

"আজ যেও না তুমি। আমি আজ বড় আশা করে নিজে এসেছি।"

"এসেছো কেন? জানো না তুমি? আমি যাবো না!"

এ কণ্ঠ নুটবিহারীর।

"কেন এমন হলে তুমি? এমন তো ছিলে না। আমার এখনও জ্বর। তবু এসেছি। ক'টা দিন আর বাঁচবো বলো। জানি আমায় দিয়ে তোমার সাধ মেটে না…"

"জান তো মরতে এখানে এসেছো কেন? ছি-ছি বিষ্টু আসবে এখুনি। কি বলবে বলো তো? মান-সম্মান কিছু রইলো না।"

"আর আমার মান সম্মান কি বলো? সতীর বুক থেকে স্বামী যায় চলে। তার মান আর কি রইলো বলো। তুমিই আমার মান। আজ চলো। এসেছি যখন ডাকতে, আজ চলো।"

এই মঞ্চ। মঞ্চ ডাকে, আর ডাকে গৃহস্থের অঙ্গন। ডাকে বারবিলাসিনী, ডাকে গৃহলক্ষ্মী। এই ভূমিতে দুটি ধারা এসে মিশে যায়। ধর্ম-অধর্ম, সতী-অসতী, নিষ্ঠা-অনাচার, বিবেক-উচ্ছৃঙ্খলতা এইখানে খানিকক্ষণের জন্য মুখোমুখি দাঁড়ায়।

বিষ্টু ডাকে, "কৈ হে কোথাও তো কারুকে দেখি না। লোকটা গেল কোথায়?"

আর যেন বসা যায় না, উঠতে যাবো।

হঠাৎ শুনলাম একটা শব্দ।

তবে কি নুটু মারলো তার স্ত্রীকে?

দ্রুতপদে নুটু চলে গেল। বিষ্টুর সঙ্গে এক হলো। বললো, "নীচে নেই। ওপরে চলো। চলে তো যাবে না। কর্তা বলে গেছেন ওরই হাতে টাকা দিতে। কম টাকা নয় তো।"

"আজ কত নিয়ে গেল ?"

"তা বেশী নয়। যেমন রোজ নেয়। পঞ্চাশ টাকা। তবে আজ যেন বড় ব্যস্ত।"

"কদিন ধরেই ব্যস্ত। ভাবতাম আমাদের কর্তার এসব রোগ নেই। কিন্তু এ যেন কি হয়েছে। রাতে ফেরেন ?"

"তা ঠিক ফেরেন। এ পথে থাকলে আবার মালের ফেরে পড়বে না ? সে আবার একটা কথা হলো ? সব কত্তাকেই দেখা আছে !"

আমার কাজ বেড়ে গেল।

চটপট করে বুদ্ধি মাথায় খেলাতে হবে। একদিকে কে এই মেয়েটি—মনে হচ্ছে হুটুর স্ত্রী, কিভাবে এখানে পড়ে রইলো ; তার কি হবে ; এইসব ভাবনা। অপর দিকে টাকা, হেমন্তর কাছে কথা দেওয়া।

ভাববার সময় নেই। ওদিকে হুটু আর বিষ্টু দুজনেই চাকর-বাকরসহ চেঁচামেচি করছে। এদিকে অন্ধকার হলের চেয়ারের তলা দিয়ে হালকা, মৃত একটা গোঙানি।

...যেন মঞ্জুসুন্দরীর আত্মা বিলাপ করছে নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে !...

তখুনি দৌড়লাম বুকিয়ে। ওরা তো দেখেই হৈ চৈ ! "কোথায় গিস্‌লেন মোশায় ? আমাদেরও তো কাজকম্ম আছে।"

হুটু যোগ দেয়, "থিয়েটারে ঘড়ি দেখে কাজ মশায় ; দিনে মেগের মুখে চাইবার অব্‌সর নেই বটে, ঘড়ির মুখ দেখতে হয় হাজার লক্ষ বার ! নিন্‌ নিন্‌ ঝটপট করুন।"

টাকা গুণতে থাকি।

একবার ভাবি চেঁচামেচি করে লোকটাকে একেবারে উলঙ্গ করে দিই। পরক্ষণে ভাবি ও তো উলঙ্গ হয়েই আছে। এ সমাজে হুটু একটা নগ্ন-স্বীকার। ওকে সকলেই এড়াতে চায় প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও ; যেন সবজি-বাগানে কাঁটার বেড়া। তার ওপর হয়তো আমার ওপরে রাগটা মেটাবে গিয়ে ঐ মহিলার ওপর। বলা হয় না।

ওরা টাকা গুণে গেঁথে দিয়ে চলে গেল।

আমি ফিরে গেলাম চৌকিদারের ঘরে।

এদিক ওদিক চেয়ে ওকে চুপি চুপি বলি, "হলের পিছনের দরজাটা খুলে দে ; একখানা গাড়ি নিয়ে আয়।"

চৌকিদার সন্দিগ্ধভাবে তাকাতেই হাতে গুঁজে দিই পাঁচটাকার নোট। বলি, "যা, যা, দেরি করিস নে !"

এখনও তিনি অচৈতন্য। টর্চ জ্বেলে দেখছি।

আমি ইচ্ছে করেই আলো নিবিয়ে দিলাম। সেই রক্তাক্ত অবস্থায় অজানিতকে দেখার বিড়ম্বনা মহিলা না-ই সইলেন। যা দেখেছিলাম তাই যথেষ্ট। মাথা ভরতি সিঁদুর। পরনে লালপাড় মিলের শাড়ি। একটা নীল সেমিজ। হাতে নোয়া, শাঁখা ছাড়া লাল-রুলি দুগাছা। কৃশ কঙ্কালসার চেহারার মধ্যে কেবল পেটটা বড় হয়ে আছে।

জল এনে চোখে দিলাম।

মহিলা শব্দ করলেন, "কে?"

"তোমার ছেলে মা!" আমি ধরা গলায় বলি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে হাড়সার আঙুলগুলো দিয়ে আঁকশির মতো আঁকড়ে ধরলেন আমার হাত। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় হুহু করে কেঁদে উঠলেন।

"চলুন, আপনার জন্যে গাড়ি এনেছি, বাড়ি চলুন।"

অন্ধকার। আমার কাঁধের ওপর দিয়ে একটা হাত দিয়ে অন্য হাতে আমাকে প্রায় জড়িয়ে মহিলাটি চলতে লাগলেন। হালকা-ক্ষীণ শরীর। অনায়াসে আমি তুলে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু অত্যন্ত লজ্জিত হবেন বলে তা করি নি। মরার আগে পর্যন্ত আত্মাভিমান মরে না। ঐটাই জীবনের বড় বালাই।

গাড়িতে চড়ছি।

চৌকিদার অবাক হয়ে দেখছে। আমি তখনও গাড়িতে চড়ি নি। ওর পাশে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, "কারুকে এ খবর বলবি নে। বড় ঘরের কেলেঙ্কারি চেপে রাখা এক রকম পুণ্য রে। চেপে যাস্।"

চৌকিদার সেলাম করে। তার হাতের চাবির গোছা বেজে ওঠে।

গাড়ি ছেড়ে দিলো।

মনের চাকা চললো দ্রুত গতিতে।

সামনের সীটগুলোর মাঝেকার ফাঁকা জায়গায় জীর্ণা মহিলাটি পড়ে ছিলেন আসন্ন জীবন আর আসন্ন মৃত্যু দুটিকেই পাঁজরার মধ্যে ভরে। আর তাঁর ভর্তা, তাঁর পুরুষ; তাঁকে অনায়াসে পরিত্যাগ করে গেছে চরম লাঞ্ছনা করে। এ ধরনের মানসিক অচৈতন্যতা কি করে মানুষই আশ্রয় করে। সেও ঐ মঞ্চ! এত আবেগ, এত রস, এত ভাবপ্রবণ চিত্তচাঞ্চল্য, এত কাঞ্চন, বিলাস, কামিনী, ব্যভিচার যে এর ধূলোয়, বাতাসে, পরিবেশে নিষ্প্রাণ অসাড়, জড় অচৈতন্যতা। একেবারে সাদা ক্যানভাস না হলে চিত্র ভাল ফোটে না। একেবারে নির্মম না হলে মর্মবাণী মুকুরিত হয় না।···

আরো ভাবি ···· আরো ভাবি।

কি করে পারলো মুটু! কি করে পারলো!

এই কঙ্কাল, এই মৃত্যুমুখিনীকে প্রেতের মতো ছেড়ে গেল; এতটা অমানুষ।...

বাড়ি এসে গেল।

নামতে পারেন নি তিনি।

আমি কোলে করে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। বড় মেয়েটি বছর পনেরোর। ছেঁড়া একটা ফ্রক পরে ঠক ঠক করে কাঁপছে। শীতে নয়, ভয়ে। বাকী সবাই চার-পাঁচটা হবে, মেঝে-সতরঞ্চির ওপর ঘুমিয়ে আছে। কেবল বছর দশের ছেলেটি তার ভূগোলের বই থেকে চোখ তুলে চাইলো।

আমি ইসারা করে বলি, চেঁচামেচি করো না। কারুকে ডেকো না, আমি আমার বৌদিকে নিয়ে আসছি। দেখবো যদি ডাক্তার পাই।

সাহস করে মেয়েটি বলে, "আপনি কে?"

আমি হেসে বলি, "তোমার মামা! বড় মামা!"

বেরিয়ে যাই।

৮

সেই গাড়ি করেই চলে এসেছি চিন্ময়ীর কাছে।

টাকার থলিটা হাতে দিতেই চিন্ময়ী বলে, "গুণতে হবে, না এমনি রেখে দেবো।"

"এমনি রেখে দাও, একটু তাড়াতাড়ি করো। আমার সঙ্গে এখুনি বেরুতে হবে।"

ঘাবড়ে যায় চিনি। "এখন? কেন? কোথায়? উনি কোথায়? ভাল আছেন তো? তোমার মুখ অমন সাদা হয়ে গেছে কেন? কি হলো সোম?"

"এতগুলো প্রশ্ন করার সময় তোমার থাকলেও জবাব দেবার সময় নেই আমার। হেমুদা ভাল আছেন, খুবই ভাল আছেন। ভাল নেই শুধু আমি।— চলো, চলো, দেরি নয়। দু-দুটো প্রাণ নিয়ে গেল।"

চিন্ময়ী হঠাৎ আমার মুখে চেয়ে হাত দুখানা হাতে নিয়ে বলে, "কি হলো সোম? তোমাকেও নেশায় ধরলো নাকি? নতুন নেশা?"

আমি বলি, "হ্যাঁ, নেশাই বটে। চলো, গাড়ি দাঁড়িয়ে। হ্যাঁ, নতুন নেশা। চলো, চলো।"

তাড়াতাড়ি নেমে এল চিন্ময়ী।

গাড়ির মধ্যে কথা হচ্ছিলো। ভাবলাম, আগে চিনিকে পৌঁছে দিয়ে পরে ডাক্তারের খোঁজে যাবো। ভয় হচ্ছিলো, অত্যন্ত অপমানে আর শোকে মহিলাটি আবার অন্য কোনো কিছু করে না বসেন।

চিনির পাশাপাশি বসেছি বটে; কিন্তু গায়ে লেগে আছে ন্টুর স্ত্রীর কঙ্কাল-ঢাকা চামড়ার রোগ-স্তব্ধ স্পর্শ।

আমার বিহ্বল চেহারা দেখে চিন্ময়ী অবাক হয়ে যায়। বলে, "কি ব্যাপার বলো-না।"

"আঃ জল খেয়ে এলাম না।" কী তেষ্টাই পেয়েছে!

"গাড়ি থামিয়ে জল খেয়ে নাও না! ঘাবড়ে গেছে চিন্ময়ী।"

"নাঃ সময় নেই, সময় নেই।" খানিক থেমে নিজের মনেই প্রায় বলতে থাকি। "হেমুদা বলে রঙ্গমঞ্চ নয়, ছিন্নমস্তার মুণ্ড। অনবরত পান করছে মানুষের প্রাণ-মান-বিত্ত। ঠিক বলে। ও এক রণরঙ্গিণীর সর্বনাশা মূর্তি।"

"কেন? এত বড় ধাক্কা কি খেলে? কেন এসব কথা আজ তোমার মুখে?"

"যা ভাবছো তা নয়। হেমুদার কোনো কথা নয়।"

"নয় বুঝি?" একটু হাসে চিনি। তারপর আরও কাছে এসে বলে, "নয়ই বা কেন তা? কেন লুকোও? ভাবো, আমি জানি না? ফটু বলেছে ঠাকুরপোকে। ঠাকুরপো বলেছে আমায়। ঠাকুরপো লোক লাগিয়ে বাড়ির ঠিকানা জেনেছে, মেয়েমানুষটাকে পর্যন্ত চিনে এসেছে। বাড়িতে ঢুকতে গিয়েছিল। দরওয়ান ঢুকতে দেয় নি।"

আমি বিস্মিত হয়ে বলি, "তুমি বিশ্বাস করো?"

চিন্ময়ী ফিরে সেই প্রশ্নই আমায় করে, "তুমি বিশ্বাস করো?"

আমি হঠাৎ কঠোর স্বরে বলে ফেলি, "আমি করি না। তুমিও করতে পারবে না। যদি তুমি আর আমি বিশ্বাস না করি, হেমুদা দাঁড়াবে কোথায়?"

চিন্ময়ী বলে, "পথে। পথই ছিল ভাল। সেখানে শান্তি ছিল।"

"এখানেও শান্তি আছে। যদিও আমি বিশ্বাস করি কোথাও যায় সত্যি। এও বিশ্বাস করি যে ও টাকা দেয় সেখানে। কিন্তু বিশ্বাস করি না যে ও তোমাকে বঞ্চনা করে।"

"কেন করো না?"

"কেন করি না জানি না। করি না। হয়তো তোমার বুকের সাহস দেখেই করি না।"

"সে বুকটাও কেঁপে গেছে ভাই।"

"কেন?"

"এত শুনেছি, এতবার লক্ষ্য করেছি। আমাকে যে একটা কিছু লুকিয়ে রাখেন এটা আমি বুঝি।"

"ও বুক যদি টলে থাকে, হেমুদার সব কিছু টলে যাবে। তোমার স্নেহই হেমুদার লক্ষ্মী। আমি এটা বেশ জানি। বুদ্ধিমান লোক হয়তো আমায় পাগল বলবে; কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা ভালবাসতে পারে না। ওটার জন্য একটু অন্ধ হওয়া দরকার।"

"তাই যদি, তবে তোমায় আজ এত উতলা দেখছি কেন?"

তখন আমি বললাম নুটবিহারীর স্ত্রীর কথা। যতটা জানতাম।

জল এসে গিয়েছিল চিন্ময়ীর চোখে। "পারলো লোকটা অমন রুগ্ণা স্ত্রীকে অমন করে মেরে তারপর অন্ধকার হলে ফেলে চলে যেতে? সেখানে চলেছো এখন? কিন্তু ডাক্তার দরকার যে।"

"তোমাকে আগে পৌঁছে ডাক্তার ডাকতে যাবো। কিন্তু—"আগেই যদি কিছু হয়ে যায়!"

"আর কি হবে?"

চুপ করে থাকি ভয়ে কথা বার হয় না মুখ দিয়ে।

"কি, চুপ করে রইলে যে? আর কি হতে পারে?"

"হতে অনেক কিছু পারে। জ্ঞান তো লোপ হয় নি। অপমানে, দুঃখে, অভিমানে, হতাশায়—কি না করে মানুষ!"

হঠাৎ বুঝতে পারে চিন্ময়ী। বলে, "না-না ছেলেমেয়ে আছে। মা কখনো তাদের ফেলে যাবে? তা যাবে না।"

"তোমার কথাই সত্যি হোক্।"

একটু চুপ করে রইলো চিন্ময়ী। তারপর বললো, "এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি। পুরো মাসের মেয়েমানুষ। ঐ রুগ্ন শরীর। এত বড় পশুর মতো ব্যবহার। কেউ তো নেই ওর বাড়ি। যদি কিছু একটা করে বসে। আমায় নিয়ে এসে ভালই করেছিস্।"

"নিয়ে তো এলাম। আবার ভাবছি হেমুদা এসে কি বলবে?"

"কি আবার বলবে? তোর সঙ্গে যাচ্ছি কি বলবে? শ্বশুরকে বলে এসেছি। এখন তাড়াতাড়ি গিয়ে সব ভাল দেখতে পেলে হয়। যদি বিপদ হয়, আপসোসের কূলকিনারা থাকবে না।"

কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গিয়েছিল।

আমরা বাড়ি ঢুকে দেখি একটা ঘরে ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে। অন্য কোনো ঘরে কেউ নেই। রান্নাঘর বন্ধ। ধাক্কা দিতে সেটা ভেতর দিয়ে খুলে গেল। দেখি, ঘরের মধ্যে হাটু কোলে করে বসে আছেন ন্টুবাবুর স্ত্রী। মুখে কাপড় গোঁজা। যন্ত্রণায় চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

সামনের শিশিটা তুলে দেখি গায়ে লেখা—কার্বলিক এ্যাসিড্।

আমি বললাম, "এ কী করেছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

হাসপাতালে জ্ঞান হতেই পুলিস জবানবন্দি নিল। সতী মেয়ে, বাংলার সমাজের পাটাতন যাদের হাড় দিয়ে তৈরী, ভারতবর্ষের চরিত্রের অক্ষয়বট যাদের চোখের জলে চিরঞ্জীব, সেই চিরকালের সতী মেয়ে জবানবন্দি দিল অনেকদিন ধরে কলিকের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে নিজে এমনি করেছে। অনুরোধ করে গেল যেন মৃত্যুর পর তাকে চেরা-ফোড়া না করা হয়।

কার্বলিক এ্যাসিডে মৃত্যু, পলে পলে তিলে তিলে যন্ত্রণার খোয়াভরা পথে

ঠোকর খেতে খেতে মৃত্যু। সে মৃত্যুও দেখলাম। শেষ অবধি হেমন্ত নিজেও এসেছিল।

হেমন্তই খোঁজ নিয়ে হুটবিহারীকে আনতে গিয়েছিল। কিন্তু তখন সে এত নেশায় আচ্ছন্ন আর এমন বীভৎস তার অবস্থিতি যে, একরকম ঘৃণায়ই হেমন্ত তখন তাকে আনে নি।

কিন্তু শেষ অবধি সকালবেলায় তাকে আনতেই হলো। এমন বরফ দিয়ে গড়া পাকও ওই হুটবিহারী যে, ও অম্লান বদনে আমাদেরই বোঝাতে চাইলো যে কলিক বেদনার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই ওর স্ত্রীর মৃত্যু।

না আমি, না চিনি বলতে পারলাম যে সেই জনহীন, আলোহীন রঙ্গমঞ্চের একটা অবিশ্রুত অন্যায়ের খানিকটা জানা গেছে।

শুধু বললাম, "কলিক কি না পোস্টমর্টেম করলে জানা যেতে পারতো হুটুবাবু।"

চমকে হুটু বলে, "ডাক্তার আপনি; দেখলেই পারতেন। কেন আপনার কি আর কিছু সন্দেহ হয়?"

কি যেন হলো চিন্ময়ীর; বললে, "হয়। আপনি তাকে মেরেছেন। আমি তার কাছে শেষ সময়ে একা ছিলাম। আমায় সে বলেছে, তার আবার পেটে বাচ্চা এসেছে শোনার পর আপনি তাকে লাঞ্ছনা করতেন; তাকে মারতেন; আপনি শেষবার বাড়ি থেকে চলে এসেছেন ওর মরার তিনদিন আগে। আবার বলে এসেছিলেন যে, ও সন্তান আপনার নয়। বলেন নি?"

হুটবিহারী হেমন্তর দিকে চেয়ে বললো "এসব কি কথা? এসবও সহ্য করতে হবে আমায়, তোমার চাকরি করি বলে? যদি এসব আপনি জানতেন তো পুলিসে বলেন নি কেন? সেই সত্যবাদিনীই বা বলেন নি কেন? যত-সব—।"

একটা ভয়ঙ্কর বিরক্তির ভাব ফুটে ওঠে হুটুর মুখে।

চিন্ময়ী থামে না, বলে যায়, "বলে নি কেন আমি জানি না। আমি হলে বলে যেতাম। ঐসব সতীলক্ষ্মী জন্মায় বলেই আপনাদের মতো নরকের কীটেরা অপর মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করতে সাহস পান।"

এবার হেসে ওঠে হুটু। বাঁকা, চাপা, ধারালো হাসি। ছিলেকাটা হীরের বুকে আলো পড়লে সে আলো চোখে যেমন কেটে কেটে বসে তেমনি হুটুর সে হাসি চোখে, মনে কেটে কেটে বসতে লাগলো। আর তার সামনে চিন্ময়ী যেন এতটুকু হয়ে গেল। অমনি হাসতে হাসতে হুটু বেরিয়ে গেল। বলে গেল, "আপনিও মেয়েমানুষ। ঘরও করেন। কিন্তু বলার দিন যখন আসবে তখন আপনিও কি করবেন জানি না।"

হুটুর পায়ের প্রতিটি শব্দ আমরা দু কান পেতে শুনলাম।

সে শব্দ মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ চিন্ময়ী হেমন্তর কোলের ওপর মাথা উপুড় করে হুহু করে কেঁদে ওঠে, "কেন, কেন এ অপমান করলে তুমি আমায়? তুমি কি বোঝ না আমি তোমার কে?"

হেমন্ত শুধু বললো, "তোমায় যেদিন অপমান করবো সেদিন আমার মাথায় বজ্রপাত হবে। তুমি জোর করো; ঘাবড়ে যেও না।

আমি বাধা দিলাম, "আমিও যে অনেক কিছু শুনেছি।"

হেমন্ত চিনির মাথার চুল নাড়তে নাড়তে বলে, "আমিও শুনি ভাই, আমি কচি খোকা নই। কিন্তু কিছুই যে সত্যি নয়।"

চিন্ময়ী উঠে সোজা হয়ে বসে হেমন্তর চোখে চোখ রাখে।

আমি বলি, "তবে রোজ টাকা নিয়ে গিরিশ পার্কের পেছনের রাস্তায় কোথায় যাও তুমি? উনিশ নম্বর বাড়িতে তোমার কি আছে?"

হেমন্ত সব ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

চোখে তার ঝরেরে আগুনের ফুলকি।

বলে, "শোনো সোমনাথ, শোনো চিন্ময়ী, আমি পেশায় নট, নেচে পয়সা রোজগার করি। অতি নীচ ব্যবসা। অতি নীচ আমি। তবু জাতে আমি তোমার বন্ধু, চিন্ময়ীর স্বামী। শুধু বলছি, এ পথে পা দিও না। আমায় সন্দেহ করে আমার অন্তরায় হয়ো না। বিশ্বাস যদি না করতে পারো, অন্তত আমি চেষ্টা করাবো না তোমাদের বিশ্বাস করাতে।"

"কিন্তু তোমার তা কর্তব্য। আমাদের ভুলও তোমাকেই সংশোধন করে দিতে হবে। আমি শুনেছি।"

"শুনতে তো আমিও পাই। তবু মনে হয় তোমরা আছ ভরসা। বন্ধু আর স্ত্রী দুপাশে ভরসা থাকতে দশের কথা ভেবে সহায়হীন ভাববো কেন নিজেকে?"

"বিশ্বাস আর রহস্য পাশাপাশি থাকে না হেমুদা। সন্দেহ করি না ঠিকই। কিন্তু তোমারই বা এত গোপন কিসে?"

"গোপনটা আমার নয় রে। ওটা অন্যের। আমি আমার সব কিছুই তোদের বলি, বলতে পারি।"

রেগে বলি, "এ তোমার অন্যায়।"

চমকে তাকায় হেমন্ত। "কি অন্যায়?"

কথাটা বলার পর আমিও যেন চমকে যাই। কিন্তু তখন কথা বলা হয়ে গেছে। বলি, "চিনির বুকের মধ্যে এই ধরনের একটা অন্তর্দাহ জ্বালিয়ে রাখা।"

"ওর বুকের দাহ্ আমার বুকে জ্বালা। ওর বেদনা কি আমার বেদনা নয় রে?"

চিন্ময়ী বলে, "দুটো বুকই জ্বলবে, তবু বলবে না এতই গোপন সে? এত গোপন তো তোমার কখনও ছিল না।"

চটে যায় হেমন্ত। "না, না, ছিল না। হয়েছে। তার কি? আমি লম্পট? আমি বেশ্যাসক্ত? এই তো? নাট করে বেড়াই। সে তো নতুন নয় কিছু। সবাই করে। তার কি? বলছি—গোপন আমার নয়, আমার নয়, তবু জেরা, জেরা, জেরা। আমি যেন—।"

হঠাৎ চিন্ময়ীর মুখের দিকে চেয়ে থেমে যায় হেমন্ত।

ভরা গলায় ডাকে, "চিনি!"

চিন্ময়ী হেমন্তর হাতখানা টেনে বুকে নিয়ে তার ওপর মাথা গুঁজে কেঁদে ওঠে, "তুমি, তুমি আমার স্বামী গো, তুমি আমার স্বামী।"

"হ্যা, তোমারই স্বামী। আর কারুর নই।"

"তবু যে ভয়ে মরে যাই। নুটুর বৌ মা হয়ে বিষ খেয়ে মলো। কতখানি আঘাত পেলে যে সন্তান ছেড়ে মা পালিয়ে যায় যদি বুঝতে। আমি বুঝি গো আমি বুঝি।"

"নুটুর ভালবাসার সঙ্গে—।"

দু হাতে হেমন্তর মুখ চেপে বলে চিন্ময়ী, "না! ও কথা বলতে পাবে না তুমি! ও কথা বলতে পাবে না।"

"তবে বলো কেন?"

"ভয় পাই গো। ওর মৃত্যু দেখার পর থেকে বড্ড ভয় পেয়ে গেছি; যা-ই বলো তুমি। সাহস যেন আর আমার নেই।"

হেমন্ত যেন ঘরে থাকতে পারে না। চলে যায়। যাবার আগে আমার দিকে চেয়ে বলে যায়, "শোন্ বলি তোকে; চুলের ঝোঁটা ধরে টেনে এনে এই বুকে পুষেছি যার নাম, প্রেম, মন—চুলের ঝোঁটা ধরে তাকে নামিয়ে দিতে পারি এ শক্তি পেতে গেলে ওরই দোরে হাত পাততে হবে। সে সাধ্য আমার নেই। আমি আর চিন্ময়ী রঙ্গমঞ্চের রঙ্গ আর মঞ্চ। এক নৈলে আর ফাঁকা রে। এর মধ্যে নুটবিহারীর অধ্যায় নেইও হবেও না।"

ও চলে গেল।

চোখের জল মুছে চিন্ময়ী বলে, "আমি তোমায় বলেছিলাম আগেই, অনেক দুঃখে, অনেক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে ওকে আমি পেয়েছিলাম। ও এমন করে আমায় ঠকাতে পারে না। ঠকায়নি ও আমায়।"

হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "কিন্তু"

চিন্ময়ী বললো "কিন্তু কি? তোমার অবিশ্বাস এখনও হচ্ছে? কেন?"

আমি সামলে বলি, "কিছু না।"

চিন্ময়ী বলে, "নাঃ, 'কিছু না' কোনো উত্তরই নয়। তোমার নিশ্চয় সন্দেহ আছে। কেন আছে, আমায় বলো।"

আমি বলি, "যখনই 'কিন্তু' বেরিয়েছে মুখে তখনই আমি জানি অন্যায় করেছি। পুষবো না গ্লানি। দম্পতির মধ্যে বিভেদ আনতে চাই না। তবু বলি চিনি, মনে নেই তোমার যেদিন—।"

আর পারি না। থেমে যাই।

"মনে আছে।"

"কি বলো তো!"

"সেই যেদিন বললো, কোন আর এক নারীর প্রেমে মত্ত ও!"

খানিকটা দুজনাতেই চুপ করে থাকি।

"হ্যাঁ; আমি শুধু লক্ষ্যই করেছিলাম তা নয়—।"

চিন্ময়ী আমায় বলতে না দিয়ে নিজেই বলে, "ও যখন বলছিল ওর গলার শব্দে উথলে উঠেছিল ভালবাসা।...কিন্তু তবু, তবু মনে হয় সোম, ওর-আমার ভালবাসা তো আজের নয়। সেই ছেলেবেলা থেকে আজ অবধি, অব্যাহত, অনাবিল, এক ধারায়। বিয়ের বনে লুঠ করে এনে বিয়ে করেছিল যে দাপটে, সেই দাপটটা আমি কোথায় হারালাম ভাই, কোথায়?"

আমি শক্ত হয়ে ডাকি, "চিনি, চিনি!"

কিন্তু ও তখন বিহ্বল। ভারী বিহ্বল। ও বলে, "আমি কিছুদিন ধরেই যেন ওকে আর পাই না। ওর দৃষ্টিতে যেন আমি নেই। সেই যে আমাদের রোদে-ঘাসে ভালবাসা, সে যেন আর পাই না রে, আমি আর তাকে পাই না; ও যতই বলুক! কে যেন ওকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে।"

আমি আবার ডাকি, "চিনি!"

"না রে, না, আমি পাই না সে ভালবাসা।"

আমি রাগ করে বলি, "কি এসব বলছো তুমি?"

ও বলে, "না, পাই না। ওর ভালবাসা ও আর কাকে যেন দিয়েছে। এ আমার সন্দেহ নয়। এ আমি জানি। মা যেমন ছেলের খিদে জানে, স্ত্রী জানে স্বামীর ভালবাসা। যে জানে না সে স্ত্রী নয়; সে স্বামী নয়।"

কিন্তু এ কথা হেমন্তকে বলে পরখ করাবে কে? কথা থেমে যায়ই, যেমন সব কথা এক সময়ে থেমে যায়। দিন রাত চলে, যেমন তারা চলতে থাকে সব কথার

পরেও কোনো কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে। হেমন্ত আর চিন্ময়ী দুজনে দুজনকে যে যেমন মেনে নিয়েছে তা বুঝতে পারি। বুঝতে পারি না নিজেকে। তারপর যে ক'দিন কলকাতায় রইলাম খুব লক্ষ্য করে দেখলাম যে হ্যাঁ, প্রতি রাত্রে এক নয় শো'র পর নৈলে নটার কাছাকাছি সময়ে একমুঠো টাকা নিয়ে ও সব তুচ্ছ করে বেরিয়ে যায়। একা যায়, একা ফেরে। ঘড়ি দেখে দেড়ঘণ্টা সময় নেয়।

একটা জিনিস লক্ষ্য করতাম; ন্টু ভারি খুশী ওর এই সময়টা চলে যাওয়ায়। সব কিছু ফেলে ঐ টাকাটা যোগাড় করে ও অপেক্ষা করে থাকতো হেমন্তর। ওর যাবার ব্যবস্থাকে সরলতর সহজতর করার সমস্ত বন্দোবস্ত ও যেন আগ্রহভরে করতো।

আবার চলে যাবার পরক্ষণেই জুত হয়ে বসে সিগারেট ধরিয়ে বলতো, "কত মিঞাকে দেখলাম। হেমন্ত-নট শুকদেব বেটে খেয়েছেন। তাও যদি একটা ডাকসাইটে ডাকাবুকো মাল হতো। চলবি চল্ তেমন একটা নিয়ে। তা নয়। শালার টেস্ট, জানো বিষ্টু, টেস্ট জিনিসটাই হলো গিয়ে বনেদী। ওসব কি যাত্তার-দলের ছোঁড়াদের পিত্তিতে জন্মায়?"

আমার মনে হতো থাবড়ে দিই ন্টুকে। ওর টুঁটি কামড়ে ধরি।

আমি বলি, "আপনার কিন্তু টেস্ট জবর। মনে হয়, মঞ্চের ধুলো হয়েই জন্ম-জন্মান্তরে জন্মেছেন।"

এমন হাসলো বিষ্টু যে কাশতে কাশতে হাঁফাতে লাগলো।

হাঁফ নিতে নিতে বলে, "বেড়ে বলেছো ভায়া। মেরে ফেলেছিলে আর কি! ওসব কথা একটু লোটীস দিয়ে বলতে হয়। যে হাফানী আমাদের।"

ন্টু বলে, "আপনার এসব কথা বলার কোনো রাইট নেই মশায়। আপনাকে আমি রেকগ্‌নাইজ্ করি না।"

আমি বলি, "আমার পুণ্যফল!"

বেচারা বিষ্টু আবার হাসে; আবার কাশে। বলে, "শালা ন্টবেহারী! আজ জব্দ হয়েছো মাইরি। ছোকরা তো দিব্যি হে! তরিবত ছেলে যাকে বলে গিয়ে।"

এর মধ্যে দুটি মেয়েমানুষ এসে দাঁড়ালো আফিসে। ন্টু বলে, "কি ব্যাপার? টুসটুসী যে। আবার সঙ্গে ওটা কে? রাইকমল না? নেপেন গাইয়ের মালখানা, নয়? কি বলে?"

একটি মেয়ে বলে, "বড্ড বিপদে পড়েছি। কিছু টাকার দরকার।"

"আরে বিপদে পড়েছো, টাকার দরকার যেমন, তেমনি তো এ রাত্তির কাল। শহর কলকাতা। মারোয়াড়ী পাড়ায় ঘুরে এলে জড়োয়া মিলে যাবে।"

মেয়েটি বলে, "পঞ্চাশটা টাকা আমাকে ধার দেন মুটুবাবু !"

"এঃ ধার ! বল্ তো আগাম দিই।"

বিষ্টু বলে, "তোমরা এখানে আসো কেন এসব বলতে, বল তো ? বাবু হাজার বার বারণ করেন। এ হলো টাট। টাটের মান ইজ্জত রাখতে হয়।"

লজ্জিত হয়ে মেয়েটি বলে, "সব বন্ধ হয়ে গেছে বলেই এসেছি। বড্ড দরকার।"

দ্বিতীয় মেয়েটি বলে, "আর আমরা তো কোনো অসৈরণ কথা বলি নি। সে তো আপনারাই বলছেন।"

আমি বলি, "টাকা হবে না। ও টাকা হেমন্ত আমাকে নিয়ে যেতে বলেছে। আপনারা এখন যান।"

মুটু হেসে বলে, "এদিকে আপনারা, ওদিকে টাকা হবে না। ভদ্র বিনয়ের গলায় দড়ি। হবে টাকা, যদি আগাম নাও।"

বিষ্টু টাকা গুণে ফেলেছে। আমি থলেটায় হাত দিতে যাবো ; ছোঁ মেরে মুটু থলেটা তুলে নেয়।

নিঃশব্দে পাঁচখানা নোট বার করে মেয়েটির হাতে দিয়ে থলেটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলে, "আমিও ম্যানেজার, তুমিও ম্যানেজার। বুঝলে ? তফাত—আমি ম্যানেজার বাইরের, তুমি ম্যানেজার ঘরের। ও কথা আর কারুর জানতে বাকী নেই।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে ঘুষি মেরেছি। সঙ্গে সঙ্গেই ও পড়ে গেছে। নাকটা থেকে রক্ত পড়েছে। ঠোঁটটা কেটে গিয়েছে।

আমি থলেটা নিয়ে আসার আগে ঘৃণাভরে ওর শরীরটা পা দিয়ে সরিয়ে এলাম।

আশ্চর্য ! না মুটু না বিষ্টু—এ নিয়ে কেউ কথা বলে নি আর।

হেমন্ত শুনে বলেছিল, "ও পঞ্চাশ টাকা বিষ্টুকে বলো খরচে লিখে রাখতে। মুটুর মুখে একটা ঘুষির দাম পঞ্চাশ টাকা হওয়া উচিত কি বলো ?"

এর মধ্যে আমার আবার ডাক এসে পড়েছে। আমেদাবাদ যাবো।

যাবার আগে আমি বলি, "হেমুদা, মুটুকে তুমি ছাড়িয়ে দাও। ওকে তোমার পাশে মানায় না।"

হেসে বলে হেমন্ত, "কেন ? বেশ তো আছে।"

"শোনো হেমুদা ! নেপোলিয়নের এক এমনি বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিল তালের়াঁ। নেপোলিয়নের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ভাই ফিলিপ বারবার নেপোলিয়নকে বলেছিল তালের়াঁকে সরাতে। কারণ ফিলিপ জানতো তালের়াঁ নেপোলিয়নের সবচেয়ে বড় শত্রু। নেপোলিয়ন হাসতো আর বলতো, 'তোমাদের মতো শত শত বন্ধুর শ্যেনদৃষ্টি

আর শুভ চিন্তা এড়িয়ে একা তালের্ঁার কূটবুদ্ধি যদি সার্থক হয়, নেপোলিয়ন মরবে।' মরলো তাই নেপোলিয়ন।"

"কত বড় গৌরবের মৃত্যু নেপোলিয়নের।" বললে হেমন্ত।

আমি বলি, "কিন্তু তোমার মৃত্যু আমি চাই না—।"

"অগৌরব চাও ?

"না চাই না।"

"তবে মুটুকে সরাবো কি করে ? সেই যাত্রাদল থেকে ও আমার সাথী। ওকে সরালে আমি ম্যানেজার পাবো কি করে ?"

আমি ভাবতে লাগলাম।

"কি ভাবছিস ?"

"যদি আমি ম্যানেজার হই ?"

"জ্যেঠামশায়ের খড়ম পেটা ভুলি নি ভাই। তোর মতো কৃতবিদ্য ছেলের পক্ষে রঙ্গশ্রীর ম্যানেজারি ? লোকে কি বলবে ?"

আমি বললাম "ভেবে দেখো। আমি মুটুকে তাড়ানোর জন্য সব রাজী।"

হাসতে থাকলো হেমন্ত।

কিন্তু শেষ অবধি মুটবিহারী গেল না। রইলো।

একবার কলকাতা থেকে বেরিয়ে কাজে ডুবে গেলে কাজই আমাকে টেনে নিয়ে চলে। তখন অন্য সব যেন ম্লান হয়ে যায়।

ম্লান হয় না চিনি, হেমন্ত।

তবু যেন কাজের তরঙ্গে, তরঙ্গের পর তরঙ্গে কোথায় তলিয়ে যাই। যুদ্ধের বাজারে ওষুধপত্রের টানাটানি। দেশময় নকল ওষুধ ছেয়ে গেছে। কাজ বেড়েছে আমার। এ শহর ও শহর করতে করতে বহুকাল পরে ফিরে এলাম কাশীতে। কাশীতে এসেও কাজেই ডুবে গেলাম। অন্য কোনো দিকে নজরই দিতে পারি নি।

অফিসে বসে কাজ করছি সেদিন।

হঠাৎ চিন্ময়ী। গালভরা হাসি।

আমি চমকে যাই, "আরে তুমি! কখন ? চিঠিপত্তর না দিয়ে ? কি ব্যাপার ? খবর ভাল তো ? ব'সো, ব'সো।...এঃ একেবারে অফিসে! এখানে ভাল একখানা চেয়ারও নেই।"

"ভাল চেয়ারে বসতে তো আসি নি। সে লজ্জা পেতে হবে না। এলাম তোমার কাছে।"

"কবে এলে ?"

"দিন চারেক হবে। বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি।"

"তাই নাকি ?···আর কর্তা ?"

"তিনি রঙ্গমঞ্চে।"

"খবর কি রঙ্গমঞ্চের ? ওঃ, অনেক দিন খবরই নিতে পারি নি। এদিকে আমার এমন সব বেয়াড়া-ব্যেদড়া কাজের ভীড় জুটেছে যে কোনো কিছু মনে করতে পাই নি !"

"সেজন্য লজ্জিত হবার কি আছে ভাই ! যা দিনকাল পড়েছে, কেউ কারুর খবর এমনিই রাখতে পারছে না। তোমাকে দেখলাম প্রায় বছর খানেক কেন, ষোলো মাস হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, অনেক দিন। তোমাকে তো খুব ভাল দেখছি না ?"

ম্লান হেসে বলে, "মন্দ কি দেখলে ? তোমার বন্ধুও এসে পড়বেন। দিন পনেরো ছুটিতে আসছে, চেঞ্জে। শরীর খুব খারাপ।"

"কার ? তোমার, না ওর ?"

"একজনের হলেই আরের। তবে চেঞ্জটা ওরই দরকার ছিল।"

"কিন্তু তোমার মুখখানা বাপু্ বদলে গেছে। যেন অন্ধকার। কি হয়েছে বলো না।"

হাসে চিন্ময়ী। "বাড়ি চলো। এখানে কি সব কথা হয় ?"

"হয়, হয়। এখনই তো যাবো না। বলো না কি ব্যাপার ?"

"ব্যাপার কিছু নয়। সূর্য নিবলেও কি আলো থাকে ?"

"সূর্য নিবলো ? সূর্য কি নেবে নাকি ?"

"ঐ হলো ; অস্তে গেছে, পাটে গেছে।"

"কোন্ সূর্য গেল পাটে ?

"যৌবনের সূর্য। কিন্তু ভাই এখানে নয়। বাড়ি এসো। মেয়েরা বাড়ি আছে। আমি এখন যাই।"

"কোথায় বাড়ি ?

"শিবালায় বাড়ি ভাড়া করেছি। বড় রাস্তার ওপর, আউংগবুবীর সড়কে নেমে মোড়ে বড় বাড়িখানা।"

"হ্যাঁ বুঝেছি। সন্ধ্যের আগে যাবো।"

প্রতিশ্রুতি দিলাম।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গেলাম।

যা শুনলাম তাতে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। অল ওয়াজ নট্ ওয়েল ইন্ ডেনমার্ক।

ভেতরের খবর বিশেষ কিছু জানেই না চিন্ময়ী, তার কি আর বলবে। শুধু জানলাম হেমন্তর শরীর খুব খারাপ। মনও। বসন্ত ধীরে ধীরে প্রেসের পাট সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে এনেছে। তা থেকে এক পয়সাও দেয় না হেমন্তকে বা সংসারে। হেমন্তর বাবা মারা গেছেন এর মধ্যে। সেই শ্রাদ্ধশান্তিতেও বসন্ত কোনো খরচ বহন করে নি। বসন্তর স্ত্রীই নিজে থেকে এই নিয়ে বসন্তকে কিছু বলবার চেষ্টা করেছিল। ফলে বসন্ত অভিযোগ আনে যে তার স্ত্রীকে ফুসলে বিগড়ে দেওয়া হচ্ছে। এমন অভিযোগের ফলস্বরূপ বসন্ত চাইলো স্ত্রীকে পৃথক করে নিয়ে যায়। এ যে কখনও হবে চিন্ময়ী ভাবতে পারে নি। দেওরকে দিয়েই সে জা পেয়েছিল। তবু দেওরের চেয়েও জা ছিল তার বেশী আদরের। সেই জা-কে পৃথক করে রাখার ব্যথা চিন্ময়ীর খুব লেগেছিল। তার ঠাকুরপো যে এমন কৃতঘ্নতা করতে পারবে চিন্ময়ী তা কখনও কল্পনাও করতে পারে নি।

"শুধু তাই নয়। অনেক দিন তো তুমি যাও নি কলকাতায়। তোমার দাদা অনেক আশা করে বাড়ি কেনেন। পুরানো আমলের কোন রাজবাড়ি। ভেবেছিলেন ঠাকুরপোর এত আলাদা থাকার সখ। অত বড় বাড়ির মধ্যে একটা অংশে দিব্যি আলাদা সংসার করে ওরা থাকতে পারবে। বাড়িটার ওপর খরচ-খরচা করে সেটাকে বেশ চমৎকার পরিপাটি করে সাজিয়েছিলেন।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি। নতুন বই করতে গেলেন। রাজীববাবু সে কিছুতেই নামলেন না। বইটা মার খেয়ে গেল। তার ওপর গুরুদেব এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বেশ মোটা টাকা চাইলেন। সব মিলিয়ে ঋণে জড়িয়ে পড়লেন। সে কি চিন্তা! নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। বলতেন, 'দারিদ্র্য সয়েছে, অনাহার, অপমান, অত্যাচার সব সহ্য করেছি এই মঞ্চের নেশায়। কিন্তু ঋণ একেবারে সয় না। টাকা ধার নিয়ে তারপর সেটা শোধ করতে না পারার একটা বিষম জ্বালা।' সেই জ্বালায় জ্বলে জ্বলে চেহারা যা হলো। আমি বললাম বাড়ি বেচে দিতে।

"সেই বাড়ি বেচা নিয়েও এক কীর্তি। ষুটবিহারী আর বসন্ত দুজনায় মিলে খদ্দের আনে আর ক্রমশ দাম কমতে থাকে। আমি একদিন বলতে গেলাম যে আমার সন্দেহ হয়। তোমাকে ডেকে আনানোর কথা বললাম। এত রাগ করলেন আমার ওপর ; বললেন আমি নীচ। বসন্ত যদি টাকা নেয়ও ক্ষতি কি ? এ পর্যন্ত বললেন যে আমার মনে এইসব বিষ ছিল বলেই বসন্ত বাড়িতে থাকতে পারে নি। আমি কাঁদতে অবধি পারি নি। সত্যিই তো আমি নীচ। অমন সদাশিবের ঘরণী হতে হলে মনটাকেও শিবানীর মন করতে হয়। নৈলেই বিপদ।"

বাধা দিলাম। "বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"ঋণ শোধ হয়েছে?"

"সেইটাই তো হয় নি।"

চমকে বলি, "কেন?"

"কেন?" বসন্ত নতুন প্রেস কিনলো। ছোট বৌয়ের গহনা হলো। গুরুদেবের তীর্থ দরশন হলো। নতুন বই হবে, হুটু কিছু নিল। রাজীবের মেয়ের বিয়ে বলে সেখানে কিছু দিলো। আরো একটা মোটা টাকায় ছোট একটা বাড়ি কিনে সেই মেয়েমানুষটাকে দিয়েছে। "সর্বনাশের বাকী আর কিছু নেই। ডুববো। ডোবার আগে একবার কাশী এলাম জুড়ুতে। বড় জ্বালা, বড় কষ্ট ভাই।"

"হেমুদা আছে কেমন?"

"কেমন আবার! সর্বদাই যেমন। খানিক ধার নেমে গেছে বলে ফুর্তি। হুটু বলেছে এ বইটা নামলেই বাকী ধার শোধ হয়ে যাবে। আর দান-ধ্যান তেমনি চলছে। মাঝে মাঝে বোঝায় ঐ স্বরূপা আর মহেশ দত্ত।"

"নট মহেশ দত্ত?"

"হ্যাঁ, তিনিই।"

"সে লোকটি তো ভাল শুনতে পাই।"

"থিয়েটারে অত ভাল লোক হয় না। বারীন চক্রবর্তী ছিলেন সেকালে; নেপাল মাস্টার, আর এই মহেশ দত্ত। সবাই ডাকে সন্ন্যাসীঠাকুর। কবে কি বইয়ে কোনো সন্ন্যাসীর পার্ট নিয়েছিলেন, সেই থেকে ঐ নাম। আর মানিয়েওছে ভাল। ছিলেন তো মস্তবড় প্রফেসর। তারপর স্বদেশীর হাঙ্গামার মধ্যে পড়ে অনুশীলন না কিসে হাবুডুবু খেয়ে খুব দুর্গতির মধ্যে এসে মঞ্চে যোগদান করেন। বলতে চাইছি যে এমনই তাঁর শিক্ষাদীক্ষা যে মঞ্চে এসেও বদলান নি। উনিই একমাত্র সত্যিকার উপদেশ দেন। কিন্তু শুনবে কে?"

চিন্ময়ী অভিমান করে বসে থাকে। মনে মনে ভাবে হেমুদা আসবে। এসে নিয়ে যাবে। কিন্তু এল না হেমুদা। মাস কেটে গেল। দু মাস কেটে গেল। এল টাকা, এল না হেমুদা।

আমি নিশ্চিত ঠিক করে ফেললাম কাজকর্ম সত্ত্বেও যাবো কলকাতা। চিনি কোনো দিনই হেমুদাকে ফেলে থাকতে পারে না। হেমুদা তো একেবারেই পারে না। অথচ ওরা সেই একা থাকবে। অসহ্য বোধ হতে লাগলো।

আমি যাবো রাজস্থান আর কাথিয়াওয়াড়। ট্যুরের হলে বন্ধ রাখতাম। কিন্তু একটা মস্ত গ্যাঙ্গ ধরা পড়েছে নকলী ওষুধের ব্যাপারে। কোম্পানী থেকে কেস্ রুজু করবে। সাক্ষী-সাবুদ, আর মুসাবিদা করা দরকার। ম্যানেজার অস্টিন সাহেব স্বয়ং যাবেন। আমাকে যেতে হবে।

যাক্, কটা দিনই বা। মাসখানেক বড় জোর। চলে গেলাম ট্যুরে। কিন্তু সেই এক মাস ফুরুতে ফুরুতে কেটে গেল আড়াই মাস। চিনিকে এর মধ্যে দুখানা চিঠি দিয়েও জবাব পাই নি।

ভাবি চিন্ময়ী কি তবে কলকাতায় গেল ?

কাশী ফিরে খবর শুনে অবাক হয়ে যাই। সর্বনাশ একা আসে না।

দুই মেয়ে নিয়ে রোজকার মত গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিল চিন্ময়ী। হঠাৎ বড় মেয়েটি জলে ডুবে যায়। গঙ্গার ঘাট থেকে শব আর বাড়ি আনা হয় নি। সোজা শ্মশান। জলজ্যান্ত মেয়েটাকে পুড়িয়ে তিন দিনের মুখে চিন্ময়ী চলে গেছে কলকাতায়। হেমুদাই এসে নিয়ে গেছেন।

আমি কলকাতায় দৌড়ুলাম প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

কলকাতায় এসে মেয়ের শোক করার সময় পায় নি চিন্ময়ী। স্টেজ থেকে নামতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গেছে হেমন্ত। লম্বা ভারী শরীর। পাঁজরের একটা হাড় ভেঙে গেছে। হেমন্ত শয্যাগত।

আর দুদিন পরে নতুন নাটক 'রাজস্থান' নামবে। তার জন্য তোড়জোড় চলেছে। অনবরত শয্যার পাশে লোকের ভীড়।

হুটবিহারী এসেছে।

"কি হলো? রাজী হলেন রাজীবদা?"

"না! চামার তো। ও রাজী হবে? তোমার মতো মুখ্যু কটা আছে সংসারে যে নিজের পরনের কাপড় খুলে দান করবে।"

কথা চালাতে জানে হুটু। এখানে চামার আর দাতাকর্ণ বলছে ভাগাভাগি করে। অন্যত্র এই শব্দগুলোই অন্য ভাগে ভাগ করে বলবে। অদ্ভুত ওর ক্ষমতা। চোখের চামড়া নেই, মনের বালাই নেই।

"কি হবে তবে হুটুদা?"

শুনলাম ঘটনাটা ধীরে ধীরে। নাটক নামছে আর দুদিন পরে। রাজীবের হঠাৎ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে দু হাজার টাকার। অথচ এখন দুশো টাকাও হাতে নেই। ইত্যবসরে হুণ্ডি লিখিয়ে নেবে হুটবিহারী।

আমি ভাবি এতে হুটবিহারীর কি লাভ! কোনও ক্রমেই তো ও মালিক হতে পাবে না। কিন্তু মঞ্চেশ্বরীর মহাপীঠে হুটবিহারীর মতো পিশাচ বরাবরই দু-একটা ঘোরে। ওরাই অঙ্গনকে শ্মশান করে।

হুণ্ডি লেখানো শেষ। এইবারে ও যাবে। সেই মুখে আমি বলি, "টাকা আমি দেবো। হুণ্ডির দরকার নেই। আপনি তিনটের সময় আসবেন। আমি টাকা দিয়ে দেবো।" লেখা হুণ্ডি ছেঁড়া হলো। হেমন্ত তোয়ালেটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে মুখে ঢাকা দিলো। বেরিয়ে গেল হুটু।

ঘরে হেমন্ত আর আমি। ঘড়ি টিকটিক করছে। হাতীবাগানের বাজার থেকে একটা চাপা শব্দ উঠছে। রান্নাঘরে চিংড়িমাছ ভাজা হচ্ছে; তার গন্ধ বেরিয়েছে। দেয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির নীচে-রাখা ধূপকাঠিটা প্রায় নিঃশেষ

হয়ে এসেছে। নীচে একটা হালকা ঝগড়া চলছে পথচারীদের মধ্যে। চিন্ময়ী কোথায় দেখা যাচ্ছে না।

হেমন্তই প্রথমে কথা বললো, "কোথা থেকে তুই টাকা দিবি ?"

আমি বলি, "টাকা নেই তো !"

"তবে ? তবে স্টুকে তাড়ালি কেন ? ও যত মন্দই হোক ওই একমাত্র আছে যে টাকা যোগাড় করতে পারবে।"

"কিন্তু ও তোমার সর্বনাশ আনছে ডেকে।"

"তা আমি বুঝি। তবু তো ও নইলে আমার মুক্তি নেই।"

"ওর লাভ কি এতে ?"

"তা বুঝিস না। নাট্যমঞ্চের দুনিয়াটা তোর জানা নেই যে সোম। এ এক রোরিং এণ্ডীজ্। এখানে সর্বদাই ঝড়ঝাপট। একটু বেসামাল হলেই ভরাডুবি হতেই হবে। আর এই স্রোতের তলায় তলায় হাঙ্গরের পাল। ভরাডুবি হলেই তাদের ভূরিভোজন। তারা মাংস ছিঁড়ে খেতে বসবে। তাই তারা চায়। একটা জাহাজ ডোবে, হাঙ্গর মাংস খায়, আর মঞ্চসুন্দরী ফিকফিক করে হাসে যেন ক্লিওপাত্রা। একজন ছেড়ে অন্যের কোলে যেতে হতভাগিনীর লজ্জাশরম কিছু নেই। কাল যার মালায় সাজ করেছে আজ তাকে দোরগোড়ায় ভিক্ষা করতে দেখলেও ভ্রূ উঁচু করে পাশ ফিরে যায়। সব নটীর সেরা ও। ঐ স্টুবিহারী জানে, আমার কবর যে শাবলে খুঁড়ছে সেই শাবলেই অন্যের মঞ্চ গড়ছে। যে মাটি আমার জন্য গহ্বর পেতে দিলে, সেই মাটিই অপরের আনন্দের স্তূপ হয়ে উঠলো। আমি মরবো, স্টুবিহারী সে মাংস অন্যকে বেচবে। ওরা দালাল। এমনি লেন-দেনই ওদের সার্থকতা।"

যখন ও বলতো এমনি প্রাণ ঢেলে বলতো। এ জীবন কদর্য না সুন্দর ভাববার অবকাশ দিত না। আমি দেখতাম একটা শিল্পীর যথার্থ প্রাণময়তা।

আমি বললাম, "স্টুকে তবু তুমি প্রশ্রয় দাও ?"

"স্টু অনিবার্য প্রয়োজন। নাট্যজগতে শিল্পী যেমন অনিবার্য প্রয়োজন, তেমনি স্টুরাও অনিবার্য। দেহ জীবনের পক্ষে অনিবার্য; রোগও তাই। নিবারণ করার চেষ্টা সত্ত্বেও অনিবার্য।"

"রোগের হকিমি আছে।"

"স্টুরও হকিমি আছে। যেমন মহেশদা—সন্ন্যাসীঠাকুর। স্টু ভয় খায় ভীষণ। কিন্তু কখনও কেউ মহেশদাকে রাগ করতে দেখে নি। মহেশদা যদি টাকা বার করতে পারতেন, স্টু সরতে পারতো। কিন্তু আমার এখন চাই টাকা। টাকা নইলে দাঁড়িয়ে ডুববো। তুই বললি টাকা নেই। কি হবে ?"

আমি উদাসীন হয়ে বলি, "দেখি কি হয়। আমি তো রাজীববাবুর সঙ্গে দেখা করবো ভাবছি।"

চাকর এসে খবর দিলো মহেশবাবু এসেছেন।

আমি বললাম, "ওপরে ডেকে নিয়ে আয়।"

সে অপেক্ষা করতে হয় নি। ভারী লাঠির শব্দ; আর সিঁড়ির ওপর জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা এল "কই গো মা-লক্ষ্মী কোথায়। আমার নতুন গিন্নীটির খবর কি ?"

চিন্ময়ী বারান্দায় এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললো, "খুকী কলেজে গেছে কাকাবাবু।"

"থাক্ থাক্ মা। শ্রীমানের খবর কি ?" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন। আমি চেয়ারখানা টেনে শয্যার পাশে পেতে দিলাম। "কো-অপারেটিভ্ ব্যবস্থায় রঙ্গমঞ্চ চালাবার বড়ই ইচ্ছে। তারই প্রথম পাঠ শুরু হলো। আমরা হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটবো, আর তুমি হাড় ভেঙে পড়ে থাকবে। মন্দ নয়।" হাসতে হাসিতে ঘর ভরে দিলেন।

এক-এক জন ব্যক্তি থাকেন যাঁরা একা নন, বহু। একা এলে ঘর, বাড়ি, মন ভরে যায়, একা চলে গেলেও সব ফাঁকা বোধ হয়।

শুনলেন রাজীবের কথা।

"কিন্তু সমস্যা তো গুরুতর। ওকে গোঁফ-দাড়ি না দিয়ে শা-জাহানের পার্ট করতে বলো করবে, ট্রাউজার পরে শ্রীরামচন্দ্রের পার্ট করবে, কিন্তু টাকা না দিলে ওর শরীরে কষ্ট, বার্ধক্য, বৈরাগ্য অবধির টানে ওকে একেবারে বিকল করে ফেলবে বাপু।"

"উঃ একটু মায়া-দয়া নেই কাকাবাবু! এই যে হাড় ভেঙে পড়ে আছি একদিন—।"

"সেটা তোমার গুরুর আশীর্বাদ। হাড়ের খবর নিতে এসে বিল পাঠাতো ভিজিটের। উপস্থিত তো ওকে উৎকৃষ্ট উপাধিতে ভূষিত করলেও ওর দু হাজার নেবার গোঁ ও ছাড়বে না।"

আমি বলি, "কি কর্তব্য ?"

শুনছিল চিন্ময়ী। হঠাৎ নামিয়ে দিয়ে গেল ভেলভেট-মোড়া একটা বাক্স।

সব ভুলে হেমদা ডেকে উঠলো, "চিনি!"

চিন্ময়ী এসে বিছানার পাশে বসলো। হেমন্তর হাত নিজের হাতে টেনে নিল।

"তোমারই দেওয়া ব্রুচ আর নেকলেস। আমাকে খুশী করার জন্যে দিয়েছিলে। আমার সে খুশী তুমি নষ্ট করো না।"

মহেশদা গলাটা ঝেড়ে এক টিপ্ নস্যি নিলেন। বাইরের দিকে চোখ মেলে চেয়ে রইলেন। আমি নির্বাক।

হেমন্ত বলে, "আমি তোমার খুশীতে খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু আজকের এ খুশীতে তো খুশী হতে পারছি না।"

"পারবে, যদি বুঝতে চাও যে না দিতে পারলে গয়না আমার জঞ্জাল বলে মনে হবে ; তোমায় মনে হবে পর।"

চাকরটা আবার এসে দাঁড়ালো।

মহেশদা বললেন "কি খবর কঞ্চুকী ? দ্বারে কে সমাগত ?"

"একজন বাবু। ওপরে আসতে চান। নাম বললেন বীরেশ্বর পাঠক···।"

লাফিয়ে উঠলেন মহেশদা ! "এসেছে, বীরু এসেছে ! জয় মা ! চাইছিলাম তাকেই।" প্রায় ছুটে বৃদ্ধ নামতে লাগলেন, "বীরু ও বীরু, এসো, ওপরে এসো।" কী এক আকুলতা।

আমি চেয়ে বলি, "ব্যাপার কি হেমন্ত ?

হেমন্ত বলে, "ও মহেশদা। ওঁর কল্জের মতো বড় কল্জে কোথায় ? কিন্তু ব্যাপার কি আমিও বুঝতে পারছি না।"

আবাহনের বহর দেখে বীরু তো স্তম্ভিত।

"এসো ভাই ব'সো। এই চেয়ারখানায় ব'সো। বড্ড ডাকছিলাম তোমায় ভাই। মা পাঠিয়ে দিলেন।"

ক্ষীণকণ্ঠে বীরু বললো, "কেন সন্ন্যাসীঠাকুর ?"

"শোনো বীরু। আমাদের নতুন বই নামছে। তাতে রাজীব নামছিল। রাজীব হঠাৎ টাকা চেয়েছে এত যে বৌমা গহনা এনে, এই দেখো, নামিয়ে রেখেছেন। এমন অসময়ে তুমি যদি একটু সাহায্য করো।"

"টাকা ?" বীরু চমকে ওঠে "টাকা আমি কোথায় পাব সন্ন্যাসীঠাকুর ?"

"আছে ভাই। তুমি যতই সাধু সেজে অন্যকে সন্ন্যাসী বলো না কেন তোমার কাছে যে আছে তা আমি তো জানি। হেমন্তকে সাহায্য করো।"

"থাকলে হেমন্তকে আমি রক্ত দিতাম······।"

"তবু টাকা দিতাম না", মাঝপথে কথায় বাধা দিয়ে মহেশদা বলেন।

"ছি-ছি কি বলছেন সন্ন্যাসীঠাকুর ? আমি নেশাখোর, লম্পট, কিন্তু রাজীব নই। আমার জন্যে হেমন্ত যা করেছে······।" আরো বলতো বীরু।

"বক্তৃতা ছাড়ো। কিছু করবে কি না বলো", কাটা কাটা কথা বলেন মহেশদা।

"কি করতে পারি ?" বিব্রত হয়ে বলে বীরু।

হেমন্ত বলে, "সত্যিই তো, ওকে এত বিরক্ত করছেন কেন ? ও কি করবে।"

মহেশদা বীরুর কানে কানে কি যেন বললেন। বীরু চমকে উঠে বলে, "দেবে ? যদি এই সেবা করতে পারি আমি আজ এখনই প্রস্তুত।"

মহেশদা বলেন, "আর প্রেস ? প্রেস কিন্তু কুকথায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবে। খেউড় আর আফ্-আখড়াইয়ের ঝাঁঝে বীরু পাঠকের পা ঠকঠক করে কাঁপতে থাকবে।"

এতক্ষণে বীরু হাসলো। "কিছু হবে না। রোগ আর অত্যাচার আমার দেহ নিয়েছে। আর শিল্পকে নিতে পারে নি। এ পার্ট আমিই করবো।"

মহেশদা বললেন, "কিন্তু তার আগে রাজীবকে জানাতে হবে কি ?" প্রশ্ন করেন হেমন্তকে।

হেমন্ত বললো, "পারবো না রাজীবকে ছাড়তে। তার জন্য ভরাডুবি। তবু তাকে ছাড়তে পারবো না। অন্য কোথাও গেলে এ মঞ্চ খানখান হয়ে ভেঙে পড়বে।"

মহেশদা লাঠি ঠুকে বললেন, "ঐ তো তোমার দোষ। মাঝারি সব ভাল শিল্পীদের খুশী করে সমবায়-ভিত্তিতে নাটক করো। জনগণ দেখবে সেই নাটকের প্রশংসায় ধন্য ধন্য করবে। জনমত শিল্পী গড়ে। শিল্পী জনমত গড়ে দেবে এমন-তরো জন নেই বাংলায়, শিল্পী তো নেই-ই। আমাদের মধ্যে একজন এমন শিল্পী নেই যে খবরের কাগজের তোয়াক্কা করেন না।"

আমি সাহস পাই, বলি, "ভয় পেয়ো না তুমি। বীরুকে চান্স দাও।"

মুটবিহারী এসে এ খবর শুনে খুব খুশীভাব দেখালে।

কিন্তু পরদিনের কাগজে বেরিয়ে গেল রঙ্গশ্রীর সঙ্গে রাজীবের বিচ্ছেদের সূচনা। কাগজ লিখেছে—"এতদিন রঙ্গশ্রী এই ব্যবস্থা কেন করে নাই ইহাই আশ্চর্যের কথা। যে-মঞ্চে সত্বাধিকারী পড়িয়া-পাওয়া চৌদ্দ আনার মালিক সে-মঞ্চে হস্তীকে সরাইয়া গন্ধমূষিক শিল্পী হইবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।"

কিন্তু খবরের কাগজের এ গালাগালের সোরগোল বেশীদিন স্থায়ী হলো না। মোটা স্তম্ভওলা সংবাদপত্র থেকে যা বাদ পড়লো রোগা কাগজগুলোতে সেইসব নিয়েই লেখা চললো। দেখতে দেখতে ছোট ছোট কাগজগুলোয় নানা রকমের প্রশংসার কথা গুণগুণিয়ে উঠলো। গুণগুণিয়ে উঠলো আদি ও অকৃত্রিম পরিচয়ের সাক্ষ্য সেই জনমতের অন্তর। তখন সকলে বলতে আরম্ভ করে বীরু পাঠকের কথা ; বলে সরোজিনীর কথা। রঙ্গশ্রীর নতুন নাটক 'রাজস্থান'-এর প্রয়োগ-সজ্জার মৌলিকতা সকলকে মুগ্ধ করলো।

হুটু-বসন্ত-রাজীব গোষ্ঠীর পাহারাদারি তলিয়ে গেল সুষ্ঠু অভিনয়, রুচিশীল প্রয়োগসজ্জা আর সুচারু ব্যবস্থার প্রবাহে। ওরা বলে, "হেমন্তর এখন একাদশে বৃহস্পতি। যা ধরছে, তাই সোনা।"

কিন্তু তাই কি? হেমন্তর একাদশে কি বৃহস্পতি সত্য-সত্যই?

তা নৈলে হঠাৎ সরোজিনী কেন মারা যাবে। কত কষ্ট স্বীকার করে ঐ সরোজিনীকে জুটিয়েছিল হেমন্ত। সেই সরোজিনী মারা গিয়ে হেমন্ত যেন একেবারে ভেঙে পড়লো।

'প্রাচী-রঙ্গ' নতুন নাট্যমঞ্চ গড়ে উঠছে চিৎপুরের ওপর, পাথুরেঘাটার কাছে। তারা নিয়ে যায় রাজীবকে। রাজীব কারুর চাকর নয়। যে যখন ডাকে, যায়। তার যাওয়া যেন আবির্ভাব। কাজেই তাকে আর কন্‌ট্রাক্‌ট্ করতে হয় না। তার ট্রাক্‌টে সে ট্রাক্‌টর চালায়। পিষে যাক কেউ, মরে যাক কেউ, তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

হুটু কিন্তু ঠিক যায়। মেক্-আপের পাশে বসে বসে সিগারেট টানে। পরনে সেই খাকী প্যাণ্ট আর শার্ট; যেন মিলিটারী য়ুনিফর্ম। যায়; খোঁজ দেয়; খোঁজ নেয়। এ ভাঁড়ের জল ও ভাঁড়ে ঢালে; ও ভাঁড়ের জল এ ভাঁড়ে।

রঙ্গশ্রীতে নাটক জমে না। আসন খালি থাকে।

প্রাচীরঙ্গে তাই নিয়ে ঠাট্টা-তামাশার অন্ত নেই। হুটু রাজীবের সোনার সিগারেট-কেস থেকে সিগারেট নিয়ে পোড়ায়; সিগারেট-কেস হেমন্ত দিয়েছিল। রাজীব ভরা গেলাস হাতে নিয়ে হুটুর কাছ থেকে হেমন্তর নবতম দুর্গতির কথা শুনে অপার আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

নিয়মমতো বেতন না পেয়ে কর্মচারীরাও ইস্তফা দেয়।

বিষ্টু বলে, "যদি অন্তত কিছু কিছুও পেতাম, জানেন সোমনাথ বাবু, এ লোকটাকে ছেড়ে যেতাম না। কিন্তু একেবারে কিছু নেই। যা তবু পাওয়া যায় তাও ওঁর দানধ্যান, সাধুসন্নিসী ফাঁক পড়বে না।"

হেমন্তকে বললে ও হাসে। "ওরে উঠ্‌তি-পড়্‌তি কোন্ ব্যবসায়ে না আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। নতুন নাটক দুখানা নামালেই ব্যস্।"

ঠিক হলো না।

আমি মাস তিনেক পরে আবার কলকাতায় এলাম চিনির তার পেয়ে। চিন্ময়ী তারে কিছু লেখে নি।

কিন্তু সব কথা চিন্ময়ীর গায়ে লেখা। একখানা গহনা নেই গায়ে। হেমন্তর মনের মধ্যে ঝড়-তুফান। চিন্ময়ীর শোক, দুঃখ, অভিমান, অপমান সব যেন হেমন্তকে ছিঁড়ে খায়। "অথচ আমার হাত নেই এর কোনোটা থেকে আমি ওকে মুক্তি দিই।"

"কিন্তু হেমুদা, অন্ততপক্ষে তো তুমি—।"

ধমকে বলে হেমন্ত, "না, সে কথা বলতে পারবে না। ও কথা বলো না। আমি মিটে যাই, মাটি হয়ে যাই। তবু আমি যা পারবো না, কুষ্ঠ হলেও আমার জীবনসাথী।"

চুপ করে যাই। বলার কিছু থাকে না বলে। চিন্ময়ীর তো আসবেই, আমারই গলা ধরে আসে, ক্ষোভে, লজ্জায়, অপমানে।

প্রতিমা, হেমন্তর মেয়ে, চাকরি নিয়েছে স্কুলে। বসন্তরা আসেই না। খোঁজও করে না। হাসিমুখে চিন্ময়ী তোলা ঝি নিয়ে বাড়ির সব কাজ করে। করলে কি হবে, হেমন্ত বাড়ি আসেই না প্রায়। পড়ে থাকে 'রঙ্গশ্রী'তে।

দুর্দশার চরম।

সেদিন শো নেই মনে করে সন্ধ্যার পর ওদের বাড়িতে এলাম। কিন্তু বাড়িতে নেই সে। চল্লাম 'রঙ্গশ্রী'তে।

রাত দশটা বেজে গেছে। আমি 'রঙ্গশ্রী'র সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি। বক্সের পাশ দিয়ে সরু গলিপথ। অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। কিছু দেখা যায় না। কোথায় কাকে ডাকবো আমি ঠিক করতে পারি না।

দিনের আলোয় যে দেশ ঝলমল করে, রাতে শতসহস্রের উজ্জ্বল দীপমাল্যে যার অভিনন্দন হয়, হঠাৎ তাকে একা-একা অন্ধকারে দেখা একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। প্রিয়তম জনকে পাগলাগারদে একা রাতে দেখার মধ্যে যে বিভীষিকা এ যেন তাই। জলে ডুবে গেলে পাঁকের কাছাকাছি যে বিভীষিকা এ যেন তাই। নিজের পায়ের তলায় কাঠের পাটাতন ক্যাঁচক্যাঁচ করে ওঠে। বাতাসের বেগে পার্টিশানের পাতলা কাঠের দরজাগুলোর ফোকলা শব্দ বিকট হাসি হাসে, নীচে দুটো বেড়াল ঝগড়া করছে। অতবড় মহানগরীর মধ্যে দাপাদাপি করে ক্বচিৎ কোনো বাসের হর্ন। আর সব যেন মরে গেছে। একটা কাঠের পার্টিশানের মাঝ দিয়ে একচিড় আলো। ও ধারে কারা সব তুমুল তর্ক জুড়েছে। এ পার্টিশানও আগে ছিল না। ব্যাপার বুঝতে পারি না। ডাকতেও কেমন সংকোচ বোধ হচ্ছিল। একটু শান্ত হয়ে ভাবার পর বেশ বুঝতে পারলাম ওধারটায় একটা ঘর বার করে নিয়েছে হেমন্ত। ওঠবার সিঁড়ি সেই স্টেজের সিঁড়ি। এধার দিয়ে বন্ধ। ধীরে ধীরে আবার নেমে এলাম। পুরোপুরি প্রেক্ষাগার একা পেরুলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম। সেই মাইকটা থেকে অতর্কিত এক কলি গান বেরুলো "এবার অবগুণ্ঠন খোলো"—। একটু জীবন্ত হয়েই গানটি বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম নিজেদের খুশী রাখার জন্য চৌকিদারমহলে কেউ গ্রামোফোন বাজাতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিল পিক্‌আপের যোগসূত্র ছিন্ন করতে। তাই এই হঠাৎ

চমক। স্টেজের মধ্যে কেউ থাকাও সম্ভব। ভারী পর্দাটা ঠেলে আমি ভেতরে ঢুকতে যেতেই হঠাৎ মনে হলো যেন স্টেজ হাসছে। তার কাপড় ধরে নাড়া দিয়েছি। তবু তার সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই। সে হাসছে। অনায়াসে সে তার নগ্নদেহে আমায় গ্রহণ করলো। এত সাজ, এত সজ্জা, এত আরাধনা সব এর কাছে তুচ্ছ। শেষ হয়ে এসেছে এ নায়কের দিন। অন্য নায়ক পাবার প্রতীক্ষায় আজ সে কম্পিত, অপেক্ষায় থরোথরো। নির্লজ্জ, বেহায়া মেয়েটার আব্রু যেন টেনে ছিঁড়ে একাকার করে দিতে ইচ্ছে হয়।

তাড়াতাড়ি কান্না সরে যায় স্টেজের আড়ালে। যদি ওরা নির্মল হতো আমায় জিজ্ঞাসা করতো আমি কে? তা না করে সরে দাঁড়ালো। কে ওরা। রিহার্সাল শেষ হয়ে গেছে। জমাদারটা একা থাকে। কিন্তু মুসলমান পোস্টার-ম্যানটার বাড়ি দু-তিনটে মেয়েমানুষ আছে। জমাদারটা দিব্যি স্টেজটার অন্ধকার পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ে নানা রকম দুষ্পাচ্য বস্তু নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে। আমি সিঁড়িটা পেয়ে উঠে এলাম। জমাদার এতক্ষণে নীচে থেকে ডাকলো, "সোমবাবু কবে এলেন?" পেঁচার মতো চোখ ব্যাটার। মেয়েমানুষটাকে গাপ্ করেছে। আমি বললাম, "আজই। বাবু কোথায়?" ও বেড়ালের মতো মিউমিউ করে বললে, "ওপরেই পাবেন। কিন্তু এ ধার দিয়ে কষ্ট করে এলেন কেন? ও ধার দিয়ে বাইরে দিয়ে নতুন সিঁড়ি হয়েছে।" আমি ততক্ষণে দোরের সামনে এসে পড়েছি।

ঘরটার ভেতরে কয়েকজন বসে আছে। চিনি না সকলকে। একমাত্র চিনি বীরু আর হুটুকে। গোটাতিনেক বোতল খালি। কয়েকটা গেলাস টেবিলের ওপর, তক্তপোশের ওপর, ইজিচেয়ারের পায়ার কাছে। দুটো প্লেটে নোংরা ভুক্তাবশিষ্ট। একটায় কেউ খিচুড়ি খেয়েছে বেশ অনেক আগে। সকাল বেলায় হবে। তারই একপাশে কাগজে-রাখা সাজা পান আর সিগারেটের টিন। একটা প্লেটে কিছু কাঁচা পেঁয়াজ, আদার টুকরো, টুকরো লেবু আর অমলেটের টুকরো। সবই অর্ধভুক্ত বা ভুক্তাবশিষ্ট। ঘরটার গন্ধ মত্ত-ষণ্ডের গায়ের গন্ধের মতো জৈব, স্থূল আর মাদক। আলোটার জোর খুব বেশী নয়।

আরও দুজন বসে ছিলেন।

আমায় দেখে হুটু বললো, "এই যে সোমনাথ বাবু যে! আসুন, বসুন। এঁরা আমার বন্ধু। ললিত সেন আর চারু সেন। চারুবাবু আমেরিকা থেকে সম্প্রতি থিয়েটার ক্রাফ্‌টের স্টাডি করে ফিরেছেন। আর ললিতবাবুদের পূর্ববাংলায় মস্ত জমিদারী ছিল। উনি কিছু টাকা এই লাইনে ইন্‌ভেস্ট করতে চান। তাই কথা হচ্ছিল।" এবার সেনযুগলের দিকে বললেন, "ইনি আমাদের

সোমনাথবাবু। আমি 'রঙ্গশ্রী'র ম্যানেজার। আর উনি 'রঙ্গশ্রী'র মালিক হেমন্তবাবুর ম্যানেজার।"

কথাটার মধ্যে রস থাকলেও রসিকতা ছিল না। অন্তত যতটা জোরে ওরা হেসে উঠেছিল ততটা রসিকতা ছিল না।

হাসিটা আমার ভাল লাগে নি।

কিন্তু বীরু ক্রমাগত মদ খাচ্ছিলো।

আমি চেয়ে দেখে বললাম, "বীরুবাবু, আপনার শরীরের অবস্থা জানেন তো? এত বিষ খাচ্ছেন?"

নিজের গেলাসে একটা সিপ্ দিয়ে আর সেনেদের গেলাসে কিছু ঢেলে সোডা মিশিয়ে দিয়ে বললে, "ঐ কথাই তো হচ্ছিল। আমরাও তো খাই। তবু তার মধ্যে টেম্পারেট্। আর ও, আজ সেই সকাল থেকে চলেইছে। এখন বেশী রাতে আসবেন প্রভু সন্ন্যাসীদেব। তিনি এসে যদি কিছু বিলি করতে পারেন।"

বীরুর প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রিয়তা অবিসংবাদী। ওর মধ্যে একটা সত্যিকার শিল্পী-প্রাণ ঘুমিয়ে আছে। এবার নাটকে ওর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর স্ত্রীও মারা গেল। তারপর থেকে বীরু আর বাড়ি যায় নি। অগত্যা এই ঘরটা হেমন্ত পার্টিশান করে বার করেছে।

এ সব সংবাদ বীরুই আমায় বলেছিল। "ডুবছি শুধু আমিই না; হেমন্তও ডুবছে। আমি মদে, ও মেয়েমানুষে: আমি মদ খাই, মেয়েমানুষের ধার ধারি না। ও মেয়েমানুষেই মজে আছে, মদ ছোঁয় না।"

হুটু বলে, "তাও এবার কি হয় দেখো।"

"আর দেখার আছে কি? রাখলে কি? সেনবাবুদের সঙ্গে তো কথা হয়েই গেছে। এখন পাকাপাকি একটা হলেই ওকে নেমে যেতে হবে মঞ্চ থেকে।" হঠাৎ ও যেন নিজের মধ্যে ডুবে যায়। নিজের মনে জোরে জোরে বলে, "নেবে যেতে হবে। কোথায় যাবে নেমে ও? কোথায়?…" হারিয়ে যায় বীরুর কথা।

হুটু বলে, "ওর কথা ভেবে কি করবে? কিছু না হয়, যাত্রা আছে তো।"

বীরু গেলাসটা ছুঁড়ে মারে হুটুকে। লাগে না হুটুর। দেয়ালে লেগে সেটা ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে যায়। বীরু চেঁচায়। অশ্রাব্য গালাগাল দেয় হুটুকে। "আবার যাবে যাত্রায়? অথচ এই একটা লোক যে শিল্পকে ভালবাসে, শিল্পীকে ভালবেসে সর্বস্বান্ত হলো। সারাটা জীবন কো-অপারেটিভ্ প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখলো। কেউ এগিয়ে এল না। আর তোমাদের মতো হাঙরের দল কেবল মালিকের পর মালিককে খেয়ে ফেলার জন্যে ঘুরছে।" বিশ্রী একটা গাল দিলো বীরু।

বীরুর কথায় মাদক-উচ্ছ্বাস। তবু যেন কোথায় পাই আমার চিত্তের বেদনার একটা প্রতিকার। আমি কিছুতেই এমন উলঙ্গ ভাষায় মুটু-বরণ করতে পারতাম না।

মুটু বললো, "আরে তুমি ভাবছো কেন, তোমার মাইনে তো চারুবাবু বাড়িয়ে দিচ্ছেন, কন্‌ট্রাক্‌ট্ করে নিচ্ছেন।" বলে একটা গেলাসে আবার কিঞ্চিৎ ঢেলে ওকে দিতে যেতেই আমি হাতটা চেপে ধরে বলি, "ওর সর্বনাশ হবে ওতে। আর দেবেন না।"

বীরু এক হাতে গেলাসটা নিতে নিতে বলে, "এই সর্বনাশই তো মুটু ম্যানেজারের উপজীব্য। মদের দামটা অবশ্য হেমন্তর।"

মুটু বলে, "কিন্তু হেমন্তর সর্বনাশ হেমন্ত নিজেই ডেকে আনলো।"

বীরু বলে, "তুমি থাকতেও? হেমন্ত বেশ স্বাবলম্বী হয়েছে বলো।"

সেনেরা উঠলো, "আজ চলি। হেমন্তবাবু এখন ফিরলেও কথা আর হবে না। তবে আমরা সব শর্ত এমন কি টাকাটাও মেনে নিয়েছি। এটর্নির অফিসে কাল এগারোটায় থাকবো। কেবল নগদ টাকাটার বদলে সমস্ত দেনা-পাওনা মিটিয়ে বাকী ব্যালান্সটা ওঁকে নগদ দেওয়া হবে। এজন্য পাব্লিক নোটিফিকেশন করে, টাইম লিমিট দিয়ে তারপর কথা।"

মুটুও উঠে যাচ্ছিল। কিন্তু বীরু ডেকে বসালো।

ওরা চলে যেতেই বীরু বললে, "শালা, জোচ্চোর। নগদ টাকা তার মানে এখন একটি পয়সা দেবে না। টাইম লিমিট অন্তত ছ মাস করবে। ছ মাস ধরে হেমন্ত কী খাবে। এই শর্ত আবার শর্ত না কি?"

বীরু ইজি চেয়ারে এলিয়ে পড়ে বলে, "মেনে নেবে হে ম্যানেজার। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি তুমি ওদের কাছ থেকে মোটা কিছু নিয়ে ঐ হতভাগ্য হেমন্তকে দিয়ে রাজী করাবে। মনে পড়ে মুটু বহুদিন আগেকার কথা তোমার মতো এক মুটু ছিল এই রঙ্গশ্রীতে? মাখনকে? মাখন দত্ত? মনে পড়ে? তার সঙ্গে তো তোমার দারুণ ভাব ছিল হে! তার সঙ্গে ছিল রজনী মিত্তির। আজ রজনী মিত্তির কোথায় জানো? বই বাঁধাবার ব্যবসা করে জীবন-সংস্থান করে। অথচ রঙ্গশ্রীর মঞ্চের প্রত্যেকটি পেরেকের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। সে এই মঞ্চকে হাতে করে গড়ে। মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে ছিল কালিদাস বড়াল; সে ছিল নট, মঞ্চের পেছনে ছিল রজনী মিত্তির। স্বপ্ন দিয়ে, সাধনা দিয়ে গড়েছিল মঞ্চ। আর মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে পর পর বই লিখে দিত মদন রায়। এই তিনজনায় মিলে রঙ্গশ্রীর মঞ্চের খ্যাতি। সে খ্যাতির নেশা আজও বাংলার জনসাধারণের চোখে-মনে লেগে আছে।"

"আছে। থাকে না কিছুই।" মুটু বাধা দিয়ে বললো।

"সেটা ঠিক। বাংলার মসনদ গেছে। দার্শনিক বলতে পারতো ও কালক্রমে গেছে, যেতও। তবু মীরজাফরের কথা কেউ ভোলে না। ইব্রাহীম লোদীকে সরাবার জন্য বাবরকে ডেকে আনা, পৃথ্বীরাজকে সরাবার জন্য ঘোরীকে ডেকে আনা, রাবণকে সরাবার জন্য বিভীষণের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ এসব কথা ইতিহাস ভোলে কি মুটু? বসন্ত বা মুটুকে কালিদাস বা হেমন্ত-বধ পর্বে ভোলা যায় কি? কোথায় গেল কালিদাস? অত বড় জমিদারবাড়ির ছেলে। বুড়ো বয়েস পর্যন্ত যুবার অভিনয় করে গেল; চিরটা কাল রঙ্গমঞ্চকে মাতিয়ে রেখে গেল, রাজার দাপটে অভিনয়চাতুর্য আর অধিকার ভোগ করে গেল। কেউ কি কোনো দিন শাসন করতে পারলো। আমার মনে পড়ে ওর দাপটের কথা…"

সে সব কথা অনেক বারই শুনেছি। একটা নয় অনেকগুলো। কালিদাস বড়াল রঙ্গমঞ্চ-পিপাসুদের মনের অনন্ত বিশ্বাস ছিল। তাকে নিয়ে কত গল্প! আজ নেশায় পড়ে বীরু সেগুলো দরদ দিয়ে বলছিল। আর ও তো চমৎকার অভিনেতা, চমৎকার কণ্ঠ। বলছিল যখন অভিভূত হয়ে যাচ্ছিলাম।

কালিদাস প্রথম যখন মঞ্চে এল সমস্ত আভিজাতিক মহল যেন ক্ষেপে গেল। ওকে ত্যাজ্যপুত্র করার কথাও উঠলো। কিন্তু ও যেন জনপ্রিয়তা সঙ্গে করে মঞ্চে নামলো। এত যশ, এত মান, এত অর্থ এত তরুণ বয়সে কেউ পায় নি। ও মদ খেত তার মধ্যেও মানুষ দেখলো রোমাঞ্চের আভাস, ও নারী নিয়ে উৎসব চালালো, মানুষ ক্ষমার চক্ষে দেখলো; এমনিই প্রতিভা এমনই মনোহর ব্যক্তিত্ব। থাকতো কলকাতার সামান্য একটা হোটেলে। ছেলে-বুড়োর অবাধ অধিকার। সেই সারল্য অথচ সেই ব্যক্তিত্ব মানুষ নেশার মতো রসিয়ে রসিয়ে পান করলো। ভাল ভাল বন্ধু তার। নাট্যকার, শিল্পী, অভিনেতা। কখনও ঈর্ষা-দ্বেষ জানেন না। পর পর অভিনয় করে যেতে লাগলো অখ্যাতনামা গুণী সাহিত্যিক শৈলেন গুপ্তের বই। সঙ্গে সঙ্গে শৈলেন গুপ্তের খ্যাতি, সমৃদ্ধি। সেই শৈলেন গুপ্ত বই নিয়ে এসেছে। নতুন বই। কালিদাস দেখলো বই। ভালই লাগলো। দু-এক জায়গা মঞ্চের খাতিরে একটু বদলে নিলেই চলবে। রাতে ডিনার খেয়ে ফিরেছে বালিগঞ্জের সেরা বাড়ি থেকে। অনেক রাতে। নেশায় চোখ আড়ষ্ট, মন আগুন। মেয়েটা নিজে ড্রাইভ করে ওকে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। হোটেলে এসে কি হয়েছিল ওর। মেয়েটিকে—শান্ত, কোমল, ভীরু পরিচয়ের মেয়েটিকে ও বলে ওর ঘর অবধি যেতে। মেয়েটি হেসে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপরও অনেক রাত বাকী ছিল। অনেক গেলাস ভরেছিল। যখন ওর

ঘুম ভেঙেছিল তখন দুপুরের বুকের কাছাকাছি। শৈলেন গুপ্ত বসে আছে। শৈলেন ওকে স্নান করতে কাপড় বদলাতে সাহায্য করলো। কিন্তু নাটকের কথা পাড়তেই প্রথমেই ও বলে বসে, "নাটক লেখা তুমি ছেড়ে দাও শৈলেন।"

শৈলেন নতুন বই দিয়ে অপেক্ষা করছিল। অথচ এ কি কথা।

"কেন কি হলো?"

সীনগুলো বদলাবার কথা একটু প্যাঁচালো করেই বললো কালিদাস। শৈলেন অবশেষে বলে, "এই অপটু হাতের নাটকেই তোমার এত যশ!"

"ভুল শৈলেন, ভুল!" মাস্তিক দম্ভে কালিদাস বলে, "আমি অভিনয় করে থাকি বলেই তুমি নাট্যকার। নৈলে শৈলেন আবার নাট্যকার! না-না, ও সীন্‌গুলো একেবারে ছিঁড়ে ফেলে আমি যে নোট্ দিয়েছি সেই নোট্ অনুসারে নতুন করে লিখে দিও।"

শৈলেন গুপ্ত ভীষণ আহত বোধ করেছে নিজেকে। বলেছে, "তা হবে না।"

"হবে না তো নাটকও হবে না!"

নেমে গিয়েছিল শৈলেন পাণ্ডুলিপি নিয়ে।

বারান্দা অবধি প্রমত্ত কালিদাস এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে বলে, "বগলদাবা করে যে নাটক নিয়ে যাচ্ছে শৈলেন নাট্যকার এই পথ বেয়ে বগলদাবা করে সেই নাটক ফিরিয়ে আনতে হবে। মনে কোরো শেষের দিন সে ভয়ঙ্কর। হাঃ হাঃ হাঃ" সে হাসির ধাক্কায় পথে লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। শৈলেন যেন এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে ছুটে পালালো যেন।

অন্য কেউ হলে এখানেই শেষ হতো। কিন্তু এ কালিদাসের কাহিনী। শিল্পীর কাহিনী। ও নাটক ও করলো না তখন, কিন্তু শৈলেনকে আবার সমাদর করলো। তার সৌখ্যকে আয়ত্তে রাখলো। তারপর যখন শৈলেনের বই অন্যত্র হয়েও তেমন নাম করতে পারলো না, তখন নিজেই তা করলো। এবং বাজারে বলে বেড়াতে লাগলো, "শৈলেনের বই যদি না পেতাম না খেয়ে মরে যেতাম।" এখন শৈলেন গুপ্তই এ কাহিনী সজলচক্ষে সকলকে বলে।

একটা কি কাহিনী? জনপ্রিয়তা দেখে নভেল্‌টি থিয়েটার্স ওকে দিয়ে ফিলম্ করিয়ে করিয়ে ফেঁপে উঠলো। মদই ছিল ওর সর্বনাশ। একদিন মদের মুখে উক্তি করেছে দম্ভ ভরে—"মালিক? নভেল্‌টির মালিক কে? কে জানতো নভেল্‌টির হাঙ্গর-মুখো ছাপ? এই কালিদাস এনেছে সে নাম।"

অপরাধ, মালিক ডেকে পাঠিয়েছেন কালিদাসকে।

"ডেকে পাঠায় আমাকে? আমি শিল্পী। তাকে বলে দাও শিল্পী চাকর হয় না, চাকরি করে না। আমি দিই সে খায়। সম্পর্কটা পরিষ্কার জানা থাকা ভাল।"

বনেদী ব্যবসায়ী বুদ্ধি মালিকের। এ সব কথা চাটুকারদের মুখে শুনে এতটুকু বিরক্ত হলেন না তিনি। বললেন, "তোমরা চাকর, শিল্পী নও। উনি সত্যিকার শিল্পী। এ কথা বলার যোগ্যতা আছে ওঁর। সত্যি কথাই তো, ওঁরা দেন আমরা খাই।"

পরম সন্তোষের পরিচয়স্বরূপ মালিক মাসখানেকের মধ্যে কালিদাসের বেতন চারগুণ করে দিয়ে একেবারে আট বছরের কন্‌ট্রাক্‌ট্ করে নিল। বনেদী ব্যবসায়ী বুদ্ধি। তারপরে এই আট বছর একটি বইতেও নামতে দিল না কালিদাসকে। গাদা গাদা নতুন নায়ক এনে পর্দায় তুলে ধরলো। উদ্দেশ্য, জনগণের চিত্ত থেকে মুছে দেয় কালিদাসকে।

কিন্তু মুছবে কি করে?

মঞ্চে সে নামে। এই আট বছরে সে নিজে মঞ্চ কিনে মালিক হয়েছে। নতুন নাটকের মহরৎ। প্রথম নাটক নামছে। নায়িকার প্রয়োজন। আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল কালিদাসের। যে প্রাচীনা অভিনেত্রী যমুনা একদা কলকাতা রঙ্গমঞ্চের বিস্ময়, যার স্মৃতি আজ কিংবদন্তী হয়ে গেছে, তাকে খুঁজে বার করলো পুরী থেকে।

"আমি তো এখন বুড়ী বাবা। এখন কি আর আমায় দিয়ে অভিনয় হয়?"

বুদ্ধদেব জাতকে এক জায়গায় বলেছেন। নারীর যৌবন কখনও যায় না। সময় ও পাত্র রুচিকর হলে অশীতিপরাও প্রেমিকা হতে পারে। যমুনাবালার সেই স্থির চোখে আগুন এনে দিয়েছিল এই নবোন্মত্ত প্রগল্‌ভ শিল্পী। একটু একটু করে যমুনাবালা আবার নটী হলেন। তাঁর লোলচর্মে আবার পড়লো পুরু করে সিলভার জিঙ্কের প্রলেপ, রুজ, স্টিক, আর সুর্মার বিচিত্রতা! বুকের কাঁচুলিতে টান পড়লো, পাকা চুলের অবশিষ্টে উজাড় করে ঢলে পড়লো ঘন, কৃষ্ণ, কুঞ্চিত চুলের রাশ। কাঞ্চি স্থানের ঢল্ আর দেহবল্লরীর লাস্য ঘনিয়ে তুললো জনার অভিনয়। কালিদাসের 'প্রবীর' বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে রোমাঞ্চকর একটা অধ্যায় হয়ে রইলো। কালিদাস মরে গেল যেদিন, সেদিন পুরীতে ঐ যমুনাবালা বলেছিল, "ভাগ্যি সে বয়সে ঐ আগুনের ছোঁয়া পাই নি। নৈলে আজ কেঁদে ভাসিয়ে কুল পেতাম না। শিল্পীদের অল্প বয়সে মৃত্যু যেন বর!"

নট কখনও মঞ্চাধ্যক্ষ হতে পারে না। একদিন এই রঙ্গশ্রী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল কালিদাসকে। সেদিন তার সান্ত্বনা ছিল। বলেছিল হেমন্তকে "একটা সান্ত্বনা হেমন্ত যে মঞ্চ বেচলেও অরসিকের হাতে বেচলাম না। শিল্পীর হাতেই বেচলাম। অনেক যত্নে আয়াসে সাত বছর ধরে রঙ্গশ্রীকে পুষেছি। দেখো এর নামটাকে উজ্জ্বল রেখো।"

যতক্ষণ ও নিজে বেরিয়ে না গেছে ততক্ষণ ওপরে ওর ঘরে উঠে কেউ চাবিটা নিতে পারে নি।

হেমন্ত দাঁড়িয়ে ছিল নীচে সিঁড়ির পাশে। বেলা সাড়ে এগারোটা হবে। কোর্টের নাজির-দারোগা বসে আছে। সিঁড়ি দিয়ে রাজকীয় ভঙ্গীতে নেমে আসছে কালিদাস। হাতে চাবির থোলো! বাঁ হাতের ওপর ঝুলছে কয়েকটা জামা।

"এই নাও হেমন্ত রঙ্গশ্রীর চাবি। একদিন এমনি করেই এ হাতে এসেছিল চাবি। আবার এমনি করেই চলে যাবে হেমন্ত। ব্যবসায়ী কামড়ে পড়ে থাকে, বনেদী প্রতিষ্ঠানে পিতৃপুরুষের দাঁতের দাগ দেখে নিজের দাঁতের দাগ বসিয়ে যায়। আর শিল্পীর ব্যবসা একটা ঝলক, দীপ্তি। নাও চাবি। জানি একদিন তোমাকেও এ চাবি ফেরত দিতে হবে। চাবি আঁকড়ে পড়ে থাকা তোমার ধর্ম নয়। কিন্তু যে কদিন থাকবে রঙ্গমঞ্চে এক ঝলক প্রাণ এনে দেবার চেষ্টা কোরো!" তারপর হাতের পোশাকগুলো দেখিয়ে বলে, "এগুলো কোম্পানীর পয়সায় করা নয় হেমন্ত। নিজে সখ করে করিয়েছিলাম। নিয়ে যাচ্ছি। অবশ্য কনট্রাক্ট্-এ ছিল না। যদি আপত্তি করো রেখে যাবো।"

হেমন্ত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। বললো, "সবই আপনার জিনিস দাদা। আপনি আশীর্বাদ করে যান আমায়, যেন আপনার নাম অক্ষুন্ন রাখতে পারি।"

আর তার বারো দিনের মধ্যে কালিদাস বড়াল মারা গেল। রজনী মিত্তির খরচ দিলো। একদিন সব রঙ্গমঞ্চ বন্ধ রইলো। ধূলোঝাড়া ফটোয় মালা উঠলো। রাগ-রাগিণী সহকারে বক্তৃতা হলো। মানুষ ভুলে গেল নাট্যলোকের গভীর গহ্বরে কত উপবাসী, রুগ্ন, জর্জর কালিদাস আর তার ভাই-বোনেরা এখনও পলে পলে তিলে তিলে মরছে।··· বলেছিল বীরু। তার দুগাল বেয়ে জল নেমে আসছে। আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলে যাচ্ছে।

আমি বলি, "বীরুবাবু থাক্। এসব কথায় আপনারা দুঃখ পান।"

বীরু বলে, "তাতে দুঃখ কি? আসল দুঃখ আপনারা দুঃখ পান না। তাও ক্ষমা করতে পারি। কিন্তু ঐ বসন্ত আর হুটু—এদের মতো হাঙ্গরদের আমি ক্ষমা করতে পারি না। হেমন্তর সর্বনাশ ওরাই করেছে।"

হুটু বলে, "তোমাদের এ একটা বাজে ধারণা বীরু।"

"বাজে? বাজে বলছো? রাজীব আর তার দলকে বেশী করে তাতানো, তাদের টাকা পাইয়ে দেওয়া, নটে নটে ঝগড়ার সৃষ্টি করা, শিল্পীদের মধ্যে রেশা-রেশি আনা, নাটকের মহলায় রাশি রাশি টাকা ওড়ানো এ সব করো না তুমি?

আমায় তুমি অন্যত্র চাকরির লোভ দেখাও নি? সময়মতো আমি না এলে কি গতি হতো হেমন্তর মনে পড়ে?"

মুটু বলে, "রাজীব থাকলে অবশ্য এ গতি হতো না। তোমাদের দয়ায় তো যেতে বসেছে।"

বীরু বললো, "বসেছে কি, যাবে। নিশ্চিত যাবে, বেশ বুঝতে পারছি। আজ যদি স্বাস্থ্য থাকতো সেই কালিদাসের স্বাস্থ্য—রাজীব? রাজীবের কথা বলছো? ও অভিনয় করে? কি জানে অভিনয়ের? ও টাকা চুষতে জানে, টাকা। ওর মতো বেঁচে না থেকে হেমন্তর মতো মরে যাওয়া ঢের ভাল।"

হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বীরু বলে, "ভাববেন না আমরা সবাই এই রকম। দেখুন না কেন হেমন্ত স্কোপ দিলো বলেই তো আজ আমি এত বড় নট। স্কোপ দিলো বলেই মরতে মরতে আমি উঠলাম, দাঁড়ালাম, জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় করলাম। শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান পেলাম। দেখুন না হেমন্ত নিজেই কত সাহায্য করলো। বারীন চক্রবর্তী—সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রমে সকলকে অভিনয় শিক্ষা দিয়েছেন। কখনও কেউ কোনো নেশা বা বেচালের ছিটেফোঁটাও গায়ে দিতে পারে নি। কেবল সাহায্য করে গেছেন। না পেলে রাজীব আজ কোথায় থাকতো? দেখুন নীরেনদাকে, নীরেন মিত্তির। ঐ বেঁটে খাটো চেহারার লোক। দিব্যি ওকালতি করে রোজগার ছিল। এই নেশায় পাগল হলেন। জীবনভোর সকলকে এগিয়ে দিয়েই গেলেন। অমন শিক্ষা দিতে কেউ পারলো কি? আর এখনও দেখুন মহেশদাকে, আমাদের সন্নিসী-ঠাকুরকে। এখনও কেমন করে হেমন্তকে দাঁড় করিয়ে রাখবে। এখানে অভিনয় চলছে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' আর স্টারে চলছে 'খনা' সর্বাণীর বেনিফিট্ নাইট। সর্বাণীকে কথা দিয়েছেন মহেশদা। একই দিনে দুটো জায়গায় দুটো বই এক সঙ্গে। গাড়ি নিয়ে ছুটোছুটি। একটা সীন্ এখানে, একটা সীন্ ওখানে। গাড়ির মধ্যেই সাজ বদলে বদলে সে কী পরিশ্রম, আর কী আগ্রহভরে!"

"আর এই হেমন্ত। ওর জন্যে একদিন সবার প্রাণ কাঁদবে। শ্রেষ্ঠ নট নয় ও যে জনসাধারণ ওকে মনে রাখবে বা ইতিহাসে স্বাক্ষর এঁকে যাবে। সে স্বাক্ষর আমিও আঁকবো না, মহেশদাও আঁকবে না। কিন্তু দেবতার মতো আচরণ বলে মহেশদাকে পাদপ্রদীপ মনে রাখবে। আর আমরা বা আমাদের চেয়েও নীচু স্তরের যে শিল্পী, ঐ এক্‌স্ট্রার দল, ঐ ছুতোর, মিস্ত্রী, দরওয়ান, বুকিংয়ের বাবুরা—এরা সব মনে রাখবে। এরা যখন নতুন ইতিহাস লিখবে তখন হেমন্তর কথা বলবে। মহেশদা এ জগতের দেবতা, আর হেমন্ত এ জগতের মানুষ। এই থাকবে ওদের পরিচয়। শুনুন বলি, তখন ও যাত্রাদল থেকে এসে মঞ্চ কিনি-

কিনি করে ঘোরাঘুরি করছে। মাঝে মাঝে এধার ওধার দু-একটা নাইট করে আসে। আমি আর ও দুজনাতেই গেছি মিনার্ভাতে। সেদিন ওদের একটা কম্বাইণ্ড্ নাইট্। অফিসে গল্পগাছা করে ফিরছি। আমার খুব ক্ষিদে পেয়েছে। পকেটে পয়সা নেই। হেমন্ত হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলো, 'খাবি কিছু ?' ঢুকলাম একটা কেবিনে—মিনার্ভা কেবিন না কি নাম। কাটলেট আর চা আমিই বললাম। ও বললে "যাঃ ওতে পেট ভরে কখনও ? বাঙালীর খাওয়া রসগোল্লা নৈলে খাওয়া। আমি রসগোল্লা ভালবাসি।" কেবিনের একটা ছোকরাকে ডেকে বললে, "যা তো মোড়ের দোকান থেকে ভাল রাজভোগ দুটো দুটো চারটে নিয়ে আয়।" রাজভোগে ওর অদ্ভুত প্রীতি। আমি পেট ভরেই খেলাম। কিন্তু বুঝলাম পকেটেও বিশেষ কিছুই রইলো না। তবু ঐ যে ডেকে নিয়ে জোর করে বসে খাইয়ে দিলে, এ শুধু আমাকে নয়, প্রত্যেককে। এই স্বভাবটার জন্যে মঞ্চের সমস্ত কর্মচারী, যারা শিল্পী নয়, ওকে মানে, জানে। আত্মীয় বলে মনে করে। নৈলে মহেশদা এতো হেমন্ত হেমন্ত করেন কেন ?"

ইতিমধ্যে মহেশদা নিজেই উপস্থিত।

আমায় দেখেই বলেন, "কী খবর। নবপর্যায়ের লোক দেখছি যে। বন্ধু যে যবনিকাপাত করেছেন, খবর রাখো ?"

আমি বললাম "রাখি। বন্ধুরই তো দেখা নেই।"

"হবে। দেখা অবশ্যই হবে। এখন তার নিত্যকর্মে সে গেছে। এ সময়টা সে কারুকে দিলো না।"

"ঐ তো রোগ" বলে মুটু। "আর বীরু বলে আমরা গোল্লায় দিলাম ওকে।"

"অবশ্য। আমরা যে দিলাম এতে তোমার সন্দেহ থাকার কথা নয়। ওকে গোল্লায় আমরা ছাড়া কে দিতে পারে ? মেয়েমানুষ ? মদ ? এ সব ওর করবে কি ?"

মুটু বলে, "তবু বলবেন ? এখন তবে ও কোথায় আছে বলুন ?"

মহেশদা বলেন, "আছে অবশ্য মেয়েদের পাড়াতেই। তবু কি জানো, ছোকরাকে যেন বড্ড বেশী চিনি আর জানি। এতটা আমায় ঠকাবে এ যেন আমি বিশ্বাস করি না। ও যেন ও পথের পথিক নয়। একটা রহস্য। কেন যে ও ভেদ করে না আমি জানি না।"

মুটু বাঁকা হেসে বলে, "হে ঋষ্যশৃঙ্গ দেব, এ শাস্ত্রে আপনার প্রবেশ নেই। আপনি এ জানেন না।"

মহেশদা বলেন "জানি যে তোমরা এ বিষয়ে সত্যকার অধিকারী। আমি অর্বাচীন। তবুও বলছি ভুলটা আমাদেরই হচ্ছে।"

বীরুর দিকে চেয়ে বলেন, "এবার এসব থামাও। অন্যত্র ব্যবস্থা করতে হবে। এ পর্দা তো নামলো বলে। নিজের প্রতিভাটা নষ্ট না-ই করলে।"

বীরু ঘুমিয়ে পড়েছিল বোধ করি। জবাব দিলো না।

আমি বলি, "হেমন্ত কি ঠিক করেছে বেচে দেবে রঙ্গশ্রী?"

"না দিয়ে এখন তো আর উপায় নেই ভাই। দিতেই হবে। এখন যদি দেয় জেলে যাবে না। প্রাণপণ চেষ্টা করছে যদি কিছু ধার পায়। পেলেই বা কি। যদি চটপট দু-তিনখানা নাটক নামাতে পারতো তখন। কিন্তু সর্বদাই ঐ এক ভুল। একখানা বই নিয়ে আদ্যন্ত কাল পড়ে থাকা। আপাতদৃষ্টিতে লাভ বেশ। কিন্তু নটের প্রতিভা যায় কমে; উদ্ভাবনী শক্তি থাকে না, উৎসাহের অভাব ঘটে, অনুশীলনে জড়তা-আলস্য আসে; আর সব চেয়ে বড় যা ক্ষতি তা নতুন নাটক লেখা হয় না, লেখকরা মরে যায়। তখন নতুন নাটক হলো না।"

নুটু বলে, "ঐ রাজীবই তো হতে দিলো না।"

মহেশদা বলেন, "রাজীবের নাম করে আলাদা রাগ করে কি হবে! ভাগ্য। নৈলে রাজীব কি আর বোঝে না। শুনতে পাই রাজীবের সঙ্গে তোমরও তো ভাব।"

আমি বলি, "কোনো রকমে বাঁচানো যায় না? এ মঞ্চ যদি যায় এই বয়সে ও খাবে কি? করবে কি?"

মহেশদা বলেন, "সবই তো বুঝি। মঞ্চের প্রথম শ্রেণী এখন অন্য সব আগন্তুকরা ভরে ফেলেছে। মঞ্চের খেলাধুলার অভিনয়ের ধরন বদলেছে। নতুন চাকরি পেলেও ভাল চাকরি পাবে না। পরে মনস্তাপে, ক্ষুধায়, প্রতিবেশীর অবহেলায় অকালে মারা যাবে। আমায় তোমায় খবর দেবে, দুফোঁটা চোখের জল, দুছড়া মালার খরচ হবে। তারপর ডুবে-যাওয়া ঘটির ওপরের জল মিশে আবার এক হবে। যা ডুবে গেল তার চিহ্ন জল ধরে রাখে না।

আমি ভাবি চিনির কথা। তার কি হবে।

বীরুকে ভাল করে শুইয়ে দিলেন মহেশদা। তারপর আলো নিবিয়ে নুটুকে নিয়ে বেরুলেন। আমিও বাড়ির দিকে ফিরছি।

মনে মনে অস্বস্তি হেমন্তর সঙ্গে দেখা হলো না।

নুটুকে নিয়ে মহেশদা সুমুখের সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে গেলেন। আমি যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই নামলাম।

ইচ্ছে করেই নামলাম।

সেই সিঁড়ি, সেই মঞ্চ, যেখানে এই বীরুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। হেমন্তর কাছে টাকা ধার চাইছে। এ পথে না এসে সোজা পথে গেলেও পারতাম। কিন্তু আমার ভাল লাগে এই ঘুমানো মঞ্চের গায়ে হাত রাখতে।

মেয়েদের পোশাকের ঘরে মেয়েরা যখন সাজগোজ করে দেখেছো কখনও। কখনও দেখেছো আয়নার সামনের টেবিলটাকে, টেবিলের তলাটাকে, আলনার ওপরে কাপড়গুলোকে, মেঝেয় ছড়ানো পাউডারের গুঁড়ো? ওদের দেহের আবরণ আছে সে তো দেখা যায়। প্রায় প্রতি অঙ্গে আবরণের তলায় আরও আবরণ থাকে যেগুলো পাউডার মাখা অঙ্গের সঙ্গে লেপ্‌টে থাকে। সেই নিবিড় করে ধরা আবরণগুলোকেও ওরা ঢেকে রাখতে চায়। কোনো কারণে সাধারণ্যে প্রাকৃত-দৃষ্টির সীমানায় সে সব অঙ্গবাসগুলো ধরা পড়ে গেলে ওদের লজ্জা দেখেছো? সেজেগুজে বাইরে যিনি এলেন, চললেন গাড়ি চড়ে সিনেমায়, বাজার করতে বা পার্টিতে তিনি তাঁর সাজঘরের মধ্যে রেখে এলেন খণ্ড বিপ্লব। এখানে সাবানের বাটী, ওখানে লেসের টুকরো, হেয়ারপিন, ফিতে, চুলের ভেতরে গোঁজার নানা ফাঁকি, ইতস্তত পরিত্যক্ত অন্তর্বাসের অনাদৃত উপেক্ষা,—এই বিশৃঙ্খলার কোনো পরিচয় পাওয়া যাবে কি ছিমছাম, ফিটফাট তন্বী বধূটির মধ্যে?

মঞ্চ, পিছন থেকে দেখা মঞ্চ, ভেতর থেকে দেখা মঞ্চ তেমনি একটা ছবি তুলে ধরে আমার চোখে। সামনে সীটে বসে যখন বারবার পর্দার দিকে তাকাই, যখন ওপরে ঝোলে আলো, নীচে সারি সারি জ্বলে নানা রঙের আলো, পর্দা করে ঝলমল, গানের কলি ভাসে গরম ঘামে ভেজা, গন্ধে মেদুর বাতাসে, যখন পরপর নরনারী নানা সাজে প্রোজ্জল কোলাহলে মুখরিত করে তোলে প্রেক্ষাগার—তখন মনে হয় ভারী চটুল, ভারী চমৎকালো, ভারী গৃহিণী এই রূপবতীটি। কিন্তু তার ওপারে, যেখানে বসে এই রূপবতী প্রসাধন করেন সেখানে একবার চোখ রাখলে যে বিশৃঙ্খলা, যে নোংরামী, যে ক্লেদ, বিমর্ষতা, অনাচার অশ্লীলতা স্থূলরূপে দেখা দেয় তাকে অনাবৃত করার নেশা আমার। মঞ্চের এই রূপই সত্য। অন্যটা প্রসাধন-পুষ্ট মিথ্যা মায়াজাল। মঞ্চই নটী, মঞ্চই বিকৃতি। এর সমস্ত পর্দায়, কাপড়ে, সীনে, সেটে, আসবাবে, পুরোনো প্রলেপের গন্ধ। এর মরচে পড়া পেরেক, জীর্ণ তৈলাক্ত দড়ি, মেরামত করা কাঠের ফ্রেম, দাঁত বার করা কাঠের সিঁড়ি, ঝুলপড়া ইলেকট্রিকের তার, ধুলোপড়া পাটাতন সবই কেবলই বারবার বলে দেয় প্রপঞ্চময় এই উচ্ছল জীবনবিলাস। এর মদিরা মৃত্যু, এর চঞ্চল নূপুরধ্বনি ফাঁদ; হেমন্ত বলে এটা নটী, আমি বলি কালী। হেমন্ত আমায় এ ভালবাসা শিখিয়েছে।

আর গন্ধ। মঞ্চের ভেতরের গন্ধ। পুরোনো গন্ধ, ফেলে-আসা গন্ধ, অন্ধকারের গন্ধ। এ গন্ধেরই নেশা নাট-কে প্রলুব্ধ করে। এর বুকে দাঁড়িয়ে কত সন্ধ্যা দীপ্ত হয়ে উঠেছে, কত রাত্রি নিবিড় হয়েছে। এরই বুকে আছে নটের পৌরুষের দীপ্তি, নটীর প্রণয়ের সম্ভাষ! প্রতি পদক্ষেপে কি নট কি নটী আশায় থরোথরো কাঁপে। উঠবে কি গেয়ে প্রেক্ষাগার? বলবে কি "আমি তৃপ্ত?" প্রেক্ষাগারের চোখে কি

জ্বলে উঠবে ভালবাসার বাণী ? মানুষ কি বলবে "ধন্য এই রজনী ?" নট আর নটীর ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে এই কয়েক গজ কাঠের পাটাতন।

তাই পারি না এই মঞ্চকে ত্যাগ করে চলে যেতে। আমার কাছে চিনিও যেমন বাঁচে, হেমন্তও যেমন বাঁচে তেমনি বাঁচে এই মঞ্চ। এর নাড়ীর শব্দ, এর বুকের তোলপাড় আমি জানি।

কিন্তু করে কি ওর বুক তোলপাড় ? কারুকে ভালবেসেছে ঐ মঞ্চ ? ভালবাসার মহাশ্মশান রঙ্গমঞ্চ। অনেক ভালবাসার কবর পাবে এখানে। মরে যাওয়া প্রেমের প্রেতাত্মারা এখানে ঘোরাফেরা করে।

ঘোরাফেরা করে।

আমি দেখছি দাঁড়িয়ে ওরা দুজন। অন্ধকার গাঢ়তরো হয়ে ওদের ঝাপটে ধরছে। মেয়েটি করুণ স্বরে বলে, "আর দুটো দিন সময় দিও। মাত্র দুটো দিন। এর মধ্যে আমি ঠিক করে ফেলবো।"

পুরুষ বলছে, "আর নেই সময়। নিতে হয় নাও। আমায় আর ভাবিও না। এ আমার শেষ সম্বল।"

"পারবো না এমন করে নিতে। আমায় ভাবতে দাও। আমি যে সব জানি। সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে তোমার !"

"হোক। তবু আমি মাত্র কটা দিনের জন্য সমস্ত পণ্ড হতে দেব না। বাইরে গাড়ি আছে। পেছন দিয়ে চলে যাও।"

আমি চুপি চুপি সামনের পথ দিয়ে বেরিয়ে চলে এলাম সোজা হেমন্তদের বাড়ি।

কয়েক মিনিট মাত্র ব্যবধান। হেমন্ত এল।

একবার ভাবি প্রশ্ন করি—কি দিলে ? কাকে দিলে ?

কিন্তু করতে হলো না।

ও নিজেই বললো, "সব দিয়ে এলাম। কাকে দিলাম বলতে হবে একদিন। তোকে বলবো। কিন্তু ভাল করেছিলি তখন কিছু না বলে। ওখানে কিছু বললে ওকে টাকাটা দিতে পারতাম না।"

"তবে মুটু যা বলে ঠিক ? চিনিকে তুমি ঠকিয়েছ ?"

"কারুকে ঠকাই নি রে ! কারুকে নয়। কেবল নিজেকে ঠকিয়েছি।"

চিন্ময়ী এসে বলে, "ভাত বেড়েছি খাবে চলো।"

১০

একেবারেই ডুবে যেতো হেমন্ত সেই বারেই। গেল না মাত্র মহেশদার দয়ায়। সে দয়ার প্রকৃতি আর প্রভাব এমন যে স্বয়ং মুটুও তাকে কিছু ক্লিন্ন করতে পারলো না।

মহেশদা নিয়ে এলেন তাঁর পরিচিত ছগনলালকে। যুদ্ধের বাজারে ছগনলালের কাছে সাদার চেয়ে কালো টাকাই জমেছে বেশী। মারোয়াড়ী পাটোয়ারী বুদ্ধি। মহেশদা লাগালেন সেই বুদ্ধিকে কাজে। কথা হলো টাকা ছগনলাল দেবে। আমি রইলাম হেমন্তর তরফ হয়ে কথা বলার জন্য। মহেশদা রইলেন ছগনলালের তরফ হয়ে কথা বলার জন্য। বেশীর ভাগ রইলো বীরু আর এটর্নী, সে-ও ছগনলালেরই লোক।

"টাকা আমি দিবো হৈমন্ত বাবু। বাকী টাকা লিবো কি কোরে তা বাৎলাইয়ে দিতে হোবে।"

আমি সে দরবারে উপস্থিত। হেমন্তও। তবে হেমন্ত স্থির। যেন এ জগতেরই নয়।

আমি বললাম, "কি হলে দেবেন বলুন।"

"বংগালী বাবুদের বেব্‌সা টাকা চায় খুব। বাকী, টাকা দিতের সোমোয়ে বড়ো ঝামেলা।·· সে হামি পারবো নাই।···সন্ন্যাসী-দাদাজী জানেন তো সোব্‌ই, সোকোল বাত। বাকী, মেহনতের টাকা। সাদা টাকা মেহনতী টাকা। বাকী, কালা টাকা খুন কো ভী কালা করিয়ে ছোড়ে। এত্‌টা ডর লাগে। সেই টাকা—"

আমি বলি, "কিন্তু না খাটালে আপনিই বা কি করবেন।"

"আলবৎ! কি কোরবে। বাকী, ফেলিয়ে তো দিবে না। আপুনি কারোবারে লগাইবেন, লগান। বাকী পাওয়া জাইবে কিসে।"

মহেশদা বলেন, "বেশ। আপনি বুকিংয়ে বসে, বিবেচনামতো আপনার টাকা উসুল করতে থাকবেন, যাতে প্রতিষ্ঠানও মার না খায়, আপনিও মার না খান—"

ছগনলাল লুফে নিয়ে বলে, "আউর পোরতিষ্ঠাও মার না খায়। বাবুজীর পোরতিষ্ঠাটো বাকী রাখতে হোবে। কেমোন?"

একটু হাসে হেমন্ত। "আমার প্রতিষ্ঠা আপনি বুকিংয়ে বসলেই যাবে। ও কথা ছাড়ুন। টাকা দিন। যা বলবেন তাই হবে।"

"বাকী—"

আমি বলি, "আর বাকী-টাকী নয় ছগনলালজী। ঐ রইলো কথা। লেখাপড়া নয়। টাকা দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে নেবেন। বুকিংও আপনার, খরচও আপনার। পেছনের ঋণ আপাতত থাকুক। যদি আপনি দেখেন পোষাবে তখন ঋণ নেবেন, সুদও নেবেন।"

"বাকী, হমার সে রূপেয়া পাবার সিকোওরোটি কি হোবে?"

হেমন্ত বলে, "আমার নাম; আমার গলা; আমার অভিনয়।"

"সো-তার দাম কি! রাগ কোরবেন না বাবুজী। আদমী লোক সিল্‌পী দেখতে আসে না। ঐ সুরূপাকে—"

বলা শেষ হলো না। আমি বলি, "বেশ। সিকিউরিটী হবে হেমন্তর মাসিক বেতন। সপ্তাহে সপ্তাহে যা দেবেন তা থেকে ও শোধ করবে ঋণ।

"না!" জোর গলায় বলে হেমন্ত। "আমি রোজ টাকা নেবো, যেমন রাজীব নেয়।"

তৎক্ষণাৎ আমাদের মনে পড়ে যায় রোজের টাকা নৈলে ওর চলবে না। আমরা অবাক হয়ে দেখি একেবারে ডুবে যাবার আগেও ওর শপথে ও অটল।

আবার ভাবি 'কে এ নারী!'

মহেশদা বলেন, "আচ্ছা তাই। দৈনিক দুশো পাবে তুমি।"

"না; সাড়ে তিনশো।"

তাড়া দেয় হেমন্ত। "না সুরূপা যেমন মাসে পাঁচশো পাচ্ছে তাই। যাদের সঙ্গে যা কন্‌ট্রাক্‌ট্ তাই থাকবে। আমি খরচ বাড়াতে দেবো না।"

ঘাবড়ে যায় ছগনলাল। "বাকী—"

"আবার বাকী!" ধমকে দেয় হেমন্ত। "মনে রেখো শেঠজী, তোমার টাকা থাকলেও আমি এসে মঞ্চে না দাঁড়ালে তোমার টাকার থলে চন্দ্রগুপ্তের পার্ট করবে না। ডুবে যাক রঙ্গশ্রী। তবু আমি নাট্যমঞ্চের সর্বনাশ ডেকে আনবো না। রঙ্গমঞ্চের চাল নষ্ট হতে দেবো না।"

চলে যেতে চায় হেমন্ত।

ছগনলাল বলে, "আরে হৈমন্তবাবু ঘাবড়াইছেন কেনো। লিন এই দোস্‌টি হজার। বাকী হামি রোজ বুকিংয়ে বোসবো।"

তাই হলো।

ছগনলালের দৌলতে রঙ্গশ্রী চলতে লাগলো টিমটিম করে।

পাঁচ কানাঘুসো চললো মারোয়াড়ী বসে থাকে রঙ্গশ্রীর বুকিংয়ে। কিন্তু হেমন্ত যেন শুনতে পায় না কিছু।

এর মধ্যে সর্বনাশ সরোজিনী মারা গেল। স্বরূপার বিয়ে হয়ে গেল। 'রাজস্থান' নাটক লাটে উঠলো। পর পর নতুন নাটকে খরচা হলো, আয় হলো না।

বুকিংয়ে থেকে ছগনলাল হাঁফিয়ে ওঠে।

আদালত থেকে নোটিস্ দিলো।

হুটু বললো, "দিকগে। প্রথমত, ফৌজদারী নয়। দ্বিতীয়ত, ওর টাকা ও কবুল দেবে কোন্ খাতা থেকে? মামলা করলেই হলো? এ বাবা কালো টাকার মামলা। চালাকী নয়।"

হেমন্ত বলে, "সব মামলা জিতেও নিজের কাছে হেরে থাকবো হুটুদা। ও বড়ো বিষম হার।"

চাপা রইলো মামলা। চললো নতুন নাটক।

এবার বুকিংয়ে মহেশদা, এবং স্বয়ং চিনি।

তখন আমি নেই। আমি থাকলে চিনিকে বসতে দিতাম না বুকিংয়ে।

প্রত্যক্ষ লাভ হলো হুটুর চুরী এবং ছুটো লোকের মাইনে বাঁচলো। পরোক্ষে লোকসান হেমন্তর বদনাম। তবু রঙ্গশ্রী চললো।

আমি যখন ফিরলাম তখন চিন্ময়ী সত্ত্বেও অচল অবস্থা।

"হলো না সোম, বলে চিন্ময়ী। কিন্তু ওর ওই বরাদ্দ টাকা চাই-ই। যদি একটা বছর টাকাটা না দিত, রঙ্গশ্রী দাঁড়াতে পারতো।"

রাগ হয়ে যায় আমার।

রাগের মুখে বসে আছি।

হাজির বসন্ত। "এই যে বৌদি। বুকিংয়ে তুমি আছো ভালই। তাঁর সঙ্গে তো কথা বলার জো নেই। আমার বিলের টাকাটা দাও।"

"সে তো দিয়ে দিয়েছি ঠাকুরপো, সকালেই।"

মুখ ভেংচে বলে, "দিয়ে দিয়েছো! দিয়ে দিয়েছো বললেই দিয়েছো। সে তো কারেন্ট টাকা। না দিলে পোস্টার বন্ধ হবে তাই। আমার বাকী-পড়ে-থাকা এগারোশো টাকার বিল—"

"সে তো এখন পারা যাবে না ভাই—"

"ভাই ভাই কি! ব্যবসায় ভাই ভাই নেই। আমার ডোববার ইচ্ছে নেই। তোমার কত্তাকে—"

"কার কথা বলছিস বসন্ত ?" বলতে বলতে হেমন্ত ঢোকে।

"কার আবার। তোমার।"

"আমি তোর দাদা আগে না ওর কত্তা আগে।"

"অত শত জানি নে আমি, টাকাটা আমার ফেলে দাও।"

আমি বলি, "দেখছো এখন আতান্তোর ; তোমার বৌদি নিজে এসে বুকিংয়ে বসেছেন ; আর তুমি একটু সামলাতে পারছো না ?"

বসন্ত হঠাৎ বলে ফেলে, "সেই যাত্রার কাল থেকে এ বাজারে নেমে ব্যবসা করা ওঁর অভ্যেস আছে।"

চিৎকার করে ওঠে চিন্ময়ী "ঠাকুরপো !"

আর সঙ্গে সঙ্গে হেমন্ত ঠাস্ করে চড় মারে বসন্তের গালে। পা থেকে জুতো খুলে এলোপাথাড়ী মারতে মারতে বার করে দেয় ঘর থেকে।

আমরা কজন মিলে ওকে সরিয়ে নিই।

চিন্ময়ী কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

কিন্তু চিন্ময়ী সামলে উঠতে যে সময় নিয়েছে তার মধ্যেই বসন্ত পুলিস নিয়ে হাজির।

আমি আশঙ্কা করেছিলাম।

জবানবন্দী নিয়ে চলে গেল পুলিস।

আমি সাক্ষী দিলাম। 'ওরা দাদা-বৌদি বলে লুকুচ্ছে, কিন্তু বসন্ত জোর করে তহবিল নিতে যাবার ফলেই বাধ্য হয়ে হেমন্ত মেরেছে।'

সে সবে কিছু হলো না। হলো টাকায় আর হেমন্তর বিশেষ বন্ধু এলাকার এস. পি-র দয়ায়।

এত সব গোলমাল সত্ত্বেও হেমন্ত টাকা চাইলো।

তার বরাদ্দর টাকা।

চোখ ভরা জল চিন্ময়ীর। বলে "আজও চাই সে টাকা ?"

"আজও চাই।" নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে বলে হেমন্ত।

"আমার অপমানও কিছু নয় তোমার কাছে ?"

শক্ত গলায় বলে হেমন্ত, "টাকা দাও চিনি।"

আমি বলি, "কি এমন নেশা তোমার।"

একবার আমার দিকে চেয়ে বলে হেমন্ত, "টাকা দাও চিনি !"

চিনি ছুঁড়ে ফেলে দেয় টাকা।

ও বেরিয়ে যায়।

সেদিন আর পারি না। চুপি চুপি আমিও সঙ্গ নিই।

নীচ হলাম। হেমন্তকে হেমন্তর অলক্ষ্যে অনুসরণ করার কাজেও লিপ্ত হলাম।

চুপি চুপি বার করলাম গিরিশ পার্কের বাড়ি।

আমি স্থির করলাম আমি ঐ বাড়ি যাবো।

বেলা দশটা হবে। আমি বাড়িখানার সুমুখে দাঁড়ালাম। ভেতর থেকে বন্ধ। দোরে একটি চিঠির বাক্সে লেখা এইচ. গাঙ্গুলী। যাক্, কড়া নাড়ি। চাকর এসে দরজা খুলে দেয়। আমি প্রথম বুঝতে পারলাম এ ভাবে চলে আসা আমার উচিত হয় নি।

আমি মনে মনে ভেবেই নিয়েছিলাম এটা কোনও একটা বিশেষ সমাজের বাড়ি। সে সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো পরিচয় আমার নেই। কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। এবং বাড়িটার বাসিন্দাদের উক্ত সমাজের মনে করাটাই আমার একটা কল্পনা। কে এরা কিছুই জানি না।

আমি ঘাবড়ে বললাম, "হেমন্তদা আমায় পাঠিয়েছেন। খবর নিতে।"

একটু পরে একটি বছর কুড়ির যুবতী এসে আমায় প্রশ্ন করলো "কি খবর বলুন।"

মেয়েটির চেহারা স্পষ্ট, সরল, সপ্রতিভ। আর পাঁচটা গৃহস্থবাড়ির মেয়ে যেমন, এও তাই। পরনে মিলের এমনি শাড়ি। ভিজে চুল পিঠে ছড়ানো। মনে হয় সদ্য উঠে এসেছে সাংসারিক কোনো কাজ থেকে।

"আমি হেমন্তদার ভাই। আমার নাম সোমনাথ।"

দু ধাপ সিঁড়ি নেমে এসে মেয়েটি আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো।

"চলুন ওপরে" মিষ্টি সম্ভ্রান্ত গলা। যেন আমায় কত চেনে।

আমি সহজ হবার চেষ্টায় বলি, "আমায় তুমি চেনো?"

আমি অবাক হয়ে যাই ওর কথা শুনে, 'এ বাড়ির সবাই চেনে আপনাকে। আমার নাম শ্যামলী। ওপরে চলুন মা আর বড় মাসীমা আছেন।'

"কে রে শ্যামলী?" কণ্ঠ ভেসে আসে।

ততক্ষণে দ্রুতপায়ে শ্যামলী উঠে গেছে।

আমি ওপরে যাঁর সামনে দাঁড়ালাম তাঁকে চিনি। সেই বিলাসী। অপরটিকে অনুমান করে নিলাম রানী। এরা তো আমায় চিনলো না।

ঘরে বিশেষ কোনো সাজবিলাস নেই। দুটি বিধবা। একটি মেয়ে। যেমন সংসার হয়।

শ্যামলীকে বললো বিলাসী, "তোমার কাকার জন্যে একটু চা করে আনো মা। না, তা শুনবো না। এ বাড়ি প্রথম এসেছো। তোমায় মিষ্টিমুখ করে যেতেই হবে।" শ্যামলী চলে গেল।

আমি মেঝেয় আসন পেতে বসে। বিলাসী শুধু মেঝেতেই বসে। আমায় জিজ্ঞাসা করে বিলাসী, "কি খবর নিতে এসেছো ভাই? কি আবার বলে পাঠালো সে? তার শরীর ভাল তো?"

"হ্যাঁ"

"আমি বলি কিছু বুঝি আবার হলো। নৈলে সে তো কখনো কোনো দিন এই এতদিনের মধ্যে কারুকে দিয়ে খবর নিতে পাঠায় নি। তার ওপর দিয়ে কত যাচ্ছে। সর্বনাশ তো হলো বলে।

"আপনি সব জানেন?"

"আমিই তো সব জানবো। আমার কাছে রোজ রাতে আসবে। সব বলে যাবে। বামুনের বেটা তো বামুনের বেটা। কথার নড় চড় নেই।···আমাদের সবাই হেনস্তা করে কিনা, তাই ওর বড় ভয়, পাছে ওর ব্যবহারে আমি কোনো আঘাত পাই। অথচ আমি ওর জন্যে কিছুই করতে পারলাম না।"

আমি বলি, "আমায় আপনি ঠিক চিনতে পারেন নি। কোর্টে যখন হেমদা ডীড্ করান তখন আমিই সাক্ষী ছিলাম। আপনার আঁচলের টাকা আমিই গুণে নিয়েছিলাম।"

ভাল করে চেয়ে বলেন, "আমি চিনতে পারি নি। বুড়ো হইছি, চোখে আর ঠাওর হয় না। টাকা তো আমার নয়, রানীর। ঐ তো রানীর মেয়েকেই দেখলে শ্যামলী।"

"শ্যামলী তো আপনার মেয়ে।"

"চুপ চুপ" চমকে ইশারায় শাসন করলেন। মেয়েকে কিছু বলি নি। সে-সবের ও কিছু জানে না। ওর মার নাম রানী, বাপের নাম পতিতপাবন। এই ও জানে। সব ঐ হেমন্তর মতে করা। নৈলে ওর সমাজে স্থান হবে না। এই সংসার ঠেলতে ঠেলতে ও আধমরা। রোজ রাতে এসে কুড়িটা টাকা দেবে, খবর নেবে। বললে বলে, 'আমার হাতে জমা টাকা চেও না। যেমন আসে নিয়ে নাও।' আর কারুকে তো জানতে দেয় না। তুমি জানলে কি করে ভাই?"

আমি অপরাধী। আমি তখন একে একে সব খুলে বলি। কেমন ওকে সকলে সন্দেহ করে। কি যেন ওর বদনাম। দেখে দেখে আমার আর সহ্য হয় নি। তাই এসেছি। তাছাড়া আগের দিন রাতের ঘটনাটাও বলি, স্টেজের ভেতরকার সেই কথাবার্তা।

"তবে বোধহয় গিয়েছিল কল্যাণী। তারও পেড়ার হয়েছে।"

"তিনি কে?"

"বলো কেন? দাদার কি তোমার কম পুষ্যি? আমাদের নয় ছেড়েই দাও সেই বালক বয়স থেকে জানাশোনা। এককালে খুব আদরযত্ন করেছি ওকে; ওরও তাই মায়া। গাঁয়ে, বিভুঁয়ে, বনে, বাদাড়ে, যাত্রাপার্টির যন্ত্রণা তো তোমার জানা নেই। কত দিন জ্বরে কেঁপেছে। সারারাত মাথায় জলপটি দিয়েছি। অমন তো কত লোকেরই দিয়েছি। কেউ কি মানে? ভদ্দর রক্ত গায়ে; খাঁটী বামুনের সন্তান। তাই সে কথা মনে রেখেছে।"

আসল কথা চেপে যাচ্ছে বিলাসী। আমি বলি, "শুধু তাই কেন, আপনার দৌলতেই ও রঙ্গশ্রীর মালিক হতে পেরেছিল। আপনাদের ভরণপোষণ ওরই দায়। ধর্মতঃ, ন্যায়তঃ।"

"সেই দায়টাই বড়ো হলো ভাই? আমরা অনেক টাকা বয়সকালে রোজগার করি। গাঙ্গে যখন ভাদ্দরের টান তখন ঘাট বাঁধার কথা কার মনে থাকে? অমন টাকা ঢের আসে, ঢের যায়। টাকা নিয়ে পুরুষ ঠকায় নি এমন মেয়ে আমাদের সমাজে কটা পাবে ভাই? তাছাড়া টাকা ধর্মতঃ আমারও নয়; রানীরও নয়। সেই ডবডবে ছোঁড়াটার টাকা। তবু ও যে করে সে ওর স্বভাব। যার কাছ থেকে পেয়েছে তারও করে, যার কাছ থেকে পায় নি তারও করে; আরও শুনবে, ওকে যারা পথে বসিয়েছে সেই মন্টু আর ওর ছোট ভাই বসন্ত তাদের জন্যেও করে। এ ওর স্বভাব।"

আমায় একটা প্লেটে খাবার দিয়ে গেল শ্যামলী। ওর তখন কলেজের সময়। ও চলে গেল। রানী কোথায় দেখি নি। কথা চলতে লাগলো অদ্ভুত এই মাটির অন্ধকারের মানুষটার সঙ্গে।

"কিন্তু সে স্বভাব তো যায় এবার।"

"যাবে জানি। সেই ভয়েই তো কাঠ হয়ে আছে। বলে, আমার কি বিলাসদি আমার একটা মেয়ে আর বৌ। আবার যাত্রার দলে ঢুকে দিন কেটে যাবে। কি করবো শ্যামলী আর কল্যাণীর।"

"কল্যাণী? সে কে?"

"কে? জানো না? আমরা তো ওর কেউ নই, কল্যাণীই তো ওর সব। আমাদের দিয়ে তো ওর কলঙ্ক নেই। কল্যাণীকে দিয়েই কলঙ্ক। আমাদের কানেই সে কথা আসে। সেই যে কাল রাতে যার কথা শুনেছিলে বলছো।"

"কে সে?" আমি এবার উৎসুক হয়ে পড়ি।

"আগুনের ভাঁটার মতো মেয়ে। আমাদের দলে ছিল রহিমদা—আর ছিল পোড়ারমুখী কদম। রহিমদা মোলো মোছলমানের দাঙ্গায় আর কদম আসলে মোলো পিরিতের শোকে, লোকে বললো অসুখ। তাদের ঐ কল্যাণী। আমার

মনে হয় বাপের নাম লিখিয়েছে নিজের আর কদম যে ওর মা সে কথা গাপ্ করে গেছে। কল্যাণী জানে ওর গোপন বিয়ে ছিল। কেউ জানে না। কল্যাণী হেমন্তর মুখ চেয়ে আর তার অত ভালবাসা পেয়ে আর এ সব কথা ঘাঁটাঘাঁটি করে না। চিরটা কাল হোস্টেলে হোস্টেলে কাটালো। বড় আশা ছিল হেমন্তর ওকে ভাল ঘরে বিয়ে দেয়। কিন্তু পারবে না। ও বাপের ব্যাপার সব বুঝেছে। ও রক্তে কদম আর রহিম। এমন আগুনের মতো স্বভাব ওর। কেবল বলে সিনেমায় যাবে। হেমন্তকে ভাবতে দেবে না। ওর এম-এ পরীক্ষা দিতে আর কটা মাস। টাকা ও নেবে না। রোজগার করবে। এই নিয়ে খুব অশান্তি চলছে। হেমন্ত এসে কান্নাকাটি করে রাতে। ও এসে কান্নাকাটি করে যখন পারে। প্রায়ই আসে কল্যাণী।"

আমি সব শুনি আর অবাক হই। বলি "এ সব এত গোপন রাখার মানে কি ?"

"তা বোঝো না ? ও তো জানে আমি কে, রানী কে, শ্যামলী কে, ঐ কল্যাণী কে ? বলেই স্পষ্ট করে 'বেনো জল খাল কেটে ঢোকান কি উচিত ? ও আমার নিজের মনের নেশা। আমি একা ও নিয়ে ডুববো। কলঙ্ক আমার কি করবে ? এ লাইনে এ সব তো কলঙ্ক নয়। গোপীচন্নন রসকলি। যাবা মনে করলে কষ্ট পাবে তারা মনে করবে না।' তারা আর কে ? তার বৌ আর তুমি।"

"আমাদেরও তো বলে নি। সত্যি কথা বলি শুনুন, আমি অনেকদিন থেকে এসব কথা শুনছি। চিন্ময়ী পর্যন্ত এ কথা শুনে লজ্জায় ঘেন্নায় মরে গেছে। কিন্তু না চিন্ময়ী, না আমি, কেউ বিশ্বাস করি নি। অথচ মনে মনে কষ্ট পেয়েছি। কালকের ঘটনার পর আমি আর থাকতে পারি নি। চুপি চুপি ঐ সঙ্গে ওর পিছু নিয়ে বাড়ি জেনে আজ এসেছিলাম বেশ কিছু ঝগড়া করতে।"

বিলাসী বলে, "করো ঝগড়া।"

"আর হলো না। কিন্তু ওর রঙ্গশ্রী এবার গেল। আর বাঁচে না।"

"তাও বলেছিলাম। শ্যামলী আর কল্যাণীকে নিয়ে যদি থিয়েটার চালাতো।—"

কথা শেষ হলো না। আমি বললাম, "কি বলছেন আপনি ? ও পারে তাই ? ওর পক্ষে সম্ভব ? ওর নিজের মেয়ে নেই ?"

হতাশ হয়ে বিলাসী বলে, "ঐ তো তোমাদের রোগ ঠাকুর। ব্যবসার সঙ্গে মন জড়িয়ে ফেলো। আমরা যখন ব্যবসা করতাম আমাদের সব মাস্টারনীরা, আমাদের ব্যবসাও তো শিখতে হয়গো, সেই সব ঘাগী মাস্টারনীরা আমাদের বলতেন 'মন দিবি না। দিয়েছিস কি ব্যবসা মরবে, তুই মরবি। গেরস্তালী করার সখ যাদের আস্তাকুঁড়েতে তাদের আসতে নেই। কুঁড়ে ঘরে চাঁদের আলো পড়ে।

কে চেয়ে দেখে বল ? হীরের ওপর পড়লে সেই চাঁদের আলো সবাই দেখে।' —সত্যি কথা। বড় খাঁটী কথা। তোমাদেরও তো ব্যবসা বাবা। এ সবে এত মন দিয়ে মাখামাখি করতে নেই।"

আমি বলি, "অনেক মানুষ যেখানে পোড়ে তাকে বলে শ্মশান। সেখানে যারা থাকে তারা যোগিনী, সন্ন্যাসিনী, প্রেতিনী। তাদের সঙ্গে গৃহলক্ষ্মীর তুলনা হয় না। আপনারা যা সহজ বলে নেন আমাদের তা বড় কঠিন বোধ হয়। আপনাদের অমৃত, আমাদের বিষ। আপনারা মন এত পান যে মনে অরুচি। গৃহস্থের সংসারে এতটুকু মন পাবার জন্যে আমাদের জন্ম জন্ম চেষ্টা, আরাধনা করতে হয়। মন বাদ দিয়ে আমরা পারি না।"

চোখ দুটো বয়সে ঝুলে পড়লে কি হবে সেই চোখ ফেটেই জল পড়তে লাগলো রেখাঙ্কিত গালের ঢল বেয়ে। নিঃশব্দ, গোপন, ভাষাহীন অশ্রু।

আমি বলি "আপনি কাঁদছেন ?"

"হ্যাঁ ভাই, কান্না জিনিসটা বড় পাজি। মাঝে মাঝে ও ঝপ্ করে যখন এসে পড়ে বড়ই অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হয়। আমাদের চোখের জল ফেলে অনেক সময় পয়সা রোজগার করতে হয়েছে। ওটা বেশ আয়ত্তের মধ্যে ছিল। তেমন হলে করতেও পারি। কিন্তু এক-এক সময়ে জানতেও পারি না, রুখতেও পারি না, জল আপনি এসে পড়ে।"

আমিও কিছু বলতে পারি না। কথা যোগায় না।

বিলাসীই খানিক পরে বলে, "ও খুব আঘাত পাবে এই রঙ্গশ্রী বিক্রি হয়ে গেলে। অথচ বিক্রি হয়ে যাবেই। হুটু ছাড়বে না। ঐখানে আবার রাজীবকে আনবে। বীরুকে তাড়াবে। এই ওর ব্যবসা। এই ওর আনন্দ। কিন্তু মেজো-কত্তার কি হবে তখন ?"

মনে হলো এই মেজোকত্তার ডাক। ফেলে-আসা জীবনের সাথীদের কণ্ঠে হেমন্ত এখনও এ ডাক শোনে। হয়তো আশ্বাসও পায় ভেবে যে সমস্ত বিশ্বই ওকে ঠকায় নি। একটা জগতে ওর এখনও স্থান আছে। যাত্রাদলে মেজোকত্তা। সে ডাক তো আছেই।

আমি এখন উঠতে চাইছি। বলি, "আমি সন্দেহ নিয়ে এসেছিলাম—একথা হেমন্ত যেন জানতে পারে না। আমি যে এসেছিলাম কথাটা গোপন রাখা যেতে পারে ?"

খুব খুশী হয় বিলাসী। বলে, "আমিও ভাবছিলাম। মেজোকত্তার একটা বড় আনন্দ যে আমাদের কথা কেউ জানে না। আমি ভাবছিলাম এ আনন্দটা আমরা নষ্ট করি কেন ? আমরা জানাবো না। তুমিও ভাই বৌকেও বোলো

না। তুমি তো বিয়ে কর নি। বেশ করেছো ভাই, বেশ করেছো। যদি থাকতে পারো ভাল না বেসে ভালই থাকবে। মন নিয়ে নাড়াচাড়া যত না করতে হয় তত ভাল।”

আমি যাবার আগে একবার জিজ্ঞাসা করলাম, “আমি কল্যাণীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। কল্যাণী না বুঝে হঠাৎ কোনো আঘাত না দিয়ে বসে। আপনার কি মত?”

“আমার মত? শুনবে? কল্যাণী মানুষই নয়, মেয়ে মানুষতো নয়ই। আমাদের জগতে অমন মেয়েকে আমরা বলি উল্‌কা। আমাদের জগতেও মাঝে মাঝে এক-একটা মেয়ে আসে যাকে বশে রাখতে বুড়ীর বুড়ীকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। কল্যাণী সেই আগুন। ও যা করবে তা করবেই। ওর বাপের জন্যে ও প্রাণও দিতে পারে। কিন্তু কথা ও শুনবে না। ওর যা মাথায় আসবে তাই করবে।”

“তার ঠিকানা?”

মেসের ঠিকানা দিয়ে দিলো বিলাসী। “গেলেই দেখা করবে। চমৎকার মেয়ে। খুব ভাল লাগবে কথা বলে।”

যখন বিলাসী বলেছিল, মেস তখন কেমন কানে লেগেছিল। কিন্তু বাড়ি-টায় এসে সব দ্বন্দ্ব নিরসন হলো।

আমি ট্রাম থেকে নেমে বাড়ির নম্বর দেখে ধীরে ধীরে এগুচ্ছি। রাসবিহারী এভিন্যু থেকে একটু গলিমতন। একখানা বাড়ি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় বাড়ি। মোড়টায় থামতে হলো। বড় একখানা গাড়ি ঢুকছে গলিটায়। গাড়িখানা ঢুকে যেতেই আমিও ঢুকলাম। দেখলাম যে বাড়িতে আমি যাবো সেই বাড়িরই দরজাতেই গাড়ি থামলো।

দু-তিন দিনই বেশ বৃষ্টি পড়ছিল। আসতে পারি নি। আজ বৃষ্টি ধরতেই বেরিয়ে পড়েছি। ওদিকে সব ঠিক হয়ে গেছে। রঙ্গশ্রী বিক্রি হবে। আগামী শুক্রবার কোর্টে আবার সেই ডীড্ করতে যেতে হবে। আমিই যাবো। চিন্ময়ীর যেন নূতন করে জীবন আরম্ভ। ক্ষণে ক্ষণে ভয় পাচ্ছে; সব চেপে ক্ষণে ক্ষণে হেমন্তকে সাহস দিচ্ছে।

আর আমায় নিয়ে প্লানের পর প্লান তো আছেই।

আমি চাইছি এ সময়ে কিছুদিন অন্তত হেমন্ত তার বিশেষ দায়িত্বগুলোকে একটু হাল্‌কা করতে পারে কিনা। অর্থাৎ যদি এমন দায়িত্ব থাকে যা হাল্‌কা করলে মনুষ্যত্ব ফিকে হয়ে যাবে তাকে রেখে যেগুলো আপেক্ষিক কম প্রয়োজনীয় সেগুলোকে থামিয়ে রাখা যায় কি না।

বিলাসীদের মাসিক সামান্য একটা ব্যবস্থা না করা অন্যায় হবে। কিন্তু শ্যামলী চাকরি পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

এখন দেখতে হবে এই কল্যাণীকে।

মোটরটা দরজায় দাঁড়িয়ে হর্ন দিতেই একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো। এত রূপ, দেখেই মনে হলো এ-ই কল্যাণী। মোটর থেকে স্যুটপরা আধাবয়সী এক ভদ্রলোক নামলেন। মেয়েটি তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করলো। এই অবসরে আমি গিয়ে বললাম, "কল্যাণী গাঙ্গুলী কি এই বাড়ি থাকেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ আমিই। কেন বলুন তো?"

"আমি হেমন্তর ভাই সোমনাথ। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই মা।"

"আসুন ভিতরে আসুন। আগে পরিচয় করিয়ে দিই।" ইংরাজীতে বলে, "মিস্টার দীক্ষিত ইনি আমার কাকা সোমনাথ গাঙ্গুলী—"

[আমি আর বলি না ব্যানার্জি। পরে বলে দিলেই হবে।]

"আর ইনি আমার নতুন পরিচিত শুভানুধ্যায়ী মনিরাম দীক্ষিত। বোম্বায়ের পার্বতী ফিলম্‌সের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। আসুন, ভিতরে চলুন।"

ভিতরে একখানা সামান্য পড়ার ঘর। দু-চারখানা বই। আধা-ডাক্তারী আধা-বিজ্ঞানী বইয়ের গাদা।

পরিচিত বইয়ের মধ্যে বেট্‌সনের Principles of Heridity-টাই চোখে পড়ে, আর Punnet-এর Mendelism. একটু ভ্রূ কোঁচকালো আমার। কিন্তু চমকালাম ছোট্ট শিশিটি দেখে, তার মধ্যে স্লিপিং ট্যাবলেট। এ মেয়ে যা-তা নয় বোঝা যায়। একটি টেবিলের ধারে দুখানাই চেয়ার ছিল। একটা মোড়া নিয়ে এসে তাতে বসলো কল্যাণী।

আমি মিস্টার দীক্ষিতকে বলি যে বোম্বায়ে ফিলম্ লাইনে অনেকদিন আমি ছিলাম। দেখতে দেখতে আলাপ জমে উঠলো। দীক্ষিতও পতিতপাবনকে জানতো এবং পরোক্ষে আমার নামও জানতো। "আপনার সেই ডকুমেণ্টারি এখন তো বিরাট হয়ে উঠেছে।"

"তখন লোকে পাগল বলেছে।"

"সময়ের আগে যারাই ভাবে তাদেরই সমসাময়িক লোকেরা বলে পাগল। আসুন না আপনি ফিলম্ লাইনে। মিস্ গাঙ্গুলী নামতে চাইছেন না একজন অভিভাবকের অভাবে। ঠিক কি না মিস্ গাঙ্গুলী?"

কল্যাণী বলে, "না, না, সে কথা তো আমি বলি নি। আমি শুধু বলেছি একা একা বোম্বে যাওয়ার আগে বাবার মত করাতে হবে।"

"কিন্তু আপনি তো বললেন আপনার বাবা বিশেষ বিপদে পড়েছেন এবং

এখন তাঁর মাথার ঠিক নেই। তাঁর মত কি নেবেন? তিনি কি মত দেবেন? কোথায় থাকেন আপনার বাবা? ইনি আপনার কেমন কাকা? ইনি মত দিতে পারেন না?"

কল্যাণী বলে, "আমার দুনিয়ায় দুটি মাত্র মানুষ আছে। এক বাবা, অন্য আমি। বাকী দুনিয়া আমার পরিচিত ও কুটুম্ব। তাদের মতামত আমি কখনও নিই না। বাবা কখনও আমায় এ লাইনে যেতে দেবে না। কিন্তু যেতে আমায় হবেই।"

"তবে আসুন।" বলে দীক্ষিত।

"আমার পরীক্ষা" গোমরায় কল্যাণী।

"সত্যিই লেখাপড়া যদি ভালবাসো মা, পরীক্ষা না দিলেও চলবে। আর যদি অর্থ উপার্জনের জন্য ডিগ্রীর দরকার হয় অর্থ উপার্জনের পথ খোলাই তো আছে। পথ কঠিন, কিন্তু একেবারে অগম্য নয়। গৃহস্থালী করছে, শান্তিতে আছে এমন মেয়ে কি এ লাইনে নেই?"

"আপনি আমায় এ লাইনে যেতে বলেন?" কল্যাণী আমায় জিজ্ঞাসা করে।

আমি বলি, "আমার মতের মূল্য কি মা?"

কল্যাণী বলে, "তাও তো বটে। আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেছি। বাবাকে বোধহয় বাঁচানো যাবে না। তবু আমি এখন মাসে দেড়শো টাকা কোনো মতেই আর নিতে পারবো না। মিঃ দীক্ষিত, আমি কন্‌ট্রাক্‌ট্ সই করবো ঠিক রইলো। আমি দুদিন পর বোম্বে যাবো। আপনি আমায় কোনো ভাল হোটেলে একা থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন।"

উদ্‌গ্রীব দীক্ষিত বলে, "কবে কন্‌ট্রাক্‌ট্ সই হবে? কাল?"

কল্যাণী বলে, "সই করায় আমার লাভ; সই না করায় আপনার। ভুলবেন না মিঃ দীক্ষিত। আমি অভিনয় ভাল করি; তার মানে আমি জীবনকে ভাল চিনি। এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো বাড়ি যান এবং মিসেস্ দীক্ষিতকে চিঠি লিখুন যে আপনি দুদিন পরে ফিরছেন। কেমন?"

দীক্ষিত বেশ অপ্রতিভ হয়ে গিয়েছিল। "কিন্তু কল্যাণী—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে কল্যাণী বলে, "মিস্ গাঙ্গুলী, তার বেশী নয়। আমার কন্‌ট্রাক্‌টে লেখা থাকবে কখনও কোনো অসভ্য বা অনাবশ্যক আচরণ হলেই কন্‌ট্রাক্‌ট্ ভেঙে দেবার অধিকার আমার থাকবে। অবশ্য কোন্ আচরণ অসভ্য বা অনাবশ্যক তা আদালতই বিচার করবে এবং আমি তা মেনে নেব।"

হাসে দীক্ষিত মৃদু মৃদু। "আচ্ছা মিস্ গাঙ্গুলী আজ উঠি। আমি আবার কাল আসবো।"

"না পরশু। এখানে নয়, বেলা চারটেয় ফিরপো। কেমন?"

উঠে গি অবধি এগিয়ে দিয়ে ন। তারপর এসে
আবার মোড়াটাতে বসেই বলে, "তারপর কাকা? আমায় আপনি আবিষ্কার করলেন কি করে? আমি তো বাবার ইষ্টমন্ত্র। এমন গোপন করে মানুষ ব্যাধিকেও রাখে না। কথাটায় বিষের চেয়ে বেদনা ছিল বেশী।"

"এ বাধা তুমি মানো কেন? বিদ্রোহ করলেই পারো।" আমি বলি খুব যে সমর্থন আছে কথাটায় সেজন্য নয়। শুধু মেয়েটাকে আরও জানার আশায়।

"বিদ্রোহ? কার বিরুদ্ধে? বাবার দায়িত্ব কতখানি বেশ বুঝি। এ গোপনতা কেন, তাও আমার অজ্ঞাত নয়। এই রক্তের মধ্যে আমি মঞ্চ, অভিনয়, নাচ, গানের সাড়া পাই। আমার মা কি ছিলেন বেশ বুঝি। তবু তো বাবা আমায় প্যাটারনিটি কবুল করেছেন। আমায় সমাজে বসাবার পথ খুলে রেখেছেন। এটাই কি কম?"

পরীক্ষা করবার জন্যে বলি, "সেজন্য বিদ্রোহ করবে না কেন?"

"ইচ্ছে করে ঐ লোককে অশান্তি দিতে? আমি কিছুতেই ঐ লোকটির শান্ত সুন্দর মনটিকে আমার মধ্যে খুঁজে পাই না। আমার মনে হয়………"
হঠাৎ যেন সংকোচ এসে গ্রাস করে কল্যাণীকে।

"কি মনে হয়?"

"বলবো? বলবো কি মনে হয়? আপনি তো সোমকাকা। বাবার সবচেয়ে আপন বন্ধু। আপনার কথাই সেই ছোট্টবেলা থেকে শুনছি। আর একজন তিনিও আপনাদের দুজনার বন্ধু, নাম চিন্ময়ী। তিনি নাকি বিবাহিতা; স্বামীর ঘর করেন। তবু আপনাদের ছেলেবেলার সাথী, তাই বড় বন্ধু। বলেছেন হঠাৎ যদি বাবা মারা যান এই দুজনার কাছে গেলে কোনো ভাবনা থাকবে না। আপনি সেই সোমকাকা এসেছেন। বলি, সংকোচ কি? আমি তো কলকাতা ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে যাবোই। তবু তার আগে মনের কথা বলার লোক তো পেলাম। একটু অবশ্য সংকোচ হয়। হাজার হলেও আমি মেয়েমানুষ তো।"

"বলো। আমার কাছে কোনো সংকোচ করো না মা।"

"সংকোচ এসে যায়, কি করি? বলছিলাম কি জানেন, আমার মা-বাবার কাছে সত্য আচরণ করেন নি। আমি বাবার সন্তান নই। কেনো কিছুতে আমাতে বাবাতে মিল নেই। অমন স্থির, ধীর, উদার, স্নেহময় পুরুষ। আর আমি? নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টাতেই পাগল হয়ে গেলাম। স্নেহ, মায়া, করুণা এ সব আমাকে স্পর্শ করে না।"

আমি অবাক হয়ে যাই কথা শুনে। বলি, "অত ভাবতে নেই। তোমায় আমি বলতে চেয়েছিলাম যে হঠাৎ তুমি এমন কিছুই কোরো না যাতে হেমন্ত আঘাত পায়। তার বড় দুর্দিন চলেছে।"

"দুর্দিন আর কি? 'রঙ্গশ্রী' বিক্রি হবে যাচ্ছে কাগজে পড়েছি। তারপর বাবার কি হবে? পথ ছাড়া আর কি রইল? সুতরাং আমার পক্ষে ঐ লোকের কাছ থেকে আর কিছু নেওয়া সম্ভব কি?"

"কি করবে?"

"কিছুই পারবো না করতে। তবু নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবো। বাবার অত্যন্ত অমত আমি সিনেমায় যাই। একবার আমি রেডিয়োতে গান দিতে যাই। বাবা রেগে যান। বলেন মায়ের নাকি বিশেষ নিষেধ ছিল।···হাসি পায়। মা নিজেকে সামলাতে পারেন নি বলে···"

আমি বলি, "কি করে জানলে যে মা নিজেকে সামলাতে পারেন নি।"

কল্যাণী নিজের বাহু মুক্ত করে নীল নীল শিরাগুলোর ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বলে, "এই সব রক্তকণিকা," চুলের রাশের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে বলে, "প্রতিটি চুলের গোড়ার কোষ আমার সঙ্গে রাতের অন্ধকারে কথা বলে। ওরা অনেক রাত পার করে আমার কাছে এসেছে, অনেক ঝড়-ঝাপটা, অনেক তরঙ্গ, অনেক গহ্বর। বলতে হয় না, বলতে হয় না। ও আমি জানি। বাবা ঐ কারণেই আমায় যেতে দিতে চান না। আমি যাবো। এরা খুব ভাল লোক। ভাল কোম্পানী। আমায় এখনই মাসে হাজার টাকা দিয়ে তিন বছরের কন্‌ট্রাক্‌ট্ করাচ্ছে এবং তিনখানা বইয়ের বেশী করতে পারবে না কন্‌ট্রাক্‌ট্ আছে। এই সময়ের মধ্যে অন্য কোনো পার্টির সঙ্গে কন্‌ট্রাক্‌ট্ করার অধিকার থাকবে আমার। অবশ্য এ তিন বছর বাদ দিয়েই সে সব কন্‌ট্রাক্‌ট্ শুরু হবে। আপনাকে ভগবান পাঠিয়েছেন।—"

হঠাৎ বলি, "ভগবানে বিশ্বাস করো?"

মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলে, "আদৌ না। ভাবতে গেলেই মনে হয় তিনি মুসলমান না হিন্দু, য়িহুদী না খৃস্টান, কী। হাসি পায় এই তামাশার কথা ভাবতে।"

"তবে যে বললে ভগবান পাঠিয়েছেন—"

"ওটা একটা বাংলা ঈডিয়ম্ বলে মনে করতে পারেন। মানে এ্যাক্‌সিডেন্ট।"

"ভগবান মানে এ্যাক্‌সিডেন্ট? দিব্যি নতুন মানে তো!"

"এবং খুব হ্যাণ্ডী। বলাও চলে ভোগায়ও না। মানলেই নানা দুর্ভোগ। যাক্ ও কথা। এসে পড়েছেন যখন তখন আপনাকে তো বলে গেলাম। দেখবেন বাবা যেন জানতে না পারেন।"

হাসলাম। "পর্দায় দেবে ছবি, আর বাবা জানবেন না?"

"পর্দায় আমি অন্য নাম নেব। একেবারে বিধর্মী বিদেশী নাম। বাবা জানতে পারবেন না। আর যদি জানতে পারেন, তখন তো কন্‌ট্রাক্‌ট্‌। এখন গোপন থাক।"

আমার চোখের দিকে সমর্থনের জন্য চেয়ে রইলো। জানি এ সমর্থন পাওয়া-না-পাওয়ার ওপর মতামত নির্ভর করবে না। জানি আজ দীক্ষিতের সামনে আমার সঙ্গে কথা না বললে ও পারতো। কথাটা আমাকেও গোপন করতে পারতো। কিন্তু করে নি।

আমি চেয়ে বললাম, "আমি জানি তোমার মত তৈরী। আমি সে মতকে সমর্থন না করলেও তৈরী। এখন তোমায় আমি আশীর্বাদই শুধু করতে পারি। তোমার মনে শান্তি আসুক।"

ও হেঁট হয়ে আমাকে প্রণাম করলো।

১১

নকল ওষুধের ব্যাপার নিয়ে গোলমাল যেমন বাড়ছে, তেমনি আসল ওষুধ আসা প্রায় বন্ধ। পুরোনো আর প্রতিষ্ঠাবান খদ্দেররাও যেন হতাশ হয়ে পড়ছে। ওষুধের কালোবাজার বন্ধ করা যাচ্ছে না। কোম্পানীর যা লাভ তার চেয়ে পাঁচশোগুণ লাভ করছে বাইরের লোক; তবুও খাঁটী ওষুধ পাচ্ছে না। সাহেব-ম্যানেজার আর নেই। দেশী লোকই অফিস চালাচ্ছে। আমার কাজ বেড়ে গেছে সাংঘাতিক। দিল্লী-সাহাদ্রা থেকে পর পর গোটাকতক কেস্ ধরা পড়লো। আমাকে গাজিয়াবাদে গিয়ে থাকতে হলো; দিল্লী, পঞ্জাব আর উত্তর প্রদেশের পুলিস নিয়ে একসঙ্গে কনফারেন্স চলতে লাগলো।

খুব ব্যস্ত আমি।

কিন্তু সাধ্য কি এখন আমি মন লাগিয়ে ও কাজ করি। কলকাতা থেকে নিত্য নতুন রকমারি চিঠি। এমনিতেই ব্লাড্-প্রেসার ছিল হেমন্তর। দুশ্চিন্তা আর পরিশ্রমে সেটা বেড়েছিল খুবই। কিন্তু কল্যাণীর অন্তর্ধান যেন ওকে ভেঙে দিয়ে গেল। প্রগল্ভ ও বড় ছিল না। একমাত্র ওর নিজের শিল্প-সাধনার কথায় ছাড়া ও প্রগল্ভ হতো না। মানুষটার প্রকৃতি অন্তর্মুখীই ছিল। কিন্তু এসব ধাক্কার পর ও যেন বুড়িয়ে গেল, মিলিয়ে গেল। চুপ হয়ে গেল যেন। এত ঝড়-ঝাপটের মধ্যেও যে দামালের মতো জীবন ঢেউয়ের ফণায় ফণায় চড়ে চলেছে এতকাল, তারই পিঠে জীবন যেন আজ ভার হয়ে চেপে রইলো। যেন ওকে দিনে দিনে ভেঙে-চুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়।

এর পরে ব্যবসায়েই মগ্ন থাকা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হলো। মন দিতে হলো হেমন্তর কাজে।

বলছে না কারুকে কিছু হেমন্ত. কিন্তু তবু বুঝতে পারা যায় সে অত্যন্ত ব্যস্ত। চুপি চুপি অগোচরে একটা দারুণ ব্যথা পোষণ করছে। বুঝতে পারি কল্যাণী উধাও, সেই জন্যই ও এত মরে গেছে। চোখ চেয়ে দেখা কঠিন। এক-একবার ভাবি ওকে বলে দিই, যা জানি। ওর ব্যথার ভাগী হই। সেটা হওয়া ভাল; হলে ব্যথার উপশম হয়। কিন্তু মানুষ সব সইতে পারে; পৌরুষের অপঘাত সইতে পারে না। পৌরুষ থাকলে দারিদ্র্য সত্ত্বেও বেঁচে থাকা যায়; পৌরুষহীন প্রাচুর্যও মানুষের দারিদ্র্য ঘোচাতে পারে না। এইভাবে দিনে দিনে শত

বাধাবিপত্তিকে অগ্রাহ্য করেও পাঁচজনার সেবা করা, যত্ন করার মধ্যে যে পৌরুষ, সে পৌরুষের মৃত্যু হলে হেমন্ত বাঁচবে কি করে ?

আমিও জানি, চিনিও জানে। চিনি নাকি একদিন বলেওছিল, "কল্যাণী, শ্যামলী তো তোমার মেয়ের মতো। ওরা কি বুঝবে না তোমার এ অবস্থা ? ওরা তো এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতেই শিখেছে।"

"নটীর মেয়ে যেন নিজের পায়ে না দাঁড়ায়। সেই চেষ্টাই তো করেছি এতদিন। ভুলতে তো পারি না এই রানীর টাকায় যাত্রাপার্টি করে ফেল হই, বিলাসীর টাকায় 'রঙ্গশ্রী' কিনি। ফেল হলাম। আমার ওপর ভরসা করে, চরিত্রের ওপর ভরসা করে এই সব অসচ্চরিত্রারা বসে ছিল দু-মুঠো আদরের অন্নের জন্য। আমি আজ আমার শর্ত পূরণ করতে পারবো না। এ যে কত বড় কষ্ট।"

আর বলতে পারে নি হেমন্ত।

চিনি সান্ত্বনা দিয়েছিল, "ওর চেয়েও বড় ঝড়-ঝাপট তোমার বুকের ওপর দিয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ গেছে। তুমি বরাবর আমার কাছে, আমার পাশে আছো চিনি। কোনো দিন, কখনও আমায় কিছু বলো নি।"

চিনি বলেছিল, "কোথায় গেল তোমার সেই ডাকাতি-স্বভাব। বিয়ের কনে লুঠ করে এনে বিয়ে করেছিল যে শক্ত ছেলে, কোথায় গেল সে ?"

হেমন্ত আকাশের পানে চেয়ে বলে, "ডাকাত বুড়ো হয়, ডাকাতি ছাড়ে না। ডাকাতের দেহ ছাড়তে মায়া নেই, দল ছাড়তে মায়া। তখন দল সঙ্গে করে ফিরেছি। আজ দেখতে পাচ্ছি এক-একখানা করে ইট সরে যাচ্ছে। তুমি জানো, কল্যাণী আমায় মুক্তি দিয়েছে। না বলে উধাও হয়ে গেছে। বলেছে ভাল মানুষের আশ্রয়ে গেছে, কোনো ভয় নেই। অথচ আর পাঁচটা মাসে এম-এ দিত।"

চিনি গায়ে হাত বুলিয়ে বলেছে, "বেশ তো। কল্যাণী বুদ্ধিমতী। সে যখন একটা ব্যবস্থা বেছে নিয়েছে, তোমার খুশী হওয়াই উচিত।"

"তা উচিত। কিন্তু আমার অপারগতা ওদের উৎসাহী করলো, এ কলঙ্ক পুরুষের সেরা কলঙ্ক। আমি কথার খেলাপ করলাম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলাম। দত্তাপহারী, পরস্বাপহারী—কি নই ?"

অমন বিপদে এমন ভেঙে পড়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু চিনির কাছে গোপনে যতটা বিচলিত হতো ততটা আমার কাছে হতো না; আর বাইরে অন্যান্য ব্যবহারে তো রীতিমতো সরস হাস্য পরিহাসে, লঘু কৌতুকে নিজের অবস্থাকে সঙ্গতভাবে স্বীকার করেই নিয়েছিল।

এমন সময়ে একদিন বসন্তর প্রেস থেকে আবার একটা বিল এল। তখন রঙ্গশ্রী বিক্রি হয়ে গেছে। হুটু আর নতুন মালিক দুজনেই এসে ভার নিচ্ছে। চাবির গোছা নিয়ে নামছে হেমন্ত। ঠিক যেমন করে কালিদাস একদিন নেমেছিল।

আশ্চর্য এই রঙ্গমঞ্চ। বুকের ওপর এক নায়ক রেখে এর তৃপ্তি নেই। যুগে যুগে নায়ক বদলায় এরা। যে যত মনোহর নায়ক, যার যত দীপ্তি তাকে তত নির্মমভাবে নিপাত করা এর স্বভাব। সীজারকে ক্লিওপাত্রা হত্যা করায় নি, আত্মঘাতী করায় নি, সীজারের সর্বনাশ টেনে আনে নি; কিন্তু আন্তোনী? আন্তোনী উচ্ছল, দুরন্ত, রোমক যৌবনের প্রাণময় পুরুষ। তাকে ক্লিওপাত্রা সর্বনাশের সীমায় নিয়ে এল। এও যেন তেমনি কুহকিনী। প্রৌঢ়-ব্যবসায় সর্বস্ব নায়ককে এরা পথে বসিয়ে হাসে না, কিন্তু সুদর্শন নট, কান্ত স্বভাব শিল্পী নায়ককে একেবারে শেষ করে ফেলায় এদের বড় তৃপ্তি। আজ মনে পড়ে যায় কালিদাসের মৃদু হাস্যোক্তি, "একদিন এমনি করে তোমাকেও নেমে আসতে হবে।" যেতে হলোও। আর রঙ্গশ্রীর পর্দা তেমনি বর্ণে বর্ণে ঝলমল করবে। নব নাগরের মন ভোলাতে রঙ্গশ্রী আরও সাজসজ্জা করবে। আলোগুলো আরও বেশী করে চমকাবে। গ্রীনরুমে আরও বেশী মিষ্টি কথার বন্যা বইবে, হুটু আরও প্রগল্‌ভ হবে, বুকিং অফিসে ভীড় কাতার মানবে না। রঙ্গশ্রী গলা ফাটিয়ে গান গাইবে "মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখি।"

কে মনে রাখবে এই হেমন্তকে?

যে আলনার গায়ে মালিক হেমন্তর সাজ ঝুলতো সেই আলনায় ঝুলবে অন্য মালিকের সাজ। রঙ্গমঞ্চের প্রাণ আছে, স্মৃতি নেই; চোখ আছে, অশ্রু নেই। রঙ্গমঞ্চ গ্রাস করে, কালী; সন্তান দেয় না; দুর্গা নয়। শেষ হওয়াটাই ওর বড় কথা। আরম্ভে ওর রোমাঞ্চ নেই। অবসানে ওর খিলখিল হাসি আছে।

এমন সময়ে আসে বসন্ত নিজে। হাতে বিল। প্রায় দু হাজার টাকার বিল। ললিত আর চারু সেন দাঁড়িয়ে। হেমন্ত সিঁড়ি দিয়ে নামছে। হুটু জিজ্ঞাসা করলো, "কি খবর বসন্ত।"

"আমার একটা বিল আছে"।

হেমন্ত বললো, "তোমার বিল আছে ভাই, আমার তো টাকা নেই।"

"নেই বললে তো আর ব্যবসায় চলে না দাদা।"

"চলে না তো কি করতে হয়?"

বাঁকা হাসি হেসে বসন্ত বলে, "তোমাদের মতো ব্যবসা গুটিয়ে দেউলে হয়ে বেরিয়ে যেতে হয়। আর নৈলে মার খেতে হয়।"

গম্ভীর হয়ে যায় হেমন্ত, "কত টাকা

বসন্ত বলে "দু হাজার টাকা।"

হেমন্ত চোখ কপালে তুলে বলে, "সে কিরে। তোর প্রেসের পাওনা টাকা তো সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেওয়া হতো। কাল অবধিও দেওয়া হয়ে গেছে। সেবার বিলের টাকার জন্য মার খেলি। মামলা করলি। তাও তো শোধ করলাম। আবার এত টাকা কিসের জমলো ?"

"যখন নতুন প্রেস কিনি তখন তোমরা দশ হাজার এ্যাডভান্স করেছিলে। সে টাকা আমি শোধ করে দিয়েছিলাম। তখন প্রতি মাসে হাজার টাকা করে দেবার কথা ছিল। আমি দশ মাসের জায়গায় বারো মাসে টাকাটা দিয়েছিলাম।"

"এ হিসেব বুঝি নতুন করে বেরুলো ? কিন্তু তার বদলে অনেকগুলো কাঠের টাইপ আমরা তৈরি করে দিয়েছিলাম। পুরো সেট্। সে যে ঢের খরচ করেছি রে ! তার দাম তো কাটি নি। তখন তো সেই কথাই ছিল।"

"কথায় ব্যবসা চলে না দাদা। চললে এই রকম চলে, যেমন চালিয়েছো। কতকগুলো কাঠের কি সব দিয়ে ভোজং ভাজং মেরে দু হাজার টাকা এ বাজারে আমি নষ্ট করতে পারবো না।"

হেমন্ত বললে, "তুই বলছিস্ তোকে ভোজং ভাজং মেরে টাকা ফাঁকি দিচ্ছি আমি ? বলতে পারছিস্—হ্যাঁরে প্রেস কে করে দিলো ?"

বসন্ত রেগে বললো, "সংসারটা থিয়েটার নয় দাদা যে হ্যাঁরে, ওরে করে কিছু এ্যাক্টো করলেই দায়িত্ব মিটে যাবে। টাকাটা দেবে, না আবার উকিলের কাছে যাবো।"

ন্টু বলে, "সবই যখন দিলে মেজোকত্তা ওরটাও ওকে দিয়েই দাও। ওরও তো টাকা। ও ছাড়বে কেন। ওর প্রেস থাকলে তোমারও একটা হিল্লে হবে।"

"কিন্তু টাকা যে আর নেই ন্টুদা। জানো তো তুমি !"

"জানবো না কেন ? আবার আছে তাও জানি।"

"সে টাকা আমি দিতে পারবো না। অধর্ম হবে।"

বসন্ত মুখ ভেংচে এক বিকৃতস্বরে বললো, "ওরে আমার ধার্মিকপ্রবর রে ভাইয়ের পাওনা দু হাজার টাকা না দিয়ে রাঁড়ের বাড়ি টাকা দিতে হবে, নৈলে ওঁর অধর্ম হবে। সুপুত্তুর আর কি !"

ন্টু ফিকফিক করে হাসে।

"টাকা কটা ফেলে দাও মেজোকত্তা। নৈলে জানো তো বসন্ত যে গোঁয়ার।"

হেমন্ত বলে, "তুমি জানো ন্টু এ টাকা আমার নয়। কেন দেব আমি ? তা ছাড়া এ টাকা বসন্তের পাওনা নয়।"

"নয় কি হয় পুলিসে খবর নিও। এখন আমি চল্লাম দাদা। দুর্গতির এখনও অনেক বাকী তোমার।"

চারু সেন মধ্যস্থতা করলেন। "টাকা আমি এখুনি হাজার দিচ্ছি। বাকী হাজার টাকা আমি দেব যদি কাঠের সব টাইপগুলো আমায় ফেরত দেন।"

"ফেরত দিলে চলবে কি করে? প্রেসের তো টাইপ চাই!"

চারু বলে, "কিন্তু ওগুলো তো আবর্জনা। আপনি রেখে কি করবেন?"

বসন্ত কোমল কণ্ঠে বললো, "এ থিয়েটারের পোস্টারেই ব্যবহার হয়। থিয়েটারই উঠে গেল তো কি হবে বলুন?"

"আমিও তো তাই বলছি, কি হবে ওগুলো। আমরা বরং যে প্রেসে কাজ করাবো সেই প্রেসে দিয়ে দিলে চলবে।"

"কেন? আমাদের প্রেসে কাজ দেবেন না?"

"কি করে বলবো?" একেবারে ব্যবসায়িক নির্লিপ্ততা চারু সেনের কণ্ঠে। "আমার তো আর ভায়ের প্রেস নয় যে রেট্ ইত্যাদি না দেখে না জেনেই কাজ দেবো। যেখানে সস্তা সেখানেই দেবো। এখন টাইপগুলো আমায় ফেরত দিন। আর দু হাজার টাকা নিয়ে যান্। নৈলে এক হাজার নগদ ও টাইপ নিয়ে দু হাজারের রসিদ দিয়ে যান্।"

"তারপর টাইপগুলো কার হবে?"

"আমাদের। হাজার টাকা যেমন হেমন্তবাবুকে দিলাম তেমনি টাইপ আমাদের হলো।"

"বেশ, আমি লিখে দিচ্ছি রসিদ। আপনাদের মতো ভদ্রলোকের কথা আমি ঠেলবো না। কিন্তু কাজ আমায় দেবেন।"

"না, বরং বলবো কাজ দেবো না!"

"কেন?"

"ভায়ের সঙ্গে যার এমন ব্যবহার, আমাদের সঙ্গে তার কেমন ব্যবহার হবে বেশ বোঝা যাচ্ছে। কৈ দিন, রসিদ দিন।"

হেমন্ত বললো, "এ কাজ গেলে ও খাবে কি চারুবাবু? আমার বৌমার বড়া কষ্ট হবে। ও যে কত বড় চামার আপনি জানেন না।"

চারুবাবু হেমন্তর দিকে চেয়ে বললো, "সত্যিকার আর্টিস্ট আপনি হেমন্তবাবু আপনার ভায়ের প্রেসে কাজ আমি দিতে পারবো না। আপনি অনুরোধ করলেও পারবো না।"

হেমন্ত বললো, "কিন্তু আমি অনুরোধেরও বড় কিছু করবো। প্রার্থনা

করবো। ও হতভাগা। ও তো জানে না কত ধানে কত চাল। ওর প্রেস যে এতকাল আমিই চালালাম সে কথা তো ও বিশ্বাস করে না।"

চারুবাবু কিছুটা ভেবে বললেন, "বেশ আমি রাজি। দু বছরের সব কাজ ওকে দেবো। লিখিত কন্‌ট্রাক্‌ট্ করছি। রেট্ বাজারের সবচেয়ে ভাল প্রেসের রেট্। বিনিময়ে—"

লাফিয়ে ওঠে বসন্ত, "বলুন আপনার শর্ত।"

"এখুনি এই কন্‌ট্রাকটের কমিশন দেড় হাজার টাকা, যা মুটুকে দিতেন, আমায় দিতে হবে।"

"কোত্থেকে দেবো ?"

"তবে যান্ হবে না।"

মুটু বলে, "কন্‌ট্রাক্‌ট্ করো হে, করো। মাস গেলে দুশো টাকা এখান থেকে। ছেড়ো না।"

"টাকা পাই কোত্থেকে ?"

চারুবাবু বলেন, "কেন আমি হাজার টাকা নগদ দিচ্ছিলাম, সেটা নেবেন না, আর পাঁচশো টাকার হ্যাণ্ডনোট হেমন্তবাবুকে লিখে দিন্।"

হেমন্ত বললে, "না, না, না। ওর টাকা আমি নিতে পারবো না। না-না-না সে কোনো মতেই হতে পারবে না। ওরে বাপরে, ওর টাকা। সে কথা শুনলে ওর বৌদি একেবারে চটে সাঁন্ করতে থাকবে। ওর টাকা আমি নিতে পারবো না। তার চেয়ে আপনি ওকে ওই দু হাজার দিয়ে নিয়েই রেহাই দিন: আমিও মুক্তি পাই।"

অমি হেমুদাকে জানতাম। ও যে ভায়ের টাকা নিয়ে বড়লোক হতে চায় না এ আমার জানা। কিন্তু সগ্য-সদ্য নিদারুণ অপমানের পরও যে ভায়ের জন্য এমন অনুরোধ করতে পারে দেখে একটু বিমুগ্ধ ধাক্কা খেলাম বৈ কি !

চারুবাবু লোকটাকেও মনে মনে প্রণাম জানালাম।

এদিকে আমার আর থাকা চলে না। তাড়া এসেছে দিল্লী থেকে। কতদিন লাগবে কে জানে।

হেমন্তর মেয়ের বিয়েটা একটা বড় কাজ। সেটা বাকী।

কিন্তু এখন দিন চলে কি করে ?

"মনে পড়ে বীরুর মৃত্যু ?" আমায় জিজ্ঞাসা করে হেমন্ত। "অমনি তিলে তিলে মৃত্যু আছে লিখন সকলের কপালে। রঙ্গমঞ্চ ভালবেসেছো কি মরেছো। পাকা ঘাগী ব্যবসায়ী হও, নটদের, নটীদের কখনও মাথা চাড়িয়ে উঠতে দিও না; টীম নিয়ে কাজ করে বাজার গরম করে যাও, আর বছরে অন্তত চারখানা করে বই

নিয়মিত নামাও, দেখবে রঙ্গমঞ্চ তোমার জোরে লক্ষ্মীকে বেঁধে রাখবে। আর একটি বইয়ের সাক্সেসের ওপর যদি মাসের পর মাস কাটিয়ে নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করতে চাও, তৎক্ষণাৎ সেই বইয়ের শিল্পীদের গোলাম হয়ে যেতে হবে। সত্যি কথা যে মঞ্চ-মালিকরা শিল্পী আর লেখকদের পেট ভরে খেতে দেয় না। কিন্তু এর চেয়েও নিষ্ঠুর সত্য এই যে শিল্পীরা এতটুকু সুযোগ-সুবিধা পেলে মঞ্চ-মালিককে সমূলে হত্যা করতে পিছপা নয়। ওরা নিজেরা উড়ন্ত পাখী। গাছ উপড়ে পড়ে গেলে অন্য গাছে আশ্রয় নেবে। এ জ্ঞান ওদের টনটনে। আমি কখনো ভুলবো না রে যে যদিও সমস্ত জীবন শিল্পীদের জন্যই প্রাণপাত করে গেলাম, তবু শিল্পীরাই আমায় পাত করে ফেললো।"

"এখন কি করবে?"

"এ দোর ও দোর ঘুরবো। এক-একটা নাইটে এক-আধটা শো পাবো। বাকুর মতো জীর্ণ হবো, হাত পাতবো।"

"আর ভরণ পোষণ? তোমার পুষ্যি তো কম নয়।"

"ওহে টাকা থাকলে ধর্ম ও বিলাস। না থাকলে অধম ও উপার্জন। ভোলো কেন? ওসব কর্তব্য ভুলে যেতেই হবে।"

কিছুতেই পাড়তে পারি নি আসল সেই কথাটা যে আমি হাঁড়ির খবর সব খবর জেনে এসেছি।

হঠাৎ ও বললো, "এত চট্ করে চুপসে যাবো না। আবার করবো যাত্রাদল। মঞ্চ নেই সেখানে যে গ্রাস করবে।"

"তবু তো গ্রাস করে।" আমি বলি।

"তা করে। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের কটাক্ষ, রঙ্গদীপের চমক এ সেন যাত্রায় নেই। যাত্রা যেমন গ্রাম্য, তেমনি যাত্রার মধ্যে গ্রামের লজ্জা-বিনয়-আত্মীয়তাটুকুনি আছে! রঙ্গমঞ্চ নাগরিকতার সব সেরা বাস্তু। এর বাঁধ ভীষণ বাঁধা। এর লোভ দুরন্ত লোভ।"

"ভালই হলো এ লোভ দূরে সরে গেল।"

"তা হয়তো গেল।" উদাস কণ্ঠে বলে হেমন্ত। তার পরেই গাড়িতে চড়ার হাতলটা ধরে প্লাটফর্মের বাইরের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে, "সেদিন যখন সব হিসেব-পত্র চুকিয়ে চাপরাসী-দারোয়ানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছি তখন তো আর কেউ ধারেকাছে নেই। হল্‌টায় গিয়ে ঢুকে একেবারে শেষের সীটের একটা কোণায় বসে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম স্টেজটাকে। কাঁচের শার্সী দিয়ে বাইরের আলো একটু একটু পড়েছে। বাতাস দিচ্ছে খুব জোরে। রাতও তখন একটার কাছাকাছি। খুব দুলছে পর্দাটা আর অন্ধকারে মনে হচ্ছে কে যেন

স্টেজে চলাফেরা করছে। যেন রানা প্রতাপ জঙ্গলে জঙ্গলে চিৎকার করে বেড়াচ্ছে, যেন আলাউদ্দীনের মৃত্যুতে কমলা দেবী খিলখিল করে হাসছে ; যেন মুটবিহারীর বাড়ি পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে আর 'তুই পুরুষে'র সংঘাত তীব্র হয়ে উঠেছে। দেখলাম সারি সারি চলে যাচ্ছে রডা, এ্যান্টিগোনস্, দুর্গাবতী, তারাবাঈ, রিজিয়া, সামদ্দেশ, সিপার—ওরা যেন প্রোসেশন করে যাচ্ছে আর বলছে 'তোমার আগেও ছিলাম, পরেও থাকবো। রইলে না কেবল তুমি। অর্দ্ধেন্দুশেখর, গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল, অমর দত্ত, দানীবাবু, রাধিকারঞ্জন, দুর্গাদাস, অপরেশ—কত দেখলাম, কত দেখলাম কুসুমকামিনী, তারাসুন্দরী, কৃষ্ণভামিনী, চারুশীলা, নিহারবালা, সারি সারি এল, হাসলো, চলে গেল। কত হাসি, কত কান্না, কত হত্যা, কত জীবন, কত বিবাহ, কত মৃত্যু।' দেখতে দেখতে হলে যেন বাতি জ্বলে উঠলো, যেন ঘর ভরে গেল দর্শকে। তাদের কত সাজ, কত পোশাক। তাদের চোখে কেবল খুশী, আনন্দ, বিস্ময়। আর, আর যেন সেই সময়ে পর্দা নড়ে উঠলো। অন্য কে যেন এসে মঞ্চের পর্দা সরিয়ে সকলকে অভিবাদন করে দাঁড়ালো। কে যেন ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো 'আমরা তাকে চাই—সেই লোকটাকে যে যাত্রাদল থেকে এসে—' আর সঙ্গে সঙ্গে যেন মঞ্চ উঠলো খিলখিল করে হেসে—'যে যায় সে আর ফেরে না। একজনকে নিয়ে এই চিরযৌবন কাটাবো, এ কি সম্ভব নাকি। ফুরিয়ে গেছে সে।' আমি তখন পেছনে বসে ঘামছি। ওর পর্দা আমার করানো, ওর অলঙ্কার আমার দেওয়া, কাল অবধি ঐ হাসি দিয়ে ও আমার মন রেখেছে। আজ? কে যেন আমার পাশে ব'সে। গাঁ থেকে এসেছে নতুন বৌ। তার পাশে তার স্বামী। কলকাতায় থিয়েটার দেখতে এসেছে। আমায় যেন তরুণ স্বামী ঠেলে দিলে। 'কেমন সীন্‌টা হচ্ছে দেখছেন না মশাই? ঘুমুচ্ছেন? আচ্ছা লোক তো। উঠে যান।' ওই মঞ্চ থেকেও অমনি পর্দা-ঢাকা, আলোর-মালা-পরা সুন্দরী বলে ওঠে 'উঠিয়ে দিন ওকে উঠিয়ে দিন।' গলা ধরে সব বার করে দিতে চায়। বলতে চাই 'ওরে শোন্ শোন্ আমি এখানেই, এদেরই...' বলতে দেয় না কথা। আমায় জোর করে ফেলে দেয়। সব আবার অন্ধকার হয়ে যায়। গ্রীনরুম থেকে গোকুল, নরেন, নয়ান বোস, জগন্নাথ, রহিম, দারাবক্স, চামেলী—এরা দৌড়ে আসে আমায় সাহায্য করার জন্যে। দেখে ফেলে যেন সেই সুন্দরী। বলে 'এখন তোরা আর ওর নোস্। ওদের ঐ গতি হয়।' আমি যেন সংবিত হারাই। বলি 'আমি তোমারও কেউ নই? কেউ নই?' তারপরে নিজের চিৎকারে নিজে ফিরে আসি বাস্তব লোকে। বাইরে তেমনি বাতাস, ভেতরে তেমনি অন্ধকার, তেমনি শার্সী-ফোটা আলোর ছায়া। তেমনি মহাশূন্য প্রেক্ষাগার। চলে এলাম। মনটা যেন দমে গেল। খুব দমে গেল। জানি এ সবই মস্তিষ্কের বিকার ; উত্তেজনার ফল।

তবু মনটা দমেই গেল। সত্যিই তো মঞ্চের দাবি মঞ্চ মিটিয়েছে। কিন্তু সখই শুধু নয়, জীবনেই শুধু নয়; অভিনয় যে আমার জীবিকা, রুটি। আমায় যাত্রা করার জন্যে আবার দল খোঁজ করার চেষ্টা করতেই হবে।"

হুইসল্ ধ্বনি দিলো। সবুজ নিশান উড়লো। হেমন্ত ঘাড় গুঁজে ফিরে চলে গেল। গাড়িও ছেড়ে দিলো।

পুরো গরমের পরেও ছুটি পেলাম না। শীত এসে গেল। মাঝে মাঝে খবর পাই। আবার পাই না। সুচারু-হোটেলের পরমেশই খবর দেয়। তার কাছ থেকেই জানতে পারি হেমন্ত যদিও কলকাতাতেই বাসা নিয়ে আছে, থাকে সে বাইরে বাইরেই। যখন যেখান থেকে যাত্রাদলের ডাক পায় গিয়ে ফুরনে কাজ করে আসে। দৈনন্দিনের কাজ; দৈনন্দিনের ফুরন। খুব রোগা হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলেও নাকি দেখা করে না।

যাত্রাদলে কাজ করলেও আগেকার মতো আর চিনিকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে না। যেমন আর পাঁচজন, তেমনিই সেও। যাত্রাদলে পালা সাঙ্গ করে বিদায়-পার্বণী নিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসে। কলকাতায় থেকে আবার কোথাও বায়না সংগ্রহ করে বেরিয়ে যায়।

এ জীবন ওর যে কত বিরক্তিকর, কত মর্মান্তিক তা বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু করবার তো কোনো উপায় নেই। দিনে দিনে ওরা ক্ষয় থেকে ক্ষয়ান্তরে নেমে যেতে লাগলো। পাড়া ছেড়ে বস্তিতে গেল। হেমন্তকে দুরন্ত হাঁপানী রোগে ধরেছে। চিনির সায়টিকা, সে একেবারে শয্যাগত।

শুনি, শুনি, শুনি।

আমার না গেলেই আর চলে না। কে ডাকে আমায়? চিনি, না হেমদা, না তাদের এই যাযাবর জীবনযাত্রার ছন্দ? আমি কোনো রকমে আরো বছরখানেক কাটিয়ে আবার কলকাতায় এলাম।

কিন্তু কলকাতাতে যে আমার জন্যে একটা নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছিল তা কি তখন জানতাম?

১২

চিনি যেন একটু লজ্জাই পেলো। আমায় যে কোনো কালে ওদের জন্য এসে বরানগরের কোণে এই বস্তিতে প্রবেশ করতে হবে এ কথা চিনি স্বপ্নেও ভাবে নি। আমি তো কোনা দিনই কলকাতায় এসে ওদের বাড়ি উঠতাম না। এবারেও উঠি নি। কিন্তু এবারই যেন ওর সংকোচ হলো বেশী।

"কোথায় তোমায় বসতে দিই এখানে ভাই ?"

আমি বলি, "যেখানে এতদিন বসেছি। তোমার আর হেমুদার মাঝখানে। বসার অভাব ? মন চাই গো ঠাকরুণ মন চাই।"

"মনও বুঝি আর থাকে না।"

"কেমন আছে হেমুদা ?"

"দেখলে বুঝতে পারতে। সে লোকই আর নেই। হাঁপানী, সঙ্গে ডায়াবিটিস্। রোগা হয়ে গেছে। রূপ নেই, অভিনয়ে ডাকও নেই। দূর দূর মফঃস্বলে যায়, টাকা আনে যেন হাড় গুঁড়ো করে বেচে। সে টাকা নিতে মনে হয় স্বামীর রক্ত বাটী ভরে নিচ্ছি।"

"মানুষের জীবনে উত্থান-পতন না থাকলে মানুষ মরে যেত। এই বৈচিত্র্য আছে তাই আমরা মরতে চাই না, বাঁচতেই চাই।"

"আমি মরতেই চাই।" বলে চিনি।

"কি ব্যাপার কি ? এত উতলা কেন ?"

"প্রতিমার খবর জানো ?"

"সে আবার কি ?"

"তার চাকরি গেছে।"

"কেন ?"

"মায়ের মুখে সে কথা নাই শুনলে। বড়টা ডুবেছে, এ ডোবালো। ভরা-ডুবি করালো।"

আমি খানিক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি।

"কিছুতেই ও নাম বলবে না। হয়তো এখনও বিয়ে দিতে পারা যায়। মনে হচ্ছে মনে মনে বিশেষ একটা মতলব আঁটছে। চিন্তা হয় কিছু না করে বসে।"

নতুন বিপদ। ভ্রূকুঞ্চিত হলো।

"হেমুদা জানেন ?"

"এখনও জানে না। জানাতেই হবে।"

ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "না, জানাতে হবে না। দেখি একবার প্রতিমা কি বলে।"

প্রতিমা কিছুই বলে না। খালি কাঁদে।

আমাকে কিছু বলা ওর পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু আমি আসার পর থেকেই প্রতিমার মধ্যে একটা ছাড়াছাড়া ভাব লক্ষ্য করতে লাগলাম। যেন আমি এসে পড়ায় ওর অনেকটা দায়িত্ব কমে গেছে। যেন ও বেশী সময় পেয়ে গেছে ভাববার। যদিও বাড়িতে থাকে না বেশী, তবুও আসে-যায় ঠিক সময়ে।

সন্ধ্যের পর প্রতিমার কথা ভাবতে ভাবতেই কখন চলে এসেছি বেলুড়। সন্ধ্যের আরতি দেখছি। তার মধ্যে হঠাৎ আবিষ্কার করি প্রতিমা। আরতি-গান শেষ হবার পর মেয়েটাকে একবার জোর করে ধরতে হবে। জানতে হবে সব কথা। তারপর একটা বিলি-ব্যবস্থা করা যাবে। ভাবছি আর আরতি-গানে ব্যস্ত আছি।

হঠাৎ দেখি প্রতিমা নেই। কেন যেন মনে হলো আমাকে দেখেই ও ইচ্ছে করে গা ঢাকা দিয়েছে।

ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ি। একেবারেই অকারণে পুলের দিকে না গিয়ে স্টেশনের দিকে যাই।

স্টেশনে কেউ নেই।

লাইন ধরে চলেছি ওধারের লেভেল ক্রসিংটার দিকে। তারপর বাজার ঘুরে বাস্ ধরবো বা রিক্সা একটা। কোথায় গেল মেয়েটা।

হঠাৎ একটা ভাবনা ধরলো।

জোর হুইস্‌ল পড়লো গাড়ির। তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে একখানা এক্সপ্রেস ট্রেন দৌড়ে আসছে হাওড়া থেকে। সেই আলোর গায়ে কালো এঁকে লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে কে !

প্রাণপণ দৌড়ে ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে ফেলে দিই অপর দিকে।

পড়ে গেল। লাগলোও। কিন্তু লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই তাকে আমি ফেলে দিতে পেরেছিলাম।

যদিও সমস্ত ব্যাপারটা করার মধ্যে আমার মনের অবচেতনে সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিল প্রতিমা, ভাবতে পারি নি মেয়েটি প্রতিমাই।

গোলমালে লেভেল ক্রসিং থেকে লোকজন এসে পড়লো।

আমার মেয়ে শুনে কেউ কিছু বলে নি। কেবল বকতে লাগলো অন্ধকারে এ পথ দিয়ে আসার জন্য। হোঁচট খেয়ে এধারে না পড়ে ওধারে পড়লেই তো গিয়েছিল আর কি!

জ্ঞান ওর পুরো হতে ওকে রিক্সায় করে আবার ফিরলাম বেলুড় মন্দিরেই।

ঘাটের ধারে নিরিবিলি দেখে বসি।

তখন ধীরে ধীরে বলতে থাকি, "ভয় পাস না প্রতিমা, আমি, সোমকাকা। মরতে চাস্ মরে যা। দুনিয়া জানুক মরে গেছিস্ তুই। কিন্তু মরিস না। আমি তোকে ঘর বর সব করে দেবো। বিশ্বাস হয় তোর আমাকে?"

কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল প্রতিমা!

চল্ আমার সঙ্গে···এমন জায়গায় নিয়ে যাবো যে এক যম ছাড়া আমাদের দুনিয়ায় কেউ খুঁজে পাবে না।···তারপর সেই আশ্রয়ে থেকে যখন ভাল হয়ে যাবি, তখন মা-বেটায় মিলে পরামর্শ করে যা করবার করবো। এমন করে দু-দুটো প্রাণ হত্যা করা কাজের কথা নয়। তাছাড়া তোর বাপের কথা ভাব।"

হুহু করে কাঁদতে থাকে প্রতিমা।

খানিক পরে ট্যাক্সি করে এলাম শ্যামলীদের বাড়ি গিরিশ পার্কে।

আমার সঙ্গে টুকটুকে তরুণী মেয়ে দেখে বিলাসীর কপালে চোখ উঠেছে।

তাড়াতাড়ি বলি, "আমার মেয়ে গো মাসি। আমার মেয়ে। এই ওকে রেল-লাইন থেকে কুড়িয়ে আনছি। মরতে গিয়েছিল।" তারপর ধীরে সুস্থে একে একে সব ঘটনা বললাম। কেবল আসল পরিচয়টি গোপন করে গেলাম। বললাম, "একে গোপনে রাখবে একটা মাস। তারপর বাচ্চা হবার পর যা হবার হবে।" এত সব কথার মধ্যে প্রতিমা একেবারে জড় হয়ে গিয়েছিল। কোনো কিছু বলতে পারল না। এখনও সে শ্যামলীর বুকের মধ্যে থরথর করে কাঁপছে।

বিলাসী, রানী বা শ্যামলী কেউই আমার প্রস্তাবে 'না' বলতে পারে নি।

কিন্তু আমায় ফিরতে হবে বরানগরে। সেখানে আজ আসবে হেমন্ত। চিনি অপেক্ষা করে আছে তার। এসেই প্রথম ডাকবে 'প্রতিমা'। সাড়া পাবে না। তখন চিনি কি বলবে তাই এখন প্রধান প্রশ্ন।

কিন্তু খুব ছটফট করলো না হেমন্ত। যা ভাবা গিয়েছিল সে তুলনায় কিছুই করলো না। শুধু বললো, "ছেড়ে চলে গেল? একটা মরে গেল, একটা ফেলে গেল? ভালই করলো; তাই না, বলো না হে।"

আমি বলি, "বড়সড় হয়েছিল। যা হোক লেখাপড়া শিখেছিল। তোমাদের এত কষ্ট যদি দেখতে না পেরে থাকে, অন্যায় কি?"

"কিন্তু ভাবছি ও তো ছেলে নয়।"

"আজকাল মেয়েও ছেলেই, যদি বিপথে না যায়।"

"বিপথে যাবে না। সে মেয়ে নয় ও। কিন্তু মেয়ে-খোঁজা পৃথিবীর একটা তলার ভাড়াটে আমরা। ওদের যে কত ফন্দি-ফিকির। কিন্তু ভেবে কি করবো?"

অদ্ভুত আচরণ চিনির। ওর যে মেয়ে ছিল সে পরিচয়ই রইলো না যেন। কেবল মুখ গুঁজে স্বামীর সেবা করে যায়।

আমি বলি, "খোঁজ করি প্রতিমার, কি বলো!"

চিনি বলে, "না! অমন মেয়ের খোঁজ আমি করবো না।"

চিনির দিকে চেয়ে বলে হেমন্ত, "বাসা বাঁধতে চেয়েছিলে। পাখীর বাসা আমাদের গো, পাখীর বাসা। বছরে বছরে এক-এক জায়গায় বাসা। গড়া বাসায় অন্য পাখী বসে। নতুন বাসা গড়ে নিতে হয়। এ বছরের ডিম ফোটানো বাচ্চা-গুলো উড়ে চলে যায় কোথায় কেউ জানে না। আবার নতুন বাসা, নতুন ডিম, নতুন আশা,—আর পুরোনো বিফলতা, নৈরাশ্য। ওরাই আমাদের চিরকালের সাথী। লোকে কথায় বলে পাখীর প্রাণ। আমি তো দেখি পাখীর প্রাণের চেয়ে শক্ত প্রাণ আর নেই। থাক সোমবাবু থাক, খোঁজ নিও না। সময় হলে ও নিজেই আসবে।

চিনি মর্মছেঁড়া শান্ত স্বরে বলে, "ও আর ফিরবে না। না ফিরুক।"

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে হেমন্ত, "কেন বলো তো?"

"তোমাকে ফেলে যে মেয়ে স্বার্থপরতা দেখালো, সে নীচ। তার স্বভাব মন্দ। সে তার সব কর্তব্য খুইয়েছে। তার ফেরার আশা আমি করি না।"

তবু হেমন্ত, আমি চুপি চুপি খোঁজ করি। আমি জেনে খোঁজ করি, হেমন্ত না জেনে।

অবস্থা খুব খারাপ দেখে একদিন গেলাম মহেশদার কাছে। মহেশদা বললেন "দেখি দু-একটা নাইট্ আনা যায় কিনা।"

যখন মহেশদা এসে কথাটা পাড়লেন আসছে সপ্তাহে মিনার্ভাতে দুটো শোতে 'বঙ্গে-বর্গী' আর 'প্রতাপাদিত্য'তে ওর অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন তখন হেমন্ত যেন ভেঙে পড়লো, "না, না, মহেশদা। এই যাত্রার দলে ঘুরে ঘুরে যা পাই এই আমার যথেষ্ট। আবার ঐ মিনার্ভায় গিয়ে দাঁড়াবো, হাত পেতে টাকা নেবো। ঐ নুটু বসন্ত এরা সব থাকবে। এ আমায় কেন অপমানের মুখে ঠেলছো দাদা? এই শাক-অন্ন আমার ঢের ভাল।"

মহেশদা জোরই করলেন। কাজেই ওকে যেতে হয়েছিল।

সে যাওয়া হয়েছিল ওর পক্ষে মর্মান্তিক।

ও যেতে চায় নি, কারণ ওর নিদারুণ ভয় ছিল পরিচিতদের কাছ থেকে অনিবার্য অবহেলা। ও বলতো "'ফুরায় যা দিস্ ফুরাতে',—জানিস্ সোম, নেচারে উঠতি পড়তি একটা ধারা, নিয়ম। তা নয় কিছু। আমি পড়া থেকে উঠেছি, আবার পড়ছি। ওতে দুঃখ নেই। পোড়া পেট আর জলন্ত সত্য এ দুটো যদি কাছাকাছি রইলো, মানুষ করে না কি, ভোগে না কি! দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বীতস্পৃহ—এই তো হতে হয়। দুঃখ কি?...তবু ভয় হয়।...গাঁয়ে গাঁয়ে পরবাসী ভিন্ দেশী লোকদের চোখে অপরিচয়ের উপেক্ষা দেখলে মনে লাগে না রে, 'কিন্তু যাদের চাটুবাক্যে একদিন মনের শানে পালিশ লেগেছে, তাদের কাছ থেকে উপেক্ষা বাধে। ভয় লাগে। মানুষের ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি ভাই,—সেই ভয়।"

তবু সে কথা শোনেন নি মহেশদা। এমনই দুর্দিন তখন, মহেশদা জোর করেই প্রায় ওকে পাঠিয়ে দেন মিনার্ভায়।

আর সেই গল্প শুনি আমি।

"সেই মিনার্ভা, যেখানে একটা সন্ধ্যা নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি দাঁড়াতো দোরে বিকেল থেকে। আমি তো ট্রামে এসে ঐ পথটুকু হেঁটেই পার হলাম। ভাবলাম যদি কেউ দেখে কি বলবে। কেউ দেখলো না। বললো না। সে তখন আর এক অভিমান। সিঁড়ি বেয়ে উঠছি। দরোয়ান বলে, 'ক্যা মাংতা বাবু।' চমকে চাই। কিন্তু বুকিংয়ের লোকটা বোধ করি চিনেছিল। একবার ঘাড় উঁচু করে চেয়ে বলে, 'ঠিক হ্যায়, জানে দেও।' আমাকে বলে, চলে যান ওপরে। টুক-টুক করে উঠি না, যেন ঠকঠক করে কাঁপি। বুড়ো হয়েছি রে। ভেতরে ভেতরে জরে গেছি। বেঁচে গেলাম মাঝপথে কানু। আমার সাজকর। তাড়াতাড়ি গড় হয়ে প্রণাম করলো, যেন আমায় দিল্লীর মসনদ লিখে দিলো। সে সান্ত্বনা আর ভরসার তুলনা নেই। সসংকোচে বলে আমায় 'আলাদা ঘর তো খালি নেই মেজোকত্তা।"

"চমকে বলি 'এ্যাঁ?' আর সামলে নিই। বলি, 'তা যেখানে নেবার নিয়ে চলো।' তুলসী কোথায়? তুলসীই আমার নেমন্তন্নটা কবুল করেছিল।

"কানু বিরক্ত মুখে বলে, ছাড়ুন ছাড়ুন মেজোকত্তা। চলুন আমার ঘরে। টপ্ করে সাজ করে দেবো। কেউ জানতে পাবে না। স্টেজে চেয়ার এনে দেবো। বসে থাকবেন। ওদের কি জ্ঞানগম্যি আছে। তুলসীর খোঁজে দরকার আছে মেজোকত্তা?"

"সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন; তুলসীর কাছ থেকেই যে টাকা পাওনা। সেই টাকার মধ্যে লুকোনো আমার মৃতসঞ্জীবনী। তুলসী নৈলে তখন আমার চলে? তবু বলি, থাকগে, কি হবে তুলসী, চল্ যাই।

"কিন্তু যাবো কি! যাবার মুখে সারি সারি খুপ্‌টি ঘরগুলোর মধ্যে এ-ও-সে বসে আছে। আড্ডা চলছে। রসভারসমাকুল শিল্পকেন্দ্র-কলাকেন্দ্রে নন্দনকলার খোসারা হাসিতে রঙ্গতে ভরপুর। আমি মাথা নীচু করে চলে যাচ্ছিলাম, কারণ রাজীবের গলা আমার খুবই পরিচিত। কিন্তু সাধ্য কি এড়িয়ে যাই। কুম্ভীপাক নরকে ঢুকবো অথচ কামড় খাবো না, সম্ভব কি? ডাক এল ঘরের মধ্য থেকে 'আরে কে, কে—মেজোকত্তা না!' আর একজন দৌড়ে এল ডাকতে, 'রাজীব বাবু ডাকছেন।' আমি মরমে মরে ফিরছি। ওঘর থেকে উপহাসমিশ্রিত হাসির বন্যা তরঙ্গে তরঙ্গে আছড়ে পড়তে লাগলো।

"সে হাসি তত বাধে নি, কিন্তু আমার ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে হাসি হঠাৎ থেমে যাওয়াটা ভীষণ বাধলো। জল জল করছে আলো। গেলাস, বোতল, বরফ সবই আছে। আছে চায়ের বাটী, খাবার প্লেট, সিগারেটের ছাই-ভরা ট্রে। আর আছে টেবিলে পড়ে আমার দেওয়া সেই সোনার সিগারেট কেসটা।

"সেই কেসটা খুলে রাজীব দেয়, 'একটা ইচ্ছে হবে নাকি?...নাও। বসবার চেয়ারের বড্ড অভাব।' আমি বলতে বাধ্য হই, তা হবে। ছোট ঘর কি না। কেমন আছেন।

'যেমন রেখেছো' বলেন কায়দা করে। 'ঘর ছোট নয় মেজোকত্তা, ছোট লোক আমরা। চোয়াল নাচিয়ে খাই।...সুরূপাও আছে এই পার্টেতেই। যাবার আগে দেখা কোরো।...তারপর তোমার যাত্রা কেমন চলছে। কিছু হচ্ছে-টচ্ছে? ...নাও, নাও সিগারেট নাও। ভাল জিনিস। পাঁচশো পঞ্চান্ন। আর কেসটিতো তোমারই দেওয়া।...হাসতে হাসতে বলে, আবার ফিরে চেও না যেন।'

"আর মিনিট কয়েক পরে প্রেমের আর প্রেমিকের অভিনয় করতে হবে আমাকে। শৈবলিনী সুরূপা। ডাকবে আমাকে 'প্রতাপ' বলে; আমাকে বলতে হবে 'শৈ নদীতে কতো জল?'...দর্শকরা আমার প্রেম-গদগদ কণ্ঠ শুনে মুগ্ধ হবে, কাঁদবে, বলবে নাট্যকলা শিল্পীদের জীবন সর্বদাই এই প্রেম-দোলায় দুলছে। তারা মুহূর্তে মুহূর্তে নন্দিত।...নমস্কার করে চলে যাই।

"ঢোকবার আগে যেমন হাসি, বেরুবার পরে তেমনি হাসি। পড়েই যেতাম। কিন্তু অনিবার্য কানু দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ধরে ফেলে আমায়। বলে, চলুন মেজোকত্তা, সাজঘরে যাই।

"কানু আমাকে সাজাতো আমার নিজস্ব সাজঘরে। একা একা পরম সমাদরে শিল্পীর মতো করে সাজিয়ে তুলতো আমাকে। তাতে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসাও যেমন থাকতো, তেমনি থাকতো ওর শিল্পী মনের মূল্যহীন দুর্লভ তৃপ্তি।......আর সে সাজঘর নিখিলের হাট যেন। যে যা খুশী বলছে, কইছে। বিড়ি টানছে,

কাশছে, গাল-পাড়ছে, লটারির টিকিটের লেন-দেন করছে, আবার এক্‌ট্রেসদের সম্বন্ধ টেনে মোটা রসিকতা করছে বেহায়াপনার চত্বরে নেমে এসে। তারই মধ্যে একটা কোণে একটা ছাড়া-কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে ওরই মধ্যে একটু একান্ত রচনা করে কানু, আমার মাথায় চুলটা পরিয়ে দেয়। তখনকার দিনে পরচুলো লাগতো না আমার। কিন্তু পাকা চুল আর টাক নিয়ে তো যুবকের পার্ট করা চলে না। জামা কাপড় বদলে সাজ করে বেরুলাম। আরশীতে মুখ দেখলাম। নিজেরই মনে হলো প্রতাপ মরে গেছে। এ প্রতাপকে শৈবলিনী ভালবাসতে পারবে না।

"পারলো-ও না। নিঠুর-নির্মম ঐ মঞ্চ, ঐ প্রেতিনী। ও জানে না সততা, জানে না নিষ্ঠা। মাটির মত চুপ করে থেকে, দাঁড়িয়ে থেকে সয় না। লক্ষ বছর পরে ফিরে-আসা সন্তানকে তেমনি অটল করে বুক পেতে দেয় না। জলের মতো চলে যায়, সরে যায়। দাঁড়ায় না। পুরোনো নদীকে চিনি, জল দিয়ে নয় রে সোম,—ঘাট দিয়ে। চলা দিয়ে নয়, স্থির দিয়ে। মঞ্চ-চলা প্রেতিনী। নাটক দিয়ে এর ঘাট চেনা যায়। নাম দিয়ে এর রূপ ধরা পড়ে। নৈলে মানুষ-জন, দর্শক-নট সব ভেসে যায় রে ভেসে যায়। একালের বৌ কালী, মহাকালের শ্মশান-নায়িকা মহাকালী।

"সেই কালী অট্ট অট্ট হাস্তে হেসে উঠলো খটখট করে। সেই কণ্ঠ নেই, সেই বয়স নেই। চন্দ্রশেখর নাটক আছে, প্রতাপ-শৈবলিনী নায়ক-নায়িকা আছে, আছে চিরন্তন প্রেমের চিরন্তন গান। চিরন্তন দর্শক আছে। তাদের প্রীতি, রীতি সব আছে। নেই আর হেমন্ত। যে হেমন্তের তপ্ত যৌবনের কণ্ঠস্বরে প্রেক্ষাগার থেকে চাপা নিঃশ্বাস গুমরে উঠতো সে যে মৃত। রূপ নেই, স্বাস্থ্য নেই, যৌবন নেই। প্রেতিনীর খর্পর ভরে গেছে জীবনের রসে। সে রস পান করেছে শেষ বিন্দু পর্যন্ত। আর কি আছে বাকী।

"প্রেক্ষাগারে এখন পিপাসা। আমি ছোবড়া। তাদের কণ্ঠ ভেজে না, মন ভরে না। কাজেই তারা টিট্‌কিরি দেয়। সিটী বেজে ওঠে পেছন থেকে। সামনে বুকের কাছে স্বরূপা ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, নিজে ডুবলে, আমাকেও ডোবালে। আবার চেঁচাই 'শৈ নদীতে কত জল।' সঙ্গে সঙ্গে দু-তিন দিক থেকে অনুকরণের রঙ্গ ওঠে 'শৈ কত জল ?' কেউ বলে, "বেশী হলে কি ডুবতে না ?" একটা গোলমাল।

"মঞ্চের স্থির যৌবন প্রৌঢ় পতিত্বকে শয্যা থেকে নির্বাসিত করলো। আমি ভেতরে এসে কানুকে বলি, জল দে!

চাইলাম জল। এল জল।

"এটা যে কায়দা নয় সবাই জানতো। কিন্তু চা-খাবারের বরাদ্দ বড় শিল্পীদের জন্যই। সেদিন আমার কিছু নেই।

"অথচ মফঃস্বল থেকে সোজা গেছি। খাওয়া হয় নি সারাদিন। চিনি বলেছিল খেয়ে নিতে। ভাবলাম যাচ্ছি অতবড় জায়গায়। খেতে তো দেবেই। বাঁচুক ঘরের খাবারটা। মিছে বলেছিলাম চিনিকে যে খেয়ে এসেছি। তখন যেন সাগর-ক্ষিদে পেয়েছে। বুক শুকিয়ে কাঠ।"

এইভাবে বলে চলে হেমন্ত। আমি শুনি।

মিছে কথা বলেছে চিনিকে। পয়সা বাঁচাবার জন্যে মিছে কথা বলেছে। তবু চিনি চারটি চিঁড়ে ভিজিয়ে খাইয়ে দিয়েছিল একটু। পকেটে পয়সা নিয়ে তো বাড়ি ঢোকে নি যে চিনি তার বেশী পারবে। লক্ষ্য করেছে হেমন্ত চিনি গোপনে তার পকেটে হাত দিয়ে দেখলো। জিজ্ঞাসাও করেছিল "হ্যাঁগো, টাকা পাও নি, যাত্রা করে এলে ?" তার উত্তরে হেমন্ত মাথা নেড়ে বলেছিল, "হ্যাঁ, টাকা দিয়েছিল তারা।" ব্যাস্, তার বেশী বলবার দরকার ছিল না চিনিকে। চিনি জানে সে টাকা কোথায় যায়। কিছু বলে না। বলে নি কিছুই। হেমন্তর বরাদ্দর টাকা প্রথমে যেখানে যাবার তাই যাবে ; তারপর চিনি। তাই চিনির ভাঁড়ার শূন্য।

শূন্য পকেট, শূন্য পেট। থিয়েটারে সম্ভাষণ যা পেলো তাতে সে শূন্যতা আরও হাহাকার করেছিল। খিদের মাথা ঘোরে। ঐ কানু এনে দেয় চা। সরকারী এক কাপ চায়ের বরাদ্দ। কানুই বলেছে "ও থাক মেজোকত্তা, এই যে আমি চা দিলাম তাই খান। ও পাঁচমিশিলি আপনার চলবে না।" বরাদ্দর চা অবশ্য ওকে কেউ দিতেও আসে নি, পেলো কি না পেলো খোঁজ তো করেই নি।

অপমানে, ক্ষুধায়,—আর সবার চেয়ে বেশী সেই নীরব আত্মাবমাননার জ্বালায় অভিনয়ে প্রাণ দিলো না। প্রেক্ষাগার ভরাট হয়ে গেঁজিয়ে উঠলো হাসি, টিটকিরি, প্রগল্‌ভ বিষোদ্গার।

মঞ্চের উইঙ্গের পাশেই রাজীব সাদা পাগড়ি বেঁধে দাঁড়িয়ে। হেমন্ত মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যেতে চায়। রাজীব কি কে দেখে না। রাজীব ঘাড় ফিরিয়ে তাকে বলেছিল, "অভিনয় ভুলে গেলে নাকি হেমন্ত। শেষ অবধি চোয়ালের নাচই বেঁচে থেকে দেখছি। হ্যাঁ, হে, পতন মানেই মূর্চ্ছা নয়, ভুলে গেলে নাকি ?"

হেমন্তর মৃত্যু হলো যেন।

সেই দিনই ওদের বাড়িতে আমাতে হেমন্ততে দেখা। পরের ঘটনাও তারই মুখ থেকে শোনা।

সেই কাল-অভিনয় থেকে ফিরে যাবার আগে আশা করেছিল ওর প্রাপ্য পঞ্চাশ টাকা নগদ পাবে। বাড়িতে চিনি পথ চেয়ে বসে আছে। কিন্তু কানুকে

পাঠিয়ে যখন ও শুনলো ম্যানেজারের ঘরে চাবি দেওয়া, তিনি বেরিয়ে গেছেন, তখন ধীরে ধীরে একা একা গেট ধরে ও বেরিয়ে এসেছিল।

গেটের বাইরে বীরু! ও নিজেদের মঞ্চে অভিনয় সেরে হেমন্তর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ছুটতে ছুটতে আসছে।

এসেই বীরু বললে, "ওকি হেঁটে যাচ্ছো? ওরা গাড়ি দেয় নি?"

হেমন্ত মাথা বেঁকিয়ে বলেছিল, "গাড়ি? ওরা তো কিছুই দেয় নি ভাই!"

"কিছুই দেয় নি? মানে? এ সবের অর্থ কি?" বীরু চেঁচায়।

হেমন্ত তাড়াতাড়ি বলে, "ছি, ছি। এখানে গোল করো না। চলো চলো। এগিয়ে যাই।"

সেই মিনার্ভা কেবিন। সেই বীরু আর হেমন্ত।

"খাও নি কিছু তুমি। চলো কিছু খাওয়া যাক।"

"চলো। আজ তোমার পকেটে আছে, আমার পকেটে নেই।" ম্লান হেসেছিল হেমন্ত। বীরু ওকে নিয়ে বসিয়েছিল কেবিনে।

কিন্তু বীরু যখন সেই রাজভোগ আনিয়ে ওর ডিসে রাখলো তারপর থেকে ও আর মাথা তুলতে পারে নি। ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরার পথে সব কথা বীরুকে বলে। তারপরে যখন চিনিকে আর আমাকে শোনায়, আমি বলি "কাল আর অভিনয়ে যেও না তুমি!"

হেমন্ত বলে, "তা হয় না। পোস্টারে নাম ছাপার পর আর্টিস্ট যদি অন্তর্হিত হয় তার যে কী যন্ত্রণা তা ভুক্তভোগী হয়ে আমি ভুলবো কি করে ভাই?"

অভিনয় ও সাঙ্গ করলো। বীরু গিয়ে অসম্ভব হৈ চৈ করায় দুদিনের একশোটা টাকা আদায় হয়েছিল। তা থেকে পঞ্চাশ টাকা ওর হাতে দিয়ে চিনিই বলেছিল, "অত ছটফট করছো কেন। তোমার নেশার জায়গায় ঘুরে এসো। বেশী রাত কোরো না। ফিরে এলে তিনজনে বসে খাবো। আজ সোমকেও খেতে বলেছি।"

সেদিনও আমি দেখলাম, পঞ্চাশ টাকা হাতে করে হেমন্ত তার নেশার জায়গায় চলে গেল।

১৩

হেমন্তর নেশার জায়গা কোথায় ও কেন তা আমি জানতাম। আমার ইচ্ছে হতো হেমন্তকে বোঝাই—আদর্শ আর সততার খাতিরে আত্মহত্যা কোনো কাজের কথা নয়। বিশেষ করে যে দুনিয়ার জীব ওরা, সে দুনিয়ায় দুই-চিতে রসাতলে গমন লেগেই আছে। সুতরাং কবে কার টাকা নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছে, সেই ব্যবসা নষ্ট হয়েছে বলে তাকে তার টাকা ফেরত দেবার দায়িত্ব, চিরজীবন তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব, কবে কোন্ কর্মচারী মুসলমানের স্বৈরাচার-জাত সন্তানকে আশ্রয় দিয়েছিল, তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব, এ সব তো হলো ধোঁয়া, এক ধরনের স্বপ্নবিলাস। এ সব নিয়ে ওকে বোঝানো যেতে একেবারে পারতো না তা তো নয়। কিন্তু ওর প্রকৃতিটি বিশেষ একটা ধাতুর তৈরী। অন্য জাতের ও অন্য চরিত্রের। চিনি হেমন্তকে ভালবাসে; তার মানে ওর চরিত্রকে ভালবাসে। চরিত্রকে ভালবাসাই তো ভালবাসা। মাতাল, লম্পট দেবদাসকে পার্বতী ভালবাসতো; পার্বতীই দেবদাসের চরিত্রটাকে বুঝতো। তাই আমার সাধ্য হয় না, সাহস হয় না এ কথা নিয়ে কেনো আলোচনা উত্থাপন করি।

ওর রোজগার, ওর উৎসাহের পেছনে প্রেরণা এই সুকঠোর দায়িত্ব। আমি নিজে চিনিকে কেন কারুকেই, নিজেকেও বলতে পারতাম না ওর জীবন-কাব্যের এই অধ্যায়টার কথা। কে বিশ্বাস করবে "গাঁজা টিপে দিই খাই না!" বলে উপহাসাস্পদ হবে বৈ তো নয়। কে বিশ্বাস করবে যে গণিকালয়ে একাধিক গণিকাকে মাসিক বরাদ্দর টাকা দেবার পরেও কলকাতার শহরের নটকে লোকে বলবে ঐ পণ্যনারীরা তার রক্ষিতা নয়! এমন অসম্ভব সম্বন্ধকে স্বীকার করতে গেলে যে আদর্শবাদকে সহ্য করতে হয় নগরতাপিত অসহিষ্ণু স্নায়ুতে তা সম্ভব নয়। লোক তাকেই বাস্তব বলে জানে যা তাদের অভিজ্ঞতায় এসেছে, আর অভিজ্ঞতা নির্ভর করে বোধশক্তি, অনুভব শক্তি, গ্রহণ শক্তির ওপর। এ শক্তিগুলো কি সবার সমান? অভিজ্ঞতার কি কোনো মাপাজোপা ছক আছে? তাই বাস্তব যথার্থ, জীবন বলে যাকে আমরা মানতে চাই তা বড় সংকীর্ণ, ছোট। সেই ছোট দিয়ে হৃদয়ের পারাপার, মনের বিশালতা মাপবে কে?…আমার সাহস হয় না আমি এ কথা নিয়ে ওকে কিছু বলি। সব সম্পদ ওকে ছেড়ে চলে গেছে আজ। ওর বড় সম্পদ স্বাস্থ্য, রূপ আর কণ্ঠস্বর। নট-জীবনের সব চেয়ে বড় সম্পদ। আর

ওর দৃঢ়, সবল, আলোভরা বুক! আদর্শের আলো! সে সবের আজ আর কিছু নেই। রেসের ঘোড়া মুনিসিপ্যালিটির ময়লা-গাড়ি টানছে! এক সম্পদ আজও আছে ওর বাকী! সে ওর এই রুদ্ররূপী আদর্শবাদ। এটাকে নাড়াচাড়া করতে সত্যিই নিদারুণ ভয় পাই।

তবু তো ও'কে কিছু করতে হবে। ওর জন্য কিছু করা চাই। কাশী থেকে ওকে চিঠি লিখলাম—

"প্রিয় হেমুদা,

এবার কলকাতা থেকে ফিরে এসে পর্যন্ত মন স্থির নেই। একদিন বেলুড় মঠের চাতালে বসে আমাদের যে জল্পনা চলেছিল বারবার তার কথাই মনে পড়ে। তখন তো বয়েস ছিল। যা ছিল সবই সামনের আকাশে। ঘাড় তুলে চাইলেই উদয়ের আভাস পেতাম। এখন যে সূর্য পশ্চিম দিকে। এখন আর সে স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। আদর্শবাদী মরে যায়, আদর্শ মরে না। স্বপ্নবিলাসী মরে, স্বপ্ন চোখ থেকে চোখে ঘুরে বেড়ায়। তুমি মরো, আদর্শকে যেন মেরো না। আমি তাই চাই।

তবু তো এ ভাবে মরা চলবে না। তোমার অনেক দায়িত্ব আছে। সে সব দায়িত্বের পেছনে আছে তোমার পৌরুষ। আমি জানি সেই পৌরুষকে আশ্রয় করেই আজও তুমি যুঝে চলেছো। আমি চাই এখনও তোমায় আমি বাহবা দিই, সাবাস দিই; এখনও বলি 'এগিয়ে চলো, ভেঙে পোড়ো না।'

কিন্তু কি নিয়ে বলি, কি জোরে বলি? শুনবে কি তুমি? আমি যদি তোমায় টাকা দিই? নেবে তুমি? ধার বলেই নিও। তুমি সে টাকা খাটাতে পারো। এত টাকা পারবো না যে রঙ্গমঞ্চ কিনে চালাতে পারো। কিন্তু কাজে লাগলে আমি দিতে পারি। আগে ছিল না। থাকলে দিতাম। এখন জুটেছে দিতে পারি। একেবারে তুমিও নেবে না, আমিও দেবার প্রস্তাব করছি না। কিন্তু আমি অনুরূপ বিপদে পড়লে কি তুমি আমায় টাকা দিয়ে বাঁচাতে চাইতে না? আমি বড় ব্যস্ত। নিজে যেতে পারছি না। তোমার মতলবটা আমায় জানাও। কত টাকা দরকার জানাও। টাকা আমি সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেবো।"

আরও কিছু ব্যক্তিগত টুকিটাকি কথার পর চিঠিটা শেষ হয়েছে।

চিঠি পেয়ে কি ভেবেছিল হেমন্ত আমার জানার কথা নয়, কিন্তু কয়েকদিন পরে এই চিঠি পেলাম।

"প্রিয় সোম,

তোর চিঠি বন্ধুর চিঠি। তোর গুণগান না করে আসল কথায় আসা যাক্।

আমার ভাগ্য কি আর ফিরবে ভাই? তোর চিঠি পাবার পর আমার ব্লাড-প্রেসার অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। চিনি ভয় পেয়ে গেল। ডাক্তার ডাকতে

হলো। কি লজ্জার কথা; ডাক্তার ভিজিট নিলো না। আগে ঐ ডাক্তার বারবার ভিজিট নিতো। বীরু ওষুধ কিনে দিয়ে গেল। আজ দুদিন ধরে ভাল আছি। যাত্রাদলের সঙ্গে মফঃস্বলে কাজও করে এলাম। ভালই আছি।

টাকা পেলে অবশ্যই কিছু করতে পারি। যাত্রাদলই করতে পারি। একটা দলের যাতায়াত খরচ, খাই খরচ, আর সাজপোশাক ভাড়ার খরচ মোটামুটি থাকলে যাত্রার টাকাতেই মাইনে চলে যায়। হাজার সাত-আট হলে দিব্যি ভাল যাত্রাদল চলবে।

তবে আমার বোধহয় সে স্বাস্থ্য, সে দিন নেই। আবার যাত্রাপার্টি নিয়ে ঘুরবো, আবার সেই সব জমিদারবাড়ি যাবো যেখানে আমার রূপযৌবন একদিন লালসার ভোজ্য হয়েছিল; অর্জুনকে আজ যদি কুরুক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনা যায়, রামকে নিয়ে যাওয়া হয় লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের মনের অবস্থা কি হবে ভাবতে পারি।

তবু জীবন সত্য। বটের ঝুরির মতো জীবন। নিজের প্রেরণাতেই সে ঝুপ-ঝাপ করে এধার ওধার থেকে হাত বাড়িয়ে মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়। কঠিন এই জীবনের বেঁচে থাকার বাসনা। আমাকেও বাঁচতে হবে। আমার অনেক ঝুরি নেমেছে। সবাই মাটির রস চায়। রোজগার আমায় করতেই হবে।

আমি শুধু টাকা নিতে পারবো না। সে আমার অসাধ্য। দেহই বইবে না। তোকে এসে মোটামুটি চালু করে দিয়ে যেতে হবে। তারপর আমি চালিয়ে নেব। কিন্তু টাকাটা কার? তোরই তো? অন্যের টাকা আমার সইবে না। কিন্তু ভিক্ষেয় নেমে বাছ করলে চলে? ও কথা থাক। আমায় টাকা দে; তবে নিজে এসে নিজের হাতে।"

কিন্তু কোথা থেকে টাকা দেব? টাকা তো আমার নেই।

মনে পড়ে যায় কল্যাণীকে।

কল্যাণী মাঝে আমায় দু-একখানা চিঠি দিয়ে তার বোম্বে থাকার কথা জানাতো। হোটেল ছেড়ে নিজে ফ্ল্যাট নিয়েছে। নিয়মিত গান শিখছে। কনট্রাক্ট ভালই হয়েছে। মিস্টার দীক্ষিত ভাল ব্যবহার করছেন। গানের আয় একেবারে ওর নিজস্ব। তাছাড়া বাড়িতে ও নিজে একটা রবীন্দ্র-সঙ্গীত আর নাচের স্কুল করেছে। মাত্র দশটি ছাত্রীর বেশী থাকবে না। তা থেকেই ওর হাজার টাকা আয় হয়। অবাঙালীকে বাংলা গান শেখানোই ওর বড় কাজ।

আরও কাজ করেছে কল্যাণী। অনেক বড় কাজ।

প্রতিমার ভার নিয়েছে সে।

প্রতিমার আসল পরিচয়ই সে জেনেছে। তাই সম্পূর্ণভাবে ওকে গ্রহণ করেছে। প্রতিমার ছেলে হবার সময়ে আমি বোম্বে যাই। খুব শক্ত সবল ছটফটে ছেলে হয়েছে।

আমি সাহস দিচ্ছি যেন ছেলে ওরা কাছে রাখে।

বেশ ছিল ওরা। মাঝে মাঝে চিঠি পেতাম।

প্রতিমা গান শিখছে। ওর এখন মতিগতি অন্যদিকে। কল্যাণী প্রতিমার সব সংবাদ খুঁটিনাটি জেনে নিয়েছে।

অপেক্ষা করে আছে প্রতিমা। একদিন সে সীমন্তিনী হবে। তাকে নাকি একেবারে ঠকাবে না সেই অজ্ঞাত যুবকটি।

আমি ইচ্ছে করেই ও ব্যাপারের মধ্যে আর বেশীদূর এগুতে চাই নি। মহাকাব্য সামলানো আমার দায় নয়। এক হেমন্ত-চিন্ময়ী অধ্যায়ই আমাকে ব্যস্ত রাখার পক্ষে যথেষ্ট।

তবু ধীরে ধীরে সব জানা যায়। ছেলেটি তার কৃতকর্মের ফলাফল কিছুই জানতো না। কল্যাণী নিজেই গোপন করেছিল। এ্যাকচুয়ারী পরীক্ষার সেটা তার শেষ বছর। জানাতে চায় নি! বাপের একমাত্র ছেলে। বিয়ের প্রস্তাব আনতেই বাপ প্রত্যাখান করেছিল—নটের মেয়ে। কিন্তু সে ছেলে দমে নি। কল্যাণী পরে, পরীক্ষার পরে সব সংবাদ দিয়ে তাকে চিঠি দেয়। আর বোম্বাইয়ের ঠিকানাও দেয়। সে এসে ছেলে দেখে গেছে। কল্যাণী বলে ওদের ভালবাসার ভিত পাকা। অপেক্ষা করুক। বিয়ে হবেই। বুক বেঁধে বসে আছে। গান শিখছে প্রতিমা।

এর মধ্যে টাকার দরকার হয়েছে হেমন্তর। আমি হেমন্তকে চিঠি দিয়েছিলাম কল্যাণীর কাছ থেকে সাহস পেয়েই। কাজেই যেদিন চিঠি দিয়েছিলাম হেমন্তকে, সেই দিনই চিঠি দিই কল্যাণীকে। কল্যাণী টেলিগ্রাম করে, সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই যাই।

বোম্বেতে কল্যাণী দিব্যি গুছিয়ে বসেছে! ও একা একটা ফ্ল্যাটে থাকে; আর থাকে বৃদ্ধ এক ওস্তাদজী দরীবখান্। লক্ষ্ণৌতে বাড়ি। ওদের মধ্যে গুরুশিষ্যার সম্পর্কটা নিবিড়। দরীবখান্ কল্যাণীকে শুধু গানই শেখান তাই নয়, মনে হয় বাড়ির অভিভাবক উনিই। কল্যাণী কেউ নয়।

"বাধ্য হয়ে এই ব্যবস্থা করেছি। নৈলে এ পথে অনন্ত সংগ্রাম। ওস্তাদজী আমার উপযুক্ত অভিভাবক। আমি সময়মত আসতে পারি যেতে পারি, খেতে পারি, শুতে পারি। আমার প্রোগ্রাম ওঁর হাতে। সে প্রোগ্রামের এদিক ওদিক হলে তাড়া খেতে হয়।"

দরীব খানের মত অন্ধ।

"মেয়ে মানুষ গুণী হোক, রূপসী হোক, কিন্তু মৈফিলি হলে চলবে না। আমি মেয়ে-শিষ্য করি নি কখনও। কিন্তু এ বেটী আমায় সব বলেছে। আমি বুঝলাম জনাব, যে আমি বেটীর হাল না হলে ভরাডুবি হবে। কিন্তু বিয়ে ওকে করতে হবে, সংসারী হতে হবে। আর তখন কেবল গান গেয়েই ওর থাকা খাওয়ার ভাবনা থাকবে না।"

বিয়ে? এ মেয়ে বিয়ে করবে কে?

কিন্তু এ প্রশ্ন তো আমার নয়। আমার প্রশ্ন সাহায্য। কল্যাণী একে সাহায্য বলে না। বলে "আমি কি, তা তো আমি জানি। বাবা নৈলে আজ আমি কোথায় ডুবে যেতাম। আমি আদর্শ নিয়ে বাঁচতে পারবো না। বাবার আদর্শবাদের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। আমি একেবারে তাই সমাজের অন্ধ হয়ে থাকবো। আমি মানুষের মতো মানুষ নিয়ে থাকবো। ওস্তাদজী বলেন "চয়েন্", আমি বলি শান্তি চাই। শান্তি ছাড়া সমাজ, নীতি, এ সবে আমার আগ্রহই নেই। আমি বেঁচে থাকবো সব কিছু নিয়ে। কেবল মাথা হেঁট করবো না। তাই বাবার মাথা উঁচু রাখাও আমার শান্তির উপায়। আপনাকে টাকা আমি অনায়াসে দিতে পারবো। কিন্তু একটা শর্তে, টাকা আমার আপনি জানাবেন না, বাবা তা হলে নেবেন না। জানাবার সময় এলে সবই জানতে পারবেন।"

একটি ছিমছাম ছেলে ওদের ওখানে আসতো। তার এটর্নীর অফিস আছে। নিজের বিলিতি ডিগ্রী। ওদের দুজনার মধ্যেকার একটা সুনিবিড় সম্পর্কে আমি আস্থাবান্; ওস্তাদ দরীব খানও দেখলাম বিশিষ্ট মূল্যবোধ দিয়ে সে সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আমি বোম্বে থেকে চলে আসার দিকে সে কথার প্রস্তাবে কল্যাণী জানায়, "এখন নয়; তবে কোনো দিন হয়তো সংসার বাঁধবো ওঁকে নিয়েই। হঠাৎ কিছু করবার মতো মানসিক ত্বরা আমার নেই। ওস্তাদজীর বয়সের ঢিমে চাল আমার স্বভাবে। তাই আমি যাকে ভালবাসি তাকেও বলি সমুদ্রে সূর্যোদয়ের মতো ধীরে ধীরে আমায় আলোয় ভরিয়ে দিতে; পাহাড়ের হঠাৎ আলো-করা সূর্যোদয় আমার ভাল লাগে না। সময় এলে বাবাকে জানাবো। বাবার মত নেবো। তারপর। নিজে ঠকেছি। ঠকবার ব্যথা জানি। আর কারুকে ঠকাতে চাই না।"

আমি যা পেলাম তা কল্যাণীর টাকা। এখন কেবল সে টাকা হেমন্তকে পাঠানো। হেমন্ত তো লিখলো টাকা ও একা নেবে না; টাকার সঙ্গে আমাকেও দরকার। আমি যেতে পারবো না। অথচ উপায় কি করি ভাবছি।

এমন সময় সাহায্য করলো চিনি। যেন চণ্ডীর মতো খাড়া হয়ে উঠলো সেই চিন্ময়ী।

"কি হবে বারবার সোমকে কষ্ট দিয়ে। সত্যিই তো ও নিজের কাজকর্ম ভাসিয়ে দিয়ে আমাদের নিয়ে পড়ে থাকতে পারে না। আমি সামলাবো তোমার ব্যবসার দিক। আমি থাকবো কাছে কাছে। আর নয় ঢের করেছি, ঢের দেখেছি, ঢের সয়েছি। এই কলকাতার নাড়ীর পাকে পাকে যত ময়লা হয়তো সবটাই আমার ঘাঁটা নেই; কিন্তু প্রথম দিকে তো আমি তোমার যাত্রাদলে ঘুরেছি। যাত্রাদলের তো অনেক কিছু জানি। আমায় যেতে দাও। সব আমি সামলে নিতে পারবো।"

সহজ ছিল না এ মতে সায় দেওয়া। তবু দিতেই হলো। না দিয়ে কোনো উপায় ছিল না।

আবার গড়ে উঠেছিল "শিবশঙ্করী গীতাভিনয় সংঘ।" আবার একে একে সেকালের অনেক বন্ধু, অনেক সহচরী এসে দলকে পুষ্ট করেছিল। আবার চলেছিল রিহার্সাল, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানো, বায়না, রাতজাগা আর বিস্বাদ মধ্যাহ্নের পালা।

সেই সকাল-সন্ধ্যার ডাক, সেই বনবাসক, নিমনিস্যন্দের আর গুলঞ্চ-ছাওয়া বনের পাড়, সেই নদীর বুকে নৌকো বেয়ে যাবার দীঘল অবকাশের মধ্যে গ্রামের ঘাটে ঘাটে চোখ রাখার মায়া—সবই আবার ফিরে এসেছিল ওদের জীবনে। ফিরে আসে নি সেই যৌবন, সেই দীপ্ত-প্রচণ্ড গতিবেগ, সেই গড়ে-ওঠার দুর্নিবার ভবিষ্যৎ। সব পায় মানুষ। হারানো দিন পায় না।

কিন্তু তবু গড়ে ওঠে। বীজ ফুরুলে তখন কলম লাগিয়ে কাজ চলে। কলমে ফলে তাড়াতাড়ি। "শিবশঙ্করী গীতাভিনয় সংঘ" গড়ে উঠলো। মাস ছয় যেতে না যেতে অর্ধেক টাকা শোধ করে দিলো হেমন্ত।

কিন্তু যেখানেই থাক, শনিবারে কলকাতা আসতেই হতো ওকে, আর বলতে পারতো না ওর সবটুকু কথা চিনিকে। মনিঅর্ডার নয়, চিঠি না, নিজেকে-একেবারে নিজেকে নিয়ে এসে গিরিশপার্কের সেই বাড়ির লাল সিমেণ্ট বাঁধানো মেঝেয় বসিয়ে দিতে না পারলে ওর যেন তৃপ্তি হতো না।

তখন ওর ব্লাডপ্রেসারের উত্থান পতন পরম শঙ্কাজনক। চোখে চোখে রাখতো চিনি। তবু, তবু ঐ দুর্বলতা। বলতো, "পারি না। কি করি। অনেকদিনের সঙ্গী সব।"

চিনি বাধা দিয়েছে "নিজে কেন যাও? তোমার তো প্রেস নয়? তারা তোমার স্বাস্থ্য দেখে কিছু বলে না।"

কিন্তু দুরন্ত হয়ে ওঠে হেমন্ত। "কোনো দিন এ কথায় থাকো নি। শান্তির জীবন আমাদের। এখন এ কথা তোলো কেন? তোমাকে ছাড়া অন্য নারীকে মা বলে জানি। কিন্তু পারি না। আমি ছাড়া কেউ নেই যাদের, যাদের এই দীর্ঘ জীবন ঘাড়ে নিয়ে বেড়ালাম, আমার দারুণ আশার মশালে যারা আগুন এঁকে দিয়েছিল তাদের আমার ছাড়তে মন যায় না। ও টাকা আর ও সময় দেওয়া তোমার সতীধর্মের মতোই আমারও অপরিত্যাজ্য।"

ও যায়। টাকা দেয় চলে আসে।

কিন্তু আমি জেনেছি ও আঁকু-পাঁকু করে কল্যাণীর জন্য। কোথায় গেল সে মেয়ে; কোথায় গেল? পায় না। কলকাতায় যায়। ওর যত সব অনুচর-অনুচরীদের লাগিয়ে পাড়ায় পাড়ায় খোঁজ করে। কোথাও পায় না।

আর মনে মনে বলেছে, কল্যাণী ওর সব আশায় কালি দেবে না।

আমার কাছে নিজেই দুঃখ করতো। সে দুঃখের ভাষা ছিল না, বেদনা ছিল। কল্যাণী বলে কোনও মেয়ে যে ওর জীবনে আছে বা এসেছে এ কথা ও কিছুতেই যেন আমায় বলতে পারতো না। কিন্তু ও না বললেও ওর সেই শোকের ভাষা আমার জানা ছিল।

পর পর কয়েকখানা বই করে ওদের সংঘের তখন নাম জবর। লক্ষ্মণবর্জন-এ ও লক্ষ্মণের অভিনয় করেছে। বর্জনের লক্ষ্মণ তো তরুণ নয়। সে লক্ষ্মণের অভিনয় ওর বয়সে মানায় ভাল। নতুন রূপ দিলো লক্ষ্মণের; বৃদ্ধ, পলিত কেশ, আর সেই বেশে যখন রামের কাছ থেকে সে বিদায় নেয় তখন দর্শক নিজেদের সামলে রাখতে পারে না।

সেই জমিদারবাড়িতে পালা। সেই রানী এখন বিধবা। তাঁর ছেলে পালা গান করাচ্ছে। প্রাণমন ঢেলে অভিনয় করছে হেমন্ত। সাজঘরে সাজ পরে ঘনঘন পায়চারি করছে একটা অন্ধকার ঝোঁপের ধারে। যেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আকণ্ঠ পান করছে মঞ্জুসুরা। ঐ যে একফালি জায়গা ভীড়ের মধ্যে, ওই জায়গাটুকুকেই ও ধূপে, দীপে, মাল্যে পূজা করে তারপর অভিনয়ে নেমেছে। বুকের মধ্যে প্রেমের মতো হেমন্তর সারা জীবনের অন্ধকারের মধ্যে ঐ একফালি চকচকে আলো, ঐ এক টুকরো শতরঞ্জির আকাশ ওকে চমকে দেয়, মুগ্ধ করে। ওকে অবশ করে রেখেছে মন্ত্রে, জাদুতে, মায়ায়। ওর বুকে পা দিয়ে শুনতে হবে জনতার সমবেত হর্ষধ্বনির তুমুলতা। ওর নিস্প্রাণ আস্তরণকে জাগিয়ে শুনতে হবে স্পন্দনের ভাষা। তাই এই নিভৃত পদচারণা। জোনাকির আলো জ্বলে। ওর মন ডুবে আছে সরযূতীরে সাকেত, সাকেতে প্রাসাদ; প্রাসাদে মন্ত্রণাকক্ষে কে এক অজ্ঞাত পুরুষ জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের সঙ্গে বার্তালাপরত, প্রাসাদকক্ষের বাইরে দুর্বাসার তর্জন। সেই চিত্র। সেই সর্বনাশা দ্বন্দ্বের চিত্র।

বলেছে হেমন্ত সে রাতের কথা, যেমন একদিন বলেছিল আরও পঁচিশ বছর আগের একটা রাতের কথা আরও বিশ বছর আগে। এই বাড়ি, এই রানী, এই হেমন্ত।

বলেছে হেমন্ত, "জানিস্। হঠাৎ কে যেন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। বিধবা।...অন্ধকার। এর বেশী কিছু দেখতে পাই না। শুধু বুঝি যৌবন নেই। সেই অদ্ভুত গন্ধটা নেই।" বললেন সেই বিধবা "লোকে যাই বলুক আমি জানি ও ছেলে তোমার। তোমার আশীর্বাদে আমি বেঁচে আছি, ঐ ছেলে পেয়েছি। 'মা' বলে যখন ডাকে তখন তোমার সেই চিৎকার শুনতে পাই। 'আমার প্রায়শ্চিত্ত সাঙ্গ হল। তোমার পায়ের ধূলো নিলাম।' কিন্তু আর তো সময় ছিল না। দৌড়ে গেলাম আসরে। গিয়েই সীন্। সে যে কী সীন্ করলাম সেদিন। ভুলে গেলাম বয়েস, ভুলে গেলাম সব। যখন লক্ষ্মণ আর উর্মিলার সীন্‌টা করছি বারবার মনে পড়ছে অন্ধকারে বিধবার সেই চোখ আর স্মৃতির মধ্যে যুবতীর সেই চোখ। কি হলো, মূর্ছা ছিল না সে সীনে। আমি মূর্ছিত হয়ে গেলাম।"

সেই মূর্ছাই ওর কাল হলো।

আমি কলকাতায় এসেছিলাম ওর প্যারালিসিসের খবর পেয়ে। অভিনয় করতে করতে স্ট্রোক হয়। তার পর আর ওঠে না। প্যারালিসিস্ হয়। তারই গল্প বসে বসে শুনেছি দিনের পর দিন।

সন্ধ্যার বাতি ঘরে জ্বলে উঠতো।' মহানগরীর কল-কোলাহল বেহালার প্রান্তসীমায় ছোট বাড়িখানায় পৌঁছুতো না। কিন্তু বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে দেখেছি হেমন্তকে ঐ সময়টায়, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের রঙ্গশালাগুলোতে যখন বাতি জ্বলতো, যখন পর্দা উঠতো, যখন পান আর সিগারেট আর চিনেবাদামের শব্দ নিস্তব্ধ হয়ে যেত, আলো-নেবা প্রেক্ষাগারের উদ্‌গ্রীব ঔৎসুক্যের মধ্যে। মঞ্চে তখন শাজাহান বলছে "তাই তো! এ বড় দুঃসংবাদ দারা" বা রমেশ ঢুকছে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে।

আমি যত বলতাম "ওসব কথা আর তুমি ভাবো কেন?" ও বলতো, "কাকে ভাববো? ঐ মঞ্চই আমার অদৃষ্ট। মঞ্চই আমার ইষ্ট। মরবো যখন মঞ্চের কথাই ভাববো।"

কিন্তু একটু সারতে না সারতেই রোজগারের ধান্ধায় সেই দল নিয়ে চিন্ময়ীকে বেরুতেই হয়। সঙ্গে থাকে নুব্জ, অথর্ব, পলিত হেমন্ত। একটা দিক পড়ে গেছে। তবু সংঘের সে নায়ক। চিন্ময়ী সেই ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে কায়ার মতো ঘুরে ঘুরে দলের বাঁধুনী আঁট রেখেছে।

১৪

অসুখের পর থেকেই মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল হেমন্ত। আমি প্রায়ই দু-চার দিনের জন্য কলকাতায় যেতাম। যখনই ওরা কলকাতায় এসেছে খবর পেতাম, তখনই যাবার চেষ্টা করতাম। যদিও পুরোনো সেই স্বচ্ছলতা ফিরে আসে নি, তবু মোটামুটি তখন ওদের সংসার চলছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে যাত্রার দলে ও আর অভিনয় করতে পারে না; কিন্তু চিন্ময়ী জোর করে হাল ধরে রেখেছে। শহরের মঞ্চে শাজাহান এখন ও প্রায়ই করে। আরও একখানা বই লিখিয়েছে 'অন্য পুরুষ।' তাতে একটা পঙ্গুর চরিত্র আছে। সেই চরিত্রে ওর অভিনয় খুব সহজও হয় আবার ওর চিত্রাকর্ষকও। দর্শকরা সে অভিনয় মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করলো। হঠাৎ ওর নাম-ডাক আবার বেড়ে যায়।

সেই সময়ে ওর মনে পড়ে যায় ফুরিয়ে-যাওয়া সংসারের কথা; হাতিবাগান আর রঙ্গশ্রী। এক মেয়ে ডুবেছে, অন্য ডুবিয়েছে। কোথায় গেছে সে? আর কল্যাণী, সেই বা কোথায় গেল? কখনো ও কোনো দিন এদের নাম মুখে আনে নি। কিন্তু পঙ্গু হয়ে গিয়ে ওর বোধহয় নিজের ওপর ক্ষমতা কমে এসেছিল। প্রায়ই অস্থির হয়ে পড়তো। "কি করলাম জীবনে? প্রেম? পেলাম, খুব পেলাম। বন্ধুত্ব, সততা, সাহচর্য কতই পেলাম। বিশ্বাসঘাতকতা, তঞ্চকতা, শাঠ্য, ছল—তাও পেলাম। জীবন-নাটক আমায় অঙ্কে অঙ্কে পর্দায় পর্দায় বাজিয়ে নিয়েছে। কিন্তু স্নেহ, মায়া? সে সব ধন আমার কোথায় হারিয়ে গেল? বুড়ো বয়সে চকচকে নতুন-জীবনে-রাখা-চোখের জ্যোতি না দেখলে সব যেন অন্ধকার বোধ হয়। কোথায় গেল তারা, কোথায় হারালো?"

আর ঐ সব দিনে গাড়ি করে চলে যায় যেখানে কেউ তাকে কোনো দিন অনুসরণ করলো না।

"ওরা আমার ভিক্ষের দিনে ঝুলি ছিল। আধপেটা খাবার দিনে থালার-সঙ্গী ছিল! ওরা আমায় রাজা করেছিল। ওরা আমায় ভিখিরী হবার দিনেও রাজা বলেই সম্মান দিল। আমার মঞ্চ-জীবনের ওরা গুরু-ভগ্নী, আমার শ্মশান-জীবনে ওরা আমার উত্তরসাধিকা। ওদের আমি ছাড়তে পারি না। সে তোমরা বুঝবে না।"

সত্যিই বুঝি নি কোনো দিন এই তথ্যটুকু। মাঝে মাঝে ভাবতাম বিলাসী কি মরবে না? কিন্তু সত্যি বিলাসী আমাদের কোনো ক্ষতি তো করে নি। মেজোকত্তাকে সে চিরটা জীবন কেবল সম্মানই করেছে।

তবু আমার মনে বদ্ধ একটা বীতরাগ যাও বা ছিল কখনও এতটুকু আঁচ দেখি নি চিন্ময়ীর মনে। কখনো ওকথার আলোচনা তোলে নি চিন্ময়ী। বরং তিন বন্ধু যদি কোনো সন্ধ্যায় একত্রে বসে কথা বলতে বলতে বুঝতে পেরেছি হেমন্ত কেমন আনমনা হয়ে পড়েছে, শুনেছি চিন্ময়ী বলেছে, হাসতে হাসতে বলেছে, "যাও, একটু ঘুরে এসো তোমার নেশাঘরে। ভাল লাগবে।" যদি কোনো দিন অযথা ভাবাবেগে হেমন্তর কণ্ঠ বাষ্পাকুল হয়েছে কল্যাণীর স্মৃতিতে, প্রতিমাকে স্মরণ করে, চিন্ময়ী বলেছে, "মন খারাপ কোরো না। সোম গাড়ি ডেকে দিক। ঘুরে এসো। কোথায় যাও সেখানে।"

আমি কতদিন বিরক্ত হয়েছি। বলেছি, "সেকালের শাস্ত্রে এর নজীর আছে। চরিত্রবলহীন সতী নারীরা সে নজীরের গুণগান করে। কিন্তু এ তোমার কি? একটুও কিছু মনে হয় না তোমার?"

পা মেলে দিয়ে নিজের হাতে আলতা পরতে পরতে বলে চিন্ময়ী, "ও তোমরা বুঝবে না। ও যে আমাকে ছাড়া ভাল কারুকে বাসে না এ আমি ছাড়া কে জানবে বল? ওখানে ও যায় কেন, তুমিও জানো। আমায় অবহেলা করে যায়, তা নয়। আমায় অপমান করে, একথাও ও ভাবতে পারে না। ও যায় যেন ওর পুরোনো সাথীদের দেখতে অনাথাশ্রমে। যেন পিঁজরাপোলে সখের পোষা জীবটিকে আবার দেখতে যাওয়া। এও এক মায়ার ফাঁদে পড়ে যাওয়া আর কি! ওর কর্তব্য, ধর্ম, আর শুভবুদ্ধি ওকে ওখানে নিয়ে যায়। ভূতপেত্নী ছাড়েন নি বলে ভোলানাথ কি শঙ্করীকে কম ভালবাসতেন?"

আমি মনে মনে ভাবতাম হেমন্তর মতো আরও দেখেছি, দেখবো। কিন্তু চিন্ময়ী? অমনটি কি আর দেখবো?

এমন সময় ওর সেই নতুন বইয়ের ডাক এল একটা প্রখ্যাত স্টুডিও থেকে। অনেক দিনের অনেক আশায় সে যেন অভিষেক সিঞ্চন হলো। আমারও যত, চিন্ময়ীরও তত আনন্দ হলো।

কিন্তু একটুও আনন্দ হয় নি হেমন্তর। ও জাত-মঞ্চশিল্পী। "একবার একটা ফিলমে দেখেছিলাম প্রথম রেলগাড়ি হলো যখন, তখন তার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ির রেস। রেল প্রথম প্রথম হেরে গেল। তারপর একদিন ঘোড়ার গাড়ি হেরে গেল রেসে। সেই গাড়িওলা আর ঘোড়া দুটি প্রাণীই যেন শেষ পর্যন্ত সেই যুদ্ধ করে হেরে গিয়েও আমার চোখে :জিতে রইলো। আজ মঞ্চে সিনেমায় ঘোড়দৌড়

চলেছে। ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সিনেমা। মঞ্চের অনাদর। কিন্তু মঞ্চ যদি প্রকৃত শিল্পী নিয়ে দাঁড়াতে পারে তো মঞ্চের আমোদ, মঞ্চে অভিনয়ের মর্যাদা কোথায় স্টুডিওর কিমা বানানো মাংসস্তূপে। সমগ্র জীবনের রূপ পাবে মঞ্চে, আর স্টুডিওতে? গেছো কোনো দিন? ছি! ছি! ঐটাই সত্যি সত্যি শিল্পীর বেশ্যাবৃত্তি। ও আমি পারবো না। জাত খোয়াতে পারবো না।"

সিনেমার ওপর ওর ছিল প্রচণ্ড বিদ্বেষ। কিন্তু ওকে যারা চায় তারা একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে। বাংলা দেশে ওর 'অন্য পুরুষ' দেখার জন্য কলকাতা শহরেই ভীড় হচ্ছে। আর সে অভিনয় ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়। কন্যাহারা রুগ্ন পঙ্গু পিতার সে আর্তনাদ যেন ওর অন্তর থেকে বেরুতো। আর আমি ভাবতাম বোম্বেতে গিয়ে কল্যাণীর বিবাহ কি ত্বরান্বিত করতে পারি না?

প্রাণপণ চেষ্টা করি। কল্যাণীর জন্য ততটা নয় যতটা প্রতিমার জন্য। বিয়ে দিয়ে সপুত্রক প্রতিমাকে এনে ওর চোখের ওপর দাঁড় করাবো। কিন্তু হচ্ছে না। প্রতিবার কল্যাণী জানাচ্ছে "ভাববেন না। এ বিয়ে হবেই। ছেলে রাজী হয়েছে। ছেলের মাও রাজী। ছেলের বাপ অত্যন্ত অসুস্থ। তিনিও মত দিয়েছেন। একটু ভাল হলেই বিয়ে হবে।"

এর বেশী ওরা জানতে শুনতে দেয় না। আমি শুধু কল্যাণীর শুভবুদ্ধির ওপর আর ওস্তাদজীর অভিভাবকত্বের ওপর নির্ভর করে থাকি। মাঝে মাঝে দীক্ষিতের চিঠি পাই। দীক্ষিত খুব খুশী কল্যাণীর স্বভাবে ও কাজে!

এমন সময় চিনি পড়লো অসুখে। কঠিন স্ত্রী-ব্যাধি। অপারেশন করাতে হবে। বড় অপারেশন। আমি সব সংবাদ শুনলাম কাশীতে বিছানায় শুয়ে। নিউমোনিয়ায় ভুগেছি। তারপরই ডাক্তাররা বললো প্লুরিসি। খরচের খাতায় লেখা হয় নি নাম। কিন্তু দারুণ ভুগে চলেছি ঝাড়া দুটি মাস। তারপরে একটু ভাল থাকলেও বিছানা ছাড়ার ক্ষমতা নেই আমার।

যখন সে ক্ষমতা এলো তখন কলকাতায় এসে দেখলাম ওদের সংসার আবার শ্মশান হয়ে গেছে। চিন্ময়ীর অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে যাত্রার দল হাতছাড়া হয়ে গেছে। হেমন্ত তো অভিনয়ও করতো না; দেখতোও না। টাকাকড়ি, ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার চিন্ময়ীই দেখতো। ওদের সেই পুরোনো দল দেউলে হয়ে গেছে। তা বলে দল ভাঙে নি। তারাই চিন্ময়ীর নামমাত্র শাসন এড়িয়ে অন্য নামে কাজ করছে। ভাঙাদল যাবার সময়ে রেখে গেছে হেমন্তর ঘাড়ে দেনা। আর হেমন্ত, পঙ্গু হেমন্ত সেবা করছে তালতলার একটা বস্তীতে শয্যালীনা চিন্ময়ীকে।

আমি যখন গিয়ে পৌঁছেছি তখন বিছানার চাদর বদলাতে গিয়ে হেমন্ত ওঁকে ফেলে দিয়েছে। পেটের ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে গিয়ে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে

চিন্ময়ীর। রোয়াকে দাঁড়িয়ে হেমন্ত চিৎকার করে ডাকছে সামনের লোকজনকে। তার মধ্যে দুটি তরুণ-তরুণী হাসছে। তরুণী বলছে সবতাতেই বুড়োর নাটক! ঘরে যেন কারুর বৌ থাকে না, কারুর যেন অসুখ করে না।" আমায় দেখেই হেমন্ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি কি করবো এদের নিয়ে। হাসপাতালে দিয়ে আসাই ঠিক। কল্যাণীকে জানালে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার; প্রতিমাকে জানালে তার বিয়ে আটকে যাবে। এমন সময়ে ভগবানের আশীর্বাদের মতো সেই মহেশদা উপস্থিত।

আমি বলি, "মহেশদা! আপনি এ সময়ে?"

"বীরুর সৎকার করে আসছি। আজ নাটক বন্ধ রেখেছে ওরা।"

"বীরু মারা গেল? কি হয়েছিল তার?"

"নতুন রোগ কিছু নয়। পুরোনো রোগ। সেই টি. বি.।"

"শেষটায় কষ্ট পায় নি তো?"

"নাঃ, তেমন কিছু পায় নি। হাসপাতালেই মারা গেল কিনা। তাই শেষের দুমাস অন্তত খেতে পেয়েছিল। আর আমরাও খুব বদান্যতা দেখালাম। দুটো বেনিফিট নাইট দিলাম এবং আজ একদিন বন্ধ রাখলাম। তারপর এদের খবর কি?"

আনুপূর্বিক সব বললাম। উনি ভেতরে এসে বসলেন।

আমার থাকার মধ্যেই মহেশদার কৃপাতেই হেমন্তর নামে একটা বেনিফিট নাইট হলো। হেমন্ত নিজেও অভিনয় করলো। তার সেই 'অন্য পুরুষ' নাটকে বিকৃতাঙ্গ চরিত্রের অভিনয়। এ হেমন্ত যেন সে হেমন্ত নয়। আমি আর চিন্ময়ী বক্সে বসে আছি। আমি নিজে অনেক সাবধানে চিন্ময়ীকে নিয়ে এসেছি।

পাদপ্রদীপের বাতি ঝলমল করছে। পর্দা রয়ে রয়ে দুলে উঠছে। তার পেছনে রয়েছে বহু বৎসর ব্যাপী সাধনার মুণ্ডপীঠ। শত শত জীবনের কঙ্কাল গুঁড়িয়ে আছে এর রেণুতে। বাতিল-করা নাগর গলিত অঙ্গ, পলিত মুণ্ড নিয়ে আজ আবার এসেছে বাহার দেখিয়ে বাহবা নিতে। মঞ্চ হাসছে, চিরযৌবনা মঞ্চ হাসছে। আর আমি ভাবছি প্রসাধন পারিপাট্যের জোরে যতই ঝলমল কর না কেন, আসল স্বরূপ তোমার কি, কতবড় Cybil তুমি, কি নিদারুণ Circe, কি কুহকিনী Siren তুমি আমি জানি। তোমার পর্দা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে লোক-চক্ষে দেখাতে পারি তোমার আধি-ব্যাধি পীড়িত চর্মসার কঙ্কালখানার স্বরূপ।

গিরিশ পার্কে বিলাসীদের বাড়ি যেত হেমন্ত। কিন্তু কোনো দিন বিদ্বেষ পোষণ করতে পারি নি সে বাড়িখানার প্রতি। আমার বিদ্বেষ পাকে পাকে ঘুলিয়ে

উঠেছে এই মঞ্চের কথা ভেবে। এর ওপর আমার অন্তরাত্মার বিদ্বেষ। এই মঞ্চ হেমন্তকে নির্যাতন করেছে, চিন্ময়ীকে যন্ত্রণা দিয়েছে, শত শত সংসার ভেঙেছে, প্রাণের পেয়ালায় বিষ ঢেলেছে। এর ওপর আমার নাড়ীর রাগ, আমার বিজাতীয় আক্রোশ।

তবু তারই মধ্যে এক সময়ে বাইরের আলো নিবলো, পাদপ্রদীপের আলোর পলক অস্থির হয়ে দপদপ করে কখনো কটাক্ষে, কখনো চটুলতায়, কখনো হাস্যে, কখনো পরিহাসে চাইতে লাগলো। অভিনয় এগিয়ে চললো।

বেনিফিট্ নাইটের অভিনয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমবেত আজ। টিকিটের দাম তিনগুণ বেড়েছে। দর্শকমহল বিশিষ্ট। অথচ এই অভিনয় যে হেমন্তর জীবনের শেষ অভিনয় না-জানি কি করে ও তা বুঝতে পেরেছিল। দৃশ্যের পর দৃশ্যে, প্রায় সংলাপের পর সংলাপে হেমন্ত ডিঙিয়ে যাচ্ছে আশেপাশের সমস্ত করিৎ-কর্মাদের। নাটকের মধ্যমণি হয়েই নয় শুধু, জীবনের, অনন্ত জীবনের একটা অনন্ত ট্রাজেডির নাভিকেন্দ্র হয়ে ও যেন মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে নিজেকে সব ধরা-ছোঁয়ার অতীতে নিয়ে যাচ্ছে একটা অশরীরি যন্ত্রণার অর্তনাদের মতো। ওর সে-রাতের সে অভিনয়ের দৌলতে দর্শকদের চৈতন্যলোকে রূপে রূপে প্রবেশ করলো মানবতার দৈন্য, কুরূপের বিকার, পৌরুষের পরাজয়ের একটা নগ্ন-বিধুর চিত্র। প্রেক্ষাগার দীপ্ত প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠ—পরিশেষের জন্য পল গণনা করতে লাগলো। সে রাতে মঞ্চ আর প্রেক্ষাগারে যেন একটা স্বরই বাজতে থাকলো ; দর্শক আর অভিনেতা যেন একটা ছড়ির আঘাতেই বেজে উঠলো। হেমন্তর কথা সকলে ভুলে গেল। একটা নৈর্ব্যক্তিক উৎকর্ষবোধ দর্শকসমাজের রসলোককে থেকে থেকে উচ্ছল করে তুললো।

পর্দা নেমে এসেছিল নাটকের প্রান্তে। যবনিকা শেষবারের মতো পড়েছিল হেমন্তর নট-জীবনে। আর সহস্র নগরী মুখর হয়ে উঠেছিল হেমন্তর বন্দনায়। কিন্তু আর নয়, আর নয় ; হেমন্ত আর অভিনয় করতে যেতে পারলো না। সেই রাতে ও যেন মঞ্চের কাছে নিজের হৃদপিণ্ড উপড়ে দিয়ে এসেছিল।

আমি অপেক্ষা করেছিলাম ; কিন্তু আমায় সচেতন করে দিলো চিন্ময়ী। "এখন ও আসবে না। আজ তো অনেক টাকা পাবে। আজ ওর নেশার জায়গায় ও যাবে। পাক শান্তি ও। চলো আমরা বাড়ি যাই। ও শান্তিতে ঘুরে আসুক।"

"কিন্তু অত টাকা!" আমি শঙ্কিত হয়ে বলি।

চিন্ময়ী শান্ত স্বরে বলে, "ভেবো না, মহেশদা আছেন।"

তাই এল। অনেক রাতে জর্জর দেহ নিয়ে ফিরে এল হেমন্ত। বললো, "কটাই বা টাকা দিলাম। কিন্তু কি খুশী, কি বলবো। ওরাও খেতে পাচ্ছিল না আমি যদি আজই না যেতাম—"

কথা শেষ করতে দেয় নি চিনি। বললো, "বেশ করেছো। আমার জন্য কি এনেছো?"

একটা হাত বাড়িয়ে বলে হেমন্ত "এই ক্লান্ত দেহ, দেহ ভরা রোগ, আর তার মধ্যে অফুরন্ত প্রাণ তোমার জন্য। আরও চাই? পেটের জ্বালা, অভাবের তাড়না, আর অন্তহীন আশা পোড়ানো চাই—সব তোমার চিন্ময়ী।"

তবুও চিন্ময়ী হাসে। "আমিও কি তোমার মঞ্চ?

"মঞ্চ? তুমি আমার দোলা। শিশু দোলায় চেপে ঘুমিয়ে পড়ে। তুমি আমার তাই। তোমায় পেলে আমি শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ি। মঞ্চ! মঞ্চ আমার সর্বনাশা ডাক, আমায় পাগল করে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তুমি আমার মায়ের কোল; ছোঁয়া পেলেই ভয় ডর সরে যায়।"

হাত বাড়িয়ে দেয় চিন্ময়ী। আমি অন্য দিকে চোখ ফেরাই।

"আর তোমার জন্য আমি কি এনেছি বল তো?" বলে চিন্ময়ী।

উদাসীন কণ্ঠে বলে হেমন্ত "কি?"

"মাথায় সিঁদুর, পায়ে আলতা আর মুখে হাসি। আরও এনেছি এই নাও"—বলে গড় হয়ে সে প্রণাম করলো হেমন্তকে। "কি নেই তোমার? সব আছে। কেন হায় হায় কর? মেয়ে চলে গেছে আমি মেয়ে; সংসার ভেঙেছে, আমি সংসার। অর্থ নেই, সামর্থ্য নেই, কিন্তু আমি আছি। কেন তুমি দুঃখ করো?"

"কই করি না তো!"

"করো, করো। না যদি করতে আজ কি ঐ অভিনয় করতে পারতে? ও তো অভিনয় নয়। আমি তো জানি ওর আর্তনাদগুলো কোথায় লাগছে, কোথাকার শব্দ ও।"

হঠাৎ হেমন্ত বলে, "কত সহ্য হয় চিনি? সব সহ্য হয় আমার। সহ্য হয় না তোমার দুঃখ আর আমার বিশ্বাসঘাতকতা। সব শোধ করেছি বিলাসীদের। আর মাত্র তিন হাজার বাকী। এটা দিলেই সব শোধ হয়ে যায়। আমি এ তিন হাজার বোধহয় শোধ করতে পারবো না।"

"শুধু যদি টাকা, শুধু যদি দেনা, কেন করলে এই গোপন? কেন একটা অযথা রহস্য সৃষ্টি করে দুনিয়ার চোখে হেয় করলে নিজেকে?"

"শুধু টাকা, শুধু দেনা বলে নয়। দুনিয়ার চোখের চেয়ে তোমার চোখে হেয় হওয়াটাই আমাকে বেজেছিল বেশী।"

"কেন আমায় বলো নি সব?"

"সব জানে সোম। ও টাকা খুনের টাকা। ওর জন্য গোপনতার দায়ে দায়ী ছিলাম বিলাসীর কাছে। কথা ছিল বিলাসীর, যেন ঘুণাক্ষরে কেউ না

জানে। তাই জানাই নি। প্রথমে তাই জানাই নি। কিন্তু পরে পারতাম জানাতে—জানাই নি।" গলা ধরে এল হেমন্তর।

"থাক ; কষ্ট হয়, বোলো না।"

"বলবো, বলবো ; আজ না বললে চলবে না। পরে দেখলাম তোমার সন্দেহ, সোমেরও সন্দেহ। ও চুপি চুপি গিয়েছিল তোমার দুঃখ সইতে না পেরে, আমার গোপন সুখের চেহারা দেখতে। তাই অভিমান হলো। বলি নি, বলি নি। ভাবলাম তোমাদের চোখে যদি চরিত্রবান না হয়ে থাকি প্রমাণের দলিলে চরিত্র এঁকে লাভ কি ?…তাই ছিল না শুধু টাকা, শুধু দেনা। আরও ছিল। যে জেদ, যে রোখ পুরুষের ঘাড়ে প্রকৃতিই শুধু চাপিয়ে দিতে পারে সেই রোখ ছিল, সেই রোখ।"

হাঁফায় ও। আমি ধরি গিয়ে। চিনির সাধ্য ছিল না ধরে। বলি, "থাক, থাক। চুপ করো তুমি ; চুপ করো।" বাকী টাকার জন্য ভেবো না। মাত্র তিন হাজার। ও টাকা আমিই দিয়ে দেবো।

"না তা হবে না। পৌরুষধর্মে বিশ্বাস করি। নিজের উপার্জিত টাকাই আমি দেবো।"

তখন বুঝতে পারি নি। পরদিন দুপুরে এসে দেখি হেমন্তর অবস্থা আবার খারাপ। খবরের কাগজে সেদিন ওর প্রশংসা অজস্র। অথচ ওর সেদিন মনভরা দুঃখ।

অপমানে শোকে ও যেন মরে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করি "ব্যাপার কি ?"

ধীরে ধীরে সব জানতে পারি।

"আমি স্থির জানি যে-কোনও মুহূর্তে এখন আমি থেমে যেতে পারি। কিন্তু ঐ তিন হাজার টাকার আমার দরকার। আমি গিয়েছিলাম বসন্তর কাছে। বসন্তকে আমি যখন প্রেস কিনে দিই তখন চিনির গহনা বেচতে হয়েছিল। বসন্ত আমায় বলেছিল, বাবার সামনেই বলেছিল, 'বৌদির গহনার টাকা কি আমি মেরে দেবো ? ও টাকা বৌদিরই। আমার কাছে রইলো। আমি দরকারের সময় ঠিক দিয়ে দেবো।' তখন জানতাম আমার দরকার হবে না। কিন্তু চিনি বলেছিল, 'তোমরাই আমার গহনা ঠাকুরপো। দরকারের সময়ে তোমরা দেবে না তো কে দেবে ?' আমি তাই তাকে বলতে গিয়েছিলাম যে সেই টাকা-কটা আমায় দিতে পারে কি না।"

চিন্ময়ী বলে ওঠে, "তার কাছে টাকা চাইতে গেলে ? এ তোমার কি মতিচ্ছন্ন হলো বলো তো ?"

"মতিচ্ছন্নই চিন্ময়ী। আর তার সাজাও পেলাম। সত্যি সত্যি আমার গলায় হাত দিয়ে ও তাড়িয়ে দিলে। বৌমা ধরতে এলেন। বৌমা মার খেলেন। সে তো আমারই মার খাওয়া হলো চিন্ময়ী। তারও বড় কিছু। উনি তো আমার মা-ই হন। মা বলেই তো ডাকতাম।"

এ দুঃখের সত্যিই সান্ত্বনা নেই। দৈন্যে, পরাজয়ে, নৈরাশ্যে মতিভ্রম হয় মানুষের। বলবার কিছু নেই।

কিন্তু এরও একটা দিক ছিল।

সন্ধ্যার পর বড় গাড়ি দাঁড়ালো বস্তীর মধ্যে। তাতে মারোয়াড়ী বণিকসহ নামলেন প্রখ্যাত ডিরেক্টর দাশগুপ্ত। ওরা কন্‌ট্রাক্‌ট্ করতে এসেছে ওর ঐ অভিনয়কে পর্দায় আনার। কাল ওরা অভিনয় দেখে এসেছে।

কন্‌ট্রাক্‌ট্ অনেক অনেক টাকার !!

চিন্ময়ী বাইরে দাওয়াতে ছুটে আসে। আমার আর হেমন্তর মাঝে এসে দাঁড়িয়ে বলে, "না, না। পর্দায় ছবি তোলায় ওঁর বিষম ঘেন্না। এ কাজ উনি করবেন না।"

হেমন্ত পঙ্গু। তবু একটা হাত ওর বেশ সতেজ। ও সেই হাতে চিন্ময়ীকে জড়িয়ে নিয়ে বলে, "কালই কন্‌ট্রাক্‌ট্ হবে। টাকা আমায় রিলিজের দিনে সব দিতে হবে। আগে চাই না। ও টাকা আমি একসঙ্গে নেবো।"

চকচকে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়ে রইলো চিন্ময়ী হেমন্তর দিকে।

হেমন্ত যেন সে চোখের ভাষা বুঝলো। বললো, "না-না সে ভয় তুমি কোরো না। ছ মাস বলছেন ওঁরা। মাত্র ছ মাস। ও কটা দিন আমি বেঁচে থাকবো। বেঁচে থাকতেই হবে আমায়।"

আমি ওদের ছেড়ে দিয়ে মিঃ দাশগুপ্ত আর তাঁর মক্কেলকে নিয়ে গাড়ি করে চললাম কন্‌ট্রাক্‌ট্ ফর্ম পরীক্ষা করে দেখে আসতে।

১৫

বোম্বে থেকে চিঠি এসেছে কাশীতে প্রতিমার বিয়ে। বোম্বে গেছি। এতদিনে প্রথম পাত্রটিকে দেখে চক্ষু জুড়ালো। পাত্রের মা নিজে বিবাহ দেওয়ালেন। পিতা মারা গিয়েছেন তখন। তখনই জানলাম প্রতিমার শ্বাশুড়ী নাতির কথা জানতেন। কিন্তু স্বামীর মতের অপেক্ষায় ছিলেন। স্বামী মত দিয়েই গেছেন। প্রতিমার জীবন যে এখন স্বচ্ছন্দে কাটবে তা বুঝতে পারলাম।

আর বুঝতে পারলাম কল্যাণী অনিশ্চিত দোলায় পা রেখেই দুলবে। বাধ্য-জীবনেও থাকবে না। মানুষকেও কোনো মতেই সমগ্রভাবে বিশ্বাস করতে পারে না। দেহের শুচিতাকেও পুরোপুরি সম্মান দেয়; বলে, "নিজের চেয়েও বড় যাকে সত্যিই মনে হবে তাকেই দিতে পারবো নিজেকে। আমার জীবনে দেহ বড় নয়, মন বড়। বন্ধু আমার অনেকে। কিন্তু স্বামী, পতি। না সে স্বামীকে এখনও দেখি নি। পুরুষ একজনই দেখেছি। আমার বাবা। যদি তাঁর মতো কারুকে দেখি তবেই তাঁর পতিত্ব মেনে নেবো। নৈলে বেশ আছি আমি। ওস্তাদজীই আমার দিব্যি বর, না ওস্তাদজী?"

ওস্তাদজী হেসে বলেন, "পাগলী দিদি! আমি কি চিরদিন বাঁচবো?"

"বাঁচবে ওস্তাদজী বাঁচবে। এই কণ্ঠে বাঁচবে। তোমার জায়গা আমার গলায়, বাবার জায়গা মাথায়—"

ওস্তাদজী বলেন, "আর দিল্?"

"দিল্? দিল্ ফাঁকাই থাক্। তুমি আর বাবাই আমার সব। না, না— যে কোনো পুরুষকে সম্মান আমি করতে পারবো না।"

আমি বললাম সময়মতো ওদের ডাকলে ওরা যেন কলকাতায় আসে। আমি ওদের সঙ্গে হেমন্তর দেখা করাব।

আমি সময়মতো ডাকবো কি! তার আগেই বিপর্যয় ঘটে গেল!

'অন্য পুরুষ' ছবি তোলা শেষ হয়েছে।

রিলীজের তারিখ এসে গিয়েছে। আমায় হেমন্ত, চিনি জবাব দিয়েছে। আমি বোম্বেতে ওদের লিখেছি। ওরা যেন ঐ সময়ে কলকাতায় আসে।

কাগজে কাগজে 'অন্য পুরুষ'-এর ছবি দিয়ে অনেকদিন ধরে স্তবগান চলেছে। হেমন্তর প্রতিপক্ষ কাগজগুলো পর্যন্ত ছবি এবং হেমন্তর অভিনয়ের প্রশংসায়

পঞ্চমুখ। খবর পেয়েছি রিলীজের দশদিন আগে থেকে পর পর তিন সপ্তাহের বুকিং শুদ্ধ। শহরের তিনটে হাউসে একসঙ্গে ছেড়েও ভীড়ের কমতি নেই। হেমন্তকে আবার মঞ্চে টেনে নেবার জন্য জল্পনা কল্পনা চলছে। দু-একখানা নাটকও লেখা হয়ে গেছে পঙ্গু চরিত্র নিয়ে। 'অন্ত্য পুরুষ' মঞ্চে নেবার কথাও চলছে। হেমন্ত মঞ্চের ডাক শুনতে পেয়ে বিচলিত।......সবই কাশীতে বসে শুনতে পাই।

রিলীজের দিন সকালে যাতে পৌঁছুতে পারি এমন গাড়িতে চেপে বসলাম।

বর্ষার দিন। গাড়ি থেকে বর্ষা দেখতে বেশ লাগছে। এতদিনে হেমন্ত একটা পরিপূর্ণতার স্বাদ পাবে এই মিষ্টি চিন্তায় মন ভরপুর। আমার সংসারে আমার তত মন ছিল না, এই হেমন্তর সংসারে যত। কাজেই খুব খুশী আমি। সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বাঙ্কে শুয়ে দিব্যি পড়ে চলেছি এক নভেল। কাল সকালে হাওড়া।

ঘস্ করে গাড়ি আটকে গেল অন্ধকার একটা জায়গায়। বিপুল বেগে বর্ষা বাইরে। জানলা অবধি খোলবার জো নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি আর চলে না। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছি। সামনে ছোট্ট স্টেশন থেকে লাল লণ্ঠন হাতে লোক দাঁড়িয়ে। জায়গাটা মোকামার আগে। গঙ্গার জল বেড়ে লাইন ছাপাছাপি হয়ে গেছে। বর্ষার প্রকোপে সে জল আরও বেড়ে একটা বড় নালার একটা দিক ধ্বসিয়ে দিয়েছে। লাইন ভেসে গেছে। গাড়ি এখন ঘুরিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য লাইন দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সেই পিছনে যাত্রা শুরু হলো। হিসেব করে দেখলাম সন্ধ্যার সময় পৌছাতে পারবো।

কিন্তু পৌছালাম রাত্রি এগারোটায়। মন দেহ ক্লান্ত, অবসন্ন। আশাভঙ্গ হবার বড় শোক নেই। শোকের মতো হতবল করে না কিছু।

ট্যাক্সি নিয়ে পৌছালাম আমার হোটেলে। রাতে আর বেরুলাম না। খুব ভোরে, অন্ধকার থাকতে আস্তে আস্তে গেলাম তালতলায়, চিনিদের বাড়ি। ওদের চমকে দেবো।

আশ্চর্য এত সকালে বাড়ির তালা বন্ধ। আশেপাশে জিজ্ঞাসা করি। কেউ বলতে পারে না। রাতে ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছে সবাই। রাত এগারোটার সময় ট্যাক্সি এসেছিল জানে। আর কিছু কেউ জানে না।

খানিকটা ঘাবড়ে গেলাম। কলকাতায় ভোর তখনও পুরোপুরি হয় নি। আমি কোথায় যাই ভাবতে ভাবতে গেলাম গিরিশ পার্কের বাড়িতে।

সেখানে বিলাসী সব বললো।

"এখুনি যাও তুমি দৌড়ে কেওড়াতলায়।"

ব্যস্—সব শেষ।

কিন্তু সে কাহিনী আরও ভয়ানক।

কেওড়াতলায় তখন চিতা জলছে। চিন্ময়ী দাঁড়িয়ে আর প্রতিমা। পাশে কল্যাণী। শ্যামলীও ছিল। আর ছিলেন মহেশদা। আর কেউ নয়। আশ্চর্য, প্রতিমা ছাড়া কেউ কাঁদছে না।

আমায় দেখে চিন্ময়ী শুধু বললো, "এসেছো। খুব সময়ে এসেছো। আমি স্টেশনে খবর নিয়েছিলাম। গাড়ির জন্যে আটকে গিয়েছিলে বুঝতে পেরেছিলাম।"

আর কিছু নয়। চিন্ময়ীর চোখে জল নেই। মনও যেন তরঙ্গহীন, নিষ্কম্প। প্রতিমা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে।

ঘটনা পরে শুনতে পেলাম।

রিলীজ হয়ে যাবার পর সব টাকাই মহেশদার সামনে ওরা চেকে দিয়ে দেয় হেমন্তকে। হেমন্ত একখানা চেক নেয় আট হাজারের। বাকী পাঁচ হাজার নগদ নেয়। সে কথা আগেই ও মহেশদাকে বলে রেখেছিল। বক্সে আমার সীট্ খালি রেখে মহেশদা আর চিনিকে সঙ্গে নিয়ে ও শো দেখেছে। তারপর ওর সংবর্ধনা উৎসব হয়েছে। তারপর টাকা পেয়েছে।

তার পর মহেশদা আর চিনিকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে ও গেছে গিরিশ পার্কের বাড়িতে।

সেখানে ও যে হঠাৎ যাবে ওরা বুঝতে পারে নি। টাকাটা ওদের হাতে দিয়ে ও চমকে দেবে এই প্রত্যাশায় ধীরে ধীরে গাড়ি থেকে নেমেছে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠেছে। চাকরটা বাইরেই বসে ছিল।

ও জানতো না প্রতিমা আর কল্যাণী এসে ওদের বাড়ি উঠেছে। ও জানতো না যে কল্যাণী, প্রতিমা, রানী, বিলাসী, শ্যামলী সকলে একসঙ্গে শো দেখতে গিয়েছিল। ওরাও শো দেখে এসে পরম তৃপ্তির সঙ্গে কলগুঞ্জনে মুখরিত করে রেখেছিল বাড়িখানা। ওদের সে আনন্দের সীমা ছিল না। কোনো দিকে কোনো নজরও ছিল না।

এমন সময় সেই পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে এসে দাঁড়ালো হেমন্ত। হাতে তার নোটের তাড়া। এসেই কল্যাণী আর প্রতিমাকে সেখানে দেখেই এক বিষম ধাক্কা খায় ও। পড়ে যায়। টাকাগুলো ছড়িয়ে পড়ে হাত থেকে।

কেবল বলে, "বিলাসী তোমার সব টাকা এই শোধ হলো।" তারপরই জ্ঞান হারায়।

বিলাসী হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠতে গিয়েছিল। কল্যাণী বলেছিল, "চুপ্। কাঁদা চলবে না। এখন কোনো শব্দ নয়। যদি বাঁচাতে নাও পারি এ

বাড়িতে মৃত্যু হয়েছে এ কথা কেউ যেন ঘুণাক্ষরে টের না পায়। এত বড় লোকের এতখানি অপবাদ সহ্য হবে না। তোমরা দাঁড়াও। ডাক্তার ডাকি আগে। কিন্তু প্রতিমা একটুও শব্দ নয়। একটুও নয়।"

কল্যাণীই ডাক্তার ডেকে এনেছিল। একজন নয়, তিনজন। কিন্তু তখন আর কিছু করবার ছিল না। বেশ্যালয়ে এমন স্ট্রোকে মৃত্যু অনেক দেখেছে ডাক্তাররা। সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে চলে গেলেন।

কল্যাণী আর বিলাসী তখন যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলো। এ বাড়িতে হেমন্ত মরেছে এ কথা রাষ্ট্র করা চলবে না। কান্না চলবে না। এ বাড়ি থেকে শব শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। গোপনে; অন্তত কলকাতার শহর না জানতে পারে।

এ বিপদে একমাত্র সহায় হলেন মহেশদা। বিলাসী তাঁর বাড়ি জানতো। মহেশদা শুনে ছুটতে ছুটতে গেলেন চিনির কাছে। চিনি নীরবে সব শুনেছিল। শুনে তখন অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কি করে শব নিঃশব্দে শ্মশানে আনা যায়।

"তিনি যে কি ছিলেন কেউ জানবে না। যে কাগজ তাঁর প্রশংসায় আজ পঞ্চমুখ, সেই কাগজে নানা কথা বেরুবে। না-না-দাদা, চলুন আমাদেরই ব্যবস্থা করতে হবে।"

সেই এ বাড়িতে প্রথম পা পড়েছিল চিন্ময়ীর। দুটি অশীতিপরা বৃদ্ধা ছাড়া বাকী তিনখানা মুখের একখানা তার নিজের, দুখানা তার চেনা না হলেও খুব জানা। প্রতিমার সিঁথেয় সিঁদুর। বিছানায় শিশু। কল্যাণী বলেছিল, "আজই আমরা সোমকাকার চিঠি পেয়ে এই বই দেখতে বোম্বাই থেকে আসছি। সোমকাকা নিজে কেন এলেন না তাই ভাবছি।"

প্রতিমা মাকে প্রণাম করতে যেতেই চিন্ময়ী তাকে পাশে বসিয়েছিল। কল্যাণীই বলেছিল, "প্রতিমার বিয়ে হয়ে গেছে মা। ঐ প্রতিমার ছেলে।"

সব কথা বলেছিল কল্যাণী তাড়াতাড়ি। আর চিন্ময়ী হেমন্তর মাথায়, গায়ে হাত বুলিয়েছে আর বলেছে "শান্তি, শান্তি, শান্তি। আর তোমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? তোমার প্রতিমাকে ফিরে পেয়েছো, তোমার ঋণ তুমি শোধ করেছো; আর তোমার মঞ্চকে তুমি ভরিয়ে দিয়ে গেছো। সবই তোমার পূর্ণ হলো। এবার শান্তি পেয়েছো তুমি! আমার কথা এবার হয়তো ভাবতে। তাও তোমার ভাবতে হলো না। কিন্তু এ তুমি কোথায় মরতে এলে? এখান থেকে তোমায় আমি বার করে নিয়ে যাবো কি করে?"

বিলাসী বলেছিল, "তোমার পায়ে পড়ি বৌদিদি, এ কাজ তোমায় করতেই হবে। এ বাড়ি থেকে মেজোকত্তার শব আমি জানাজানি ভাবে বার হতে দিতে পারি না। সে বড় কলঙ্ক হবে গো অমন সদ্‌ব্রাহ্মণের। জীবনে যে পাপ

করে নি তারে পাপ লাগবে আমা হতে। নরক হবে আমার গো। আমায় সে নরক থেকে বাঁচাও তোমরা।"

এ অভাগিনীদের পাড়ায় মৃত্যু হলে অনেক সময় এরাই শব বয়ে নিয়ে যায়। মহেশদা সব ব্যবস্থা করলেন। ট্রাক নিয়ে এলেন। শবকে আচ্ছাদিত করে মাল্য-কুমকুমে সজ্জিত করে তিনটি নারী ও একটি পুরুষ বহন করে নিয়ে এল ট্রাকে। তারপর ট্রাক চললো শ্মশানে।

বিলাসী আর রানী যায় নি, পাছে মেজোকত্তার নামে কোনো আঁচ লাগে।

গঙ্গার জল কলকল করে বয়ে যায়। আমি ঘাটের পাড়ে বসে থাকি। চিন্ময়ী নিজের গল্প নিজে বলে যায়। আমি শুনি।

পিছনে এসে দাঁড়ায় কল্যাণী আর প্রতিমা।

শ্যামলী কোথায় জানি না।

চিন্ময়ীকে কখনও আমি চোখের জল ফেলতে দেখি নি। এখন ভয়ানক শেষেও তার চোখে জল পড়ে নি। নিজের হাতে শাঁখা-চুড়ী অলঙ্কার সব সে খুলে ফেলেছে যতক্ষণ আমায় তার কাহিনী শুনিয়েছে। এখন আঁচলে তেল আর জল মাখিয়ে ঘষে ঘষে সিঁদুর তুলছে। তখন আমার চোখে জল দেখে চিন্ময়ী বললো, "সবই তো ওর দেওয়া। ও নিয়ে গেল। কাঁদছো কেন সোম? কিন্তু এখন আমার কি হবে?"

কল্যাণী পেছন থেকে জড়িয়ে নিয়ে বললো, "আমি আমার মাকে নিয়ে যাবো।"

আমি চিন্ময়ীর চোখে জল দেখি নি কখনো।

এখন ও হু-হু করে কেঁদে উঠলো।